Da'wah Students' Journal

সংখ্যা ০১, আগস্ট ২০০৯
Vol 01, August 2009

দা'ওয়াহ স্টুডেন্টস জার্নাল

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুব উল্লাহ

প্রধান উপদেষ্টা
প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক

প্রধান সম্পাদক
এম. শাকের আলম শওক

সম্পাদনা পর্ষদ
মুহাম্মদ আবুল কালাম
আ.ফ.ম. নূরুজ্জামান
মুহাম্মাদ আমিনুল হক
আব্দুল কাদের

সম্পাদনা সহযোগিতায়
এন এইচ মাসুম
সাউদ বিন মুহাম্মদ
মোহাম্মদ নো'মান কুতুবী
উম্মে কুলসুম
তাসলিমা আখতার
কাশেফা ফেরদাউস

দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

297.04
S527d
J-160

297.04
S527d

CENTRAL LIBRARY
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY, CTG.
Acc. No: J0160
Date: 05-01-2016

সংখ্যা ১, আগস্ট ২০০৯
Vol 01, August 2009

Da'wah Students' Journal

দা'ওয়াহ স্টুডেন্টস জার্নাল

مجلة طلاب الدعوة

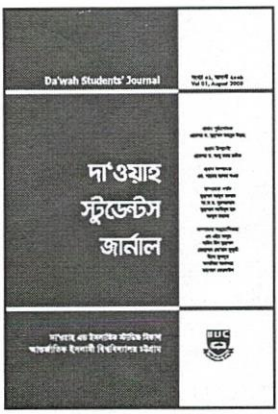

CENTRAL LIBRARY
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY CTG.
Acc. No:...
Date...

দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

দা'ওয়াহ স্টুডেন্টস জার্নাল

সংখ্যা ১, আগস্ট ২০০৯

প্রকাশনায়

দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম
চকবাজার, চট্টগ্রাম-৪২০৩।
ফোন : ০৩১-৬১০৩০৮, ৬১০০৮৫ এক্সটেনশন-২১০
মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৯৭৮৩৮, ০১৫৫৪-৩১০২৭৪
ই-মেইল : dawahstudentjournal@yahoo.com
ফ্যাক্স : ৮৮০-৩১-৬১০৩০৭
ওয়েবসাইট : www.iiucbd.edu

ঢাকা ক্যাম্পাস

বাড়ী নং ২৩, রোড নং ০৩
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা ১২০৫, বাংলাদেশ
ফোন : ০২ ৮৬২৯৯৪৭, ৮৬১৩২৯৪
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬২৪৬৯২

প্রকাশকাল

আগস্ট, ২০০৯ ইংরেজী
রমযান, ১৪৩০ হিজরী
ভাদ্র, ১৪১৬ বাংলা

মুদ্রণ

NOKSHA
টুইন প্লাজা, ১৬৭ কলেজ রোড
চকবাজার, চট্টগ্রাম-৪২০৩, বাংলাদেশ
ই-মেইল : service@nokshaworld.com
ওয়েবসাইট : www.nokshaworld.com

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুব উল্লাহ

প্রধান উপদেষ্টা

প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক

উপদেষ্টামন্ডলী

মাওলানা শামসুল ইসলাম এম.পি
প্রফেসর ড. আ ক ম আব্দুল কাদের
আবু রেজা মোহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী
ড. আহমদ মোস্তফা
মোঃ শাহ জালাল

প্রধান সম্পাদক

এম. শাকের আলম শওক

সম্পাদনা পর্ষদ

মুহাম্মদ আবুল কালাম
আ.ফ.ম. নূরুজ্জামান
মুহাম্মাদ আমিনুল হক
আব্দুল কাদের

সম্পাদনা সহযোগিতায়

এন এইচ মাসুম
সাউদ বিন মুহাম্মদ
মোহাম্মদ নো'মান কুতুবী
উম্মে কুলসুম
তাসলিমা আখতার
কাশেফা ফেরদাউস

الراعي الرئيسي

الأستاذ الدكتور محمد محبوب الله

المستشار الرئيسي

الأستاذ الدكتور أبو بكر رفيق

المستشارون

مولانا شمس الإسلام
الأستاذ الدكتور أ. ق. م عبد القادر
الأستاذ أبو الرضاء محمد نظام الدين الندوي
الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى
الأستاذ محمد شاه جلال

رئيس التحرير

الأستاذ م. شاكر عالم شوق

هيئة التحرير

الأستاذ محمد أبو الكلام
الأستاذ أ. ف. م. نور الزمان
الأستاذ محمد أمين الحق
الأستاذ عبد القادر

المساعدون

إن إيص معصوم
سعود بن محمد
محمد نعمان قطبي
أم كلثوم
تسليمة أختار
كاشفة فردوس

সম্পাদকীয়

সমস্ত প্রশংসা ও শুকরিয়া সেই মহান আল্লাহর দরবারে, যিনি আমাদেরকে কলম দ্বারা অজানা বিষয়াবলী শিক্ষা দিয়ে জার্নাল প্রকাশের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাপ্ত করার তাওফীক দান করেছেন। লাখো কোটি দরূদ ও সালাম বিশ্বমানবতার আদর্শ শিক্ষক মহানবী (সা.) এর প্রতি, যিনি গবেষণার জন্য হরহামেশা উৎসাহ প্রদান করে জ্ঞানার্জনকে ফরয করেছেন।

বিশ্ব ইতিহাসে এমন একটি সময় ছিল, যখন মুসলমানরা আবিষ্কার-উদ্ভাবন, চিন্তা-গবেষণা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় বিচরণ করে মানবেতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছিলেন। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ ধারায় মুসলমানদের অবস্থান আজ অত্যন্ত নাজুক। তাই মুসলিম উম্মাহর এ হারানো গৌরব ও ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ তাদের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিয়মিত গবেষণা কর্মে উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ দানের প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যার সফল বাস্তবায়ন ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে প্রকাশিত **"দা'ওয়াহ স্টুডেন্টস জার্নাল"**। জার্নালের সমস্ত প্রবন্ধ গবেষণা-পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গরূপ অনুসরণ করা সম্ভব না হলেও এতে প্রাথমিক পর্যায় প্রতিফলিত হয়েছে বলে আমরা মনে করি। আমাদের এ কাজে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী, ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ও শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে যারা বুদ্ধি-পরামর্শ, কায়িকশ্রম ও আর্থিক সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেছেন, তাদেরকে বিভাগের পক্ষ থেকে মোবারকবাদ ও ধন্যবাদ। পরিশেষে জার্নালের যাবতীয় ভুল-ত্রূটির জন্য ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টি ও মহান আল্লাহর দরবারে উত্তম প্রতিদান এবং সবার কাছে দোয়া চেয়ে সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করে শেষ করছি। আমীন

সম্পাদকমন্ডলী
২৩ আগস্ট, ২০০৯

দা'ওয়াহ্ স্টুডেন্টস জার্নাল
সংখ্যা ০১, আগস্ট ২০০৯

Da'wah Students' Journal
Vol 01, August 2009

সূচীপত্র :

	পৃষ্ঠা
জুমু'আহর খুৎবা ও এর ভাষা প্রসঙ্গে প্রফেসর ড.আবু বকর রফিক	৭-১৪
ইসলামী অর্থব্যবস্থায় 'উশর এর ভূমিকা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত প্রফেসর ড.আ.ক.ম.আবদুল কাদের	১৫-২৫
ইসলামের দৃষ্টিতে বাংলাদেশে কবর সংস্কৃতি ড. আ.ছ.ম. তরীকুল ইসলাম	২৬-৩৬
শিক্ষা ব্যবস্থা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত নূরুল আমিন আতিক	৩৭-৪১
মানব সভ্যতায় ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের বাস্তবতা : প্রেক্ষিত নিন্দুকদের সমালোচনা আতাউর রাহমান নাদভী	৪২-৫৫
দা'ওয়াতী কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ভূমিকা মুহাম্মদ তরিকুল ইসলাম	৫৬-৬১
ইসলামী বীমার শার'ঈ ভিত্তি বি. এম. মফিজুর রহমান আল্-আযহারী	৬২-৭৪
বুদ্ধিবৃত্তিক রেনেসাঁ ঃ প্রেক্ষিত ইসলামি বিপ্লব মোহাম্মদ নুরুন্নবী	৭৫-৮০
আরাকানে মুসলিম নির্যাতন ও আমাদের করনীয় আব্দুর রহিম	৮১-৯০
দা'ওয়াতী কার্যক্রমে দোয়ার ভূমিকা কাশেফা ফেরদাউস	৯১-৯৭
চরমপন্থার উদ্ভব ও প্রতিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ জাকিয়া বিনতে আলম	৯৮-১০২
"সমকালিন বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট ও আল-কোরআনের সমাধান" মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ	১০৩-১১০
ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় যাকাত জিনাত রেহেনা	১১১-১১৪
কালপরিক্রমায় ইসলামী আন্দোলনঃ পরীক্ষা ও মোকাবিলা রোকেয়া বেগম	১১৫-১২১
ইসলামের রাষ্ট্রদর্শন মোঃ শাহজালাল	১২২-১২৬
মানব শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড মুহাম্মদ মাহমুদুল্লাহ	১২৭-১৩২
পরিবেশ বিপর্যয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ হাফেজ এন.এইচ.মাসুম	১৩৩-১৪২
চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্যঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ মুহাম্মাদ আমিনুল হক	১৪৩-১৫০
নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন ঃ প্রসঙ্গ ইসলাম মেরী চৌধুরী	১৫১-১৫৩

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 7-14)

জুমু'আহর খুৎবা ও এর ভাষা প্রসঙ্গে

প্রফেসর ড.আবু বকর রফিক*

১. প্রাক কথা:

মহানবী (স:) এর হিজরতের পরই কুবার মসজিদে প্রথম জুমু'আহর নামায আদায় করা হয় নবীজীর ইমামতে। এই দিনই তিনি নামাযের পূর্বে দুটি খুৎবা প্রদান করেন। তখন থেকেই জুমু'আহর দিবসে নামাযের পূর্বে ইমাম কর্তৃক দুটি খুৎবা প্রদান ইসলামী সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়।

মহানবী (স:) এর জীবদ্দশায় ইসলাম আরব উপদ্বীপেই সীমিত ছিল। যাদের ভাষা ছিল আরবী। খোলাফায়ে রাশেদার আমলে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করে রোমান সাম্রাজ্যের অধীভূক্ত সিরিয়া এবং পারস্য সাম্রাজ্যের কেন্দ্র বিন্দু ইরান পর্যন্ত। বস্তুত: তা ছিল এমন এক মহা বিপ্লব যা মানুষের আকীদা বিশ্বাসও জীবনাচারকেই যে শুধু পরিবর্তিত করে দিয়েছিল তা নয় বরং ইসলাম মানুষের মুখের ভাষাকেও বদলিয়ে দিয়েছিল। ফলে এ সব অঞ্চলে দ্রুতই আরবী ভাষা বিভিন্ন ভাষা ভাষী জনগণের ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যম হিসেবেই (Lingua franca) পরিণত হয়েছিল। এবং জুমু'আহর দিবসের খুৎবাও স্বাভাবিক কারণেই আরবীতে প্রদান অব্যাহত ছিল।

কালে ইসলাম প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামের একটি অপরিহার্য অংগ হিসেবে প্রতি জুমাবার মুসলিম পুরুষগণের এ ধর্মীয় সম্মেলন তথা জুমু'আহর নামায আদায় ও তৎপূর্বে খুৎবা প্রদানের রীতিও প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। বর্তমান পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ ইসলামে বিশ্বাসী। এদের সংখ্যা দেড়শ কোটির মত। যাদের অর্ধেক পুরুষ এবং তন্মধ্যে অন্তত: দুই তৃতীয়াংশ জুমু'আহর নামায আদায় করার যোগ্য। এ হিসেবে জুমু'আহর নামায আদায় কারীর সংখ্যা অন্তত: পঞ্চাশ কোটি। জুমু'আহর দিবসে নামাযের পূর্বে ইমাম সাহেব সমবেত মুছল্লীদেরকে উদ্দেশ্য করে যে খুৎবাটি প্রদান করেন তা এমন কোন মন্ত্র তন্ত্র নয় যা শ্রোতাদের বুঝা না বুঝার কোনই ধার ধারেনা। বরং এ খুৎবাটি ইসলামের দৃষ্টিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা। এ খুৎবার মাধ্যমে সাপ্তাহিক গণজমায়েতকে উদ্দেশ্য করে ইমাম (খতীব) সাহেব যে বক্তব্য পেশ করেন তাতে অপরিহার্য রূপে থাকতে হয় আল্লাহর প্রশংসা, রসূলের প্রতি দরূদ, উপস্থিত জনতার প্রতি খোদাভীতি ও কল্যাণের পথে চলার উপদেশ। উপস্থিত জনতাকে ইসলামের আলোকে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দিক নির্দেশনা, মুসলিম, সমাজ রাষ্ট্র ও মুসলিম বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত এবং দ্বিতীয় খুৎবায় বিশেষ করে সমাজ, দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর জন্য সামষ্টিক ভাবে দু'আ করা হয়। এ খুৎবায় ব্যবহৃত হয় আল কুর'আন ও আল হাদীস হতে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি।

সঙ্গত কারণেই প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত বিস্তৃত এ মুসলিম উম্মাহ বিভিন্ন অঞ্চল, দেশ ও জাতি সত্ত্বায় বিভক্ত। ফলে এদের ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন। তাদের সকলেই আরবী ভাষা বুঝতে পারবে তা স্বাভাবিক নয়। অবশ্য প্রাত্যহিক নামায আদায়কালে আল কুর'আনের কিয়দাংশ মূল আরবীতে পাঠ করার বাধ্যবাধকতা গোটা মুসলিম দুনিয়াকে আরবী ভাষার সাথে সম্পৃক্ত থাকার সুযোগ করে দিলেও এ ভাষা বুঝার বিষয়টি বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অধ্যয়নের সাথে সম্পৃক্ত যা কার্যত খুব স্বল্প সংখ্যক লোকের পক্ষেই সম্ভব। তাই সংগত কারণেই প্রশ্ন উঠেছে যে জুমু'আহ নামাযের পূর্বে খতীব সাহেব উপস্থিত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে যে খুৎবাটি প্রদান করেন, তা ইসলামের প্রথম যুগের অনুসৃত পদ্ধতি অনুযায়ী আরবীতে প্রদান করা অপরিহার্য কিনা? যদি আরবীতে প্রদান অপরিহার্য মনে করা হয় তাহলে খুৎবার উদ্দেশ্য যা উপরে বলা হয়েছে তা কতটুকু অর্জিত হচ্ছে? এ খুৎবা আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় প্রদান সম্পর্কে ইমামগন ও মুসলিম পন্ডিতদের অভিমত কি তা বিশদ আলোচনার দাবী রাখে। এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে আমি এ বিষয়ে কিছু আলোচনার অবতারনা করব। তবে মনে রাখতে হবে যে,

---

* প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম। সাবেক ডীন, শরীয়াহ অনুষদ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর; সাবেক সহকারী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়া।

আমি এ বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করছিনা বরং আলোচনার একটি ধারা উন্মুক্ত করতে চাই এবং প্রসঙ্গক্রমে পূর্ববর্তী উলামাদের কিছু মতের উল্লেখ করারও প্রয়াস থাকবে।

২. খুৎবার সংজ্ঞা ও এর মৌলিক চরিত্র:

খুৎবা মুলতঃ একটি আরবী পরিভাষা। খুৎবার সংজ্ঞা হচ্ছে এই, ইহা মূলতঃ একটি বিশেষ বর্ণনা ভঙ্গীতে রচিত গদ্যায়িত সাহিত্য-কর্ম, যাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ছন্দায়িত গদ্যরীতি ও অলংকার শাস্ত্রের সূত্র সমূহ। প্রাক ইসলামী যুগে এ রীতি অবলম্বনে একটি বিশেষ সাহিত্য ধারার উৎপত্তি ঘটে এবং সমাজে এ রীতি অবলম্বন কারীরা খতীব বহুবচনে খুতাবা উপাধীতে আখ্যায়িত হত। অবশ্য ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে খুৎবার চরিত্র উপরিবর্ণিত গদ্যরীতি হতে ভিন্ন একটি ধারনার সৃষ্টি হয়। খুৎবা হচ্ছে একজন নেতৃস্থানীয় ইসলামী ব্যক্তিত্ব কর্তৃক প্রদত্ত একটি বক্তৃতা যার সূচনায় থাকতে হয় আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলের প্রতি দরূদ, এর মূল বক্তব্যে থাকে কিছু উপদেশ, ইসলামী দিক নির্দেশনা, এতে আরো থাকে বক্তব্যের স্বপক্ষে আলকুর'আন ও সুন্নাহর উদ্ধৃতি। জুমু'আহর নামায ছাড়াও বিবাহের মজলিশে, তথা আকদ অনুষ্ঠানে, ঈদের নামায ও ইসতিসকার নামাযের পর উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে খুৎবার প্রদানের রীতি রাসূল (স.) হতে প্রচলন আছে। তাছাড়া কোন জন গুরুত্বপূর্ন বিষয় উপস্থিত হলেও জনগনকে আহবানের মাধ্যমে একত্রিত করে কোন দশর্নীয় স্থানে দাঁড়িয়ে জনগনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রসূল (সঃ) সম্বোধন করতেন। একেও খুৎবা নামে অভিহিত করা হয়।

৩. জুমু'আহর খুৎবা ও এর বিষয়বস্তু:

জুমু'আহর খুৎবা ছাড়া অন্যান্য খুৎবার বিষয় বস্তুর বিস্তারিত আলেচনায় অবতারণা না করে আমি জুমু'আহর খুৎবা এর বিষয়বস্তু, এর গুরুত্ব, এর আরকান, পরিধি ও ভাষা প্রসঙ্গে কিছু আলোচনার প্রয়াস পাব এখানে।

৩.১ খুৎবার গুরুত্ব : সকল মাযহাবের ইমামদের সম্মিলিত মত হচ্ছে এই যে, জুমু'আহর নামায গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য খুৎবা অপরিহার্য। অনেকের মতে দুটো খুৎবাই সমানভাবে ওয়াজিব তবে ইমাম আবু হানিফার মতে দ্বিতীয়টি সুন্নত। তাছাড়া খুৎবার মধ্যে তাহমীদ ও তাসবীহ তথা আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি সূচক বাক্য থাকা অবশ্যম্ভাবী যা এর রুকন বলে বিবেচিত। কেননা পবিত্র আল কুরআনে উল্লেখ আছে যে :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ)

অর্থাৎ: ওহে যারা ঈমান এনছে (শোন), যখন জুমু'আহর দিবচসে নামাযের জন্য আহবান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত হও। (সূরা আল জুমু'আহ: ০৯)

এখানে 'যিকর' বলতে খুৎবার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তাই খুৎবাতে এমন কিছু থাকতে হবে যা যিকর হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এ মত ইমাম আবু হানীফার।

৩.২ খুৎবার পরিধি: খুৎবার পরিধি কতটুকু হওয়া বাঞ্চনীয় তা নিয়ে ইমামদের মধ্যে কিছু মত পার্থক্য রয়েছে। (ক) ইমাম আবু ইউছুফ ও মুহাম্মদের (র.) মতে খুৎবা দীর্ঘ হওয়া বাঞ্চনীয় (খ) ইমাম মালেকের মতে সংক্ষিপ্ত দুই বা ততোধিক বাক্যেও এর প্রয়োজনীয়তা পূরণ হবে।

(গ) আবু বকর ইবনুল 'আরাবীর মতে খুৎবাতে হামদ, তথা আল্লাহর প্রশংসা, ছালাৎ তথা রসুলের প্রতি দরূদ, আদেশ নিষেধ সংক্রান্ত কিছু বাণী, উপদেশমুলক কথা এবং সর্বোপরী আলকুরআনের কিছু উদ্ধৃতিও থাকা অপরিহার্য।

(ঘ) ইমাম শাফি'ঈর মতে খুৎবার পরিধি আরো বিস্তৃত হওয়া চাই। এতে উপরোল্লিখিত বিষয় সমূহ ছাড়াও মুসলিম উম্মাহর জন্য কল্যাণের দু'আ থাকাও জরুরী। (ঙ) হাম্বালী মযহাবের পন্ডিতদের মতও অনুরুপ।[১]

৩.৩ খুৎবার শর্তাবলী:

খুৎবার শর্তাবলীর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইহা জুমু'আহর ওয়াক্তে তথা দ্বিপ্রহরে প্রদত্ত হতে হবে। এবং নামাযের পূর্বাহ্নেই প্রদত্ত হতে হবে, খুৎবা প্রদানকালীন কমপক্ষে ২/৩ জন শ্রোতার উপস্থিতি নিশ্চিত হতে হবে। অনেকের মতে খুৎবার জন্য নিয়্যৎ তথা বিশেষ উদ্দেশ্যে ইহা প্রদত্ত হবে। যাঁরা দুই খুৎবা অপরিহার্য হওয়ার মত দিয়েছেন তাদের মতে এ দুটির মধ্যে পরম্পরাও অপরিহার্য।

৪.খুৎবার ভাষা প্রসঙ্গে:

৪.১. খুৎবার ভাষা আরবীই হওয়া চাই এ বিষয়ে আইম্মাহ ও ফিক্বহ শাস্ত্রবিদদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। (ক) অধিকাংশ উলামা তথা জমহুর এর মত হচ্ছে এই, খুৎবার ভাষা অবশ্য আরবী হওয়া বাঞ্চনীয়। যদিও শ্রোতাদের কাছে তা বোধগম্য না হয়। এদের যুক্তি হচ্ছে এই,

(i) খুৎবাহ নামাযের মত একটি আনুষ্ঠানিক ও বিধিবদ্ধ ইবাদত, তাই এর ভাষাও হতে হবে ইবাদতের অংশ বিশেষ।

(ii) ইসলামের প্রাথমিক যুগ হতে আরবীতেই খুৎবাহ দানের রীতি প্রচলিত আছে, অথচ ইসলাম তখনও আরবী ভাষা ভাষী অঞ্চল অতিক্রম করে সুদূর ইরান ও রোম সাম্রাজ্যে বিস্তৃতি লাভ করেছিল, যদি ভিন্ন ভাষায় খুৎবা দানের অবকাশ থাকত তা হলে সে ব্যবস্থা তখনই চালু হয়ে যেত।

(iii) যোহরের চার রাকাত নামাযকে জুমু'আহবারে দুরাকাতে সীমিত করা হয়েছে। কারণ খুৎবাহ হচ্ছে বাকী দু'রাকাত নামাযের বিকল্প। তাই নামাযের মত খুৎবাও হতে হবে আরবীতে।

৪.২ ইমাম আবু হানীফা (রা:) এর মত হচ্ছে এই, আরবী ভাষায় খুৎবাহ প্রদান করা বাধ্যতামূলক নয়, যদিও খতীব আরবী ভাষায় খুৎবাহ দানে সক্ষম। এমনকি শ্রোতাগণ আরব অনারব মিশ্রিত হলেও।

৪.৩ অবশ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (ছাহেবান) এর মতে ইমাম আরবী ভাষায় খুৎবা দানে অক্ষম হলেই তখন ভিন্ন ভাষায় খুৎবা দানের অনুমতি রয়েছে।

৪.৪ ইমাম মালেকের মতে জুমু'আহর খুৎবা দানকারীর অবশ্যই আরবী ভাষায় জ্ঞান থাকা চাই। সে যা পেশ করছে তার অর্থ না বুঝলে তাতে খুৎবা শুদ্ধ হবেনা। তা ছাড়া খুৎবা আরবীতেই হতে হবে। যদিও মুসল্লীগণ অনারব হন।

৪.৫ ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল ও তাঁর অনুসারীদের মতে আরবী ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় খুৎবা প্রদান বৈধ নয়, যদি খতীব আরবীতে খুৎবাহ দানে সামর্থ্য রাখেন। অবশ্য তিনি আরবী ভাষায় খুৎবা দানে অসামর্থ্যবান হলে তখন যে ভাষায় তার ভাল দখল রয়েছে তাতে খুৎবা প্রদান করবেন। উপস্থিত মুসল্লীগণ কোন্ ভাষাভাষী সে প্রসঙ্গ মৌলিক নয়। তবে ভিন্নভাষায় খুৎবা প্রদান কালে পবিত্র কুরআনের আয়ত সমূহের মুল আরবী পাঠ তেলাওয়াৎ করতে হবে।

৪.৬ শাফি'ঈ স্কুলের মতে, শ্রোতাদের বিবেচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতএব যদি শ্রোতামন্ডলী আরবী ভাষা ভাষী হয় তাহলে খুৎবার আরকান সমুহ তথা হামদ, ছালাত ও আলকুরআনের উদ্ধৃতি সমূহ অবশ্যই আরবী ভাষায় পেশ করতে হবে। অবশ্য যদি খতীব আরবী ভাষায় খুৎবা দানে অক্ষম হন সে ক্ষেত্রে অন্য ভাষায় খুৎবা দানের অনুমতি রয়েছে।

পক্ষান্তরে যদি শ্রোতৃমন্ডলি অনারব হন তখন আরবী ভাষায় খুৎবা দান অপরিহার্য নয়। তবে খতীব যদি খুৎবার মূল আরকান সমূহ আরবীতে পেশ করতে সক্ষম হন তা হলে যে পরিমান আরবীতে পেশ করা বাঞ্চনীয়, খুৎবার আরকান (হামদ, ছালাত, আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ সম্বলীত কুরআন সুন্নাহর উদ্ধৃতি) আরবীতে পেশ করা বাধ্যতামূলক।[২]

৫. খুৎবার ভাষা সম্পর্কে সাইয়িদ আবুল আলা মওদূদীর মত:

৫.১. সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদূদী তাফহীমাত গ্রন্থে খুৎবার ভাষা কি হওয়া চাই সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এর সার সংক্ষেপ আমি এখানে উদ্ধৃত করা সমীচিন মনে করছি।

জুমুআ'হর খুৎবার ভাষা সম্পর্কে একটি সাধারণ ভূল ধারণা প্রচলীত আছে যে, খুৎবার ভাষাকে নামাযের ভাষার সাথে অভিন্ন মনে করা হয়। আসলে এ দুটি বস্তুকে অভিন্ন মনে করার কোন কারণ নেই।

অনেকে মনে করেন যে, চার রাকাত বিশিষ্ট যোহরের নামাযের স্থলে দু রাকা'ত বিশিষ্ট জুমুআ'হর নামাযের প্রধান কারণ হিসেবে হযরত উমর (রা:) ও আয়েশা (রা:) বর্ণিত একটি হাদীস যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে খুৎবার জন্য জুমুআ'হর নামায দু রাকাতে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে: إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة

অতএব খুৎবার ভাষা তাই হওয়া বাঞ্চনীয় যে ভাষায় নামায আদায় করা হয়। তাই আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় খুৎবা দান অবৈধ।

কিন্তু ইহা একটি অগভীর দৃষ্টিভঙ্গী। নামায ও খুৎবার সাথে সংশ্লিষ্ট বিধি বিধানের পর্যালোচনায় সুস্পষ্টভাবে জানা যাবে যে এ দুটি বস্তুকে এক করে দেখার কোনই অবকাশ নেই। যেমন

ক) নামাযের জন্য অযু অপরিহার্য কিন্তু খুৎবার জন্য অপরিহার্য নয়। এমনকি কেউ যদি ভুলে জানাবত অবস্থায়ও খুৎবা প্রদান করেন তাতেও ঐ খুৎবার পূনরাবৃত্তির প্রযোজন হবে না।

খ) নামাযের জন্য কেবলা মুখী হওয়া আবশ্যক কিন্তু খুৎবার জন্য আবশ্যক নয়। বরং কেবলাকে পেছনের দিকে রেখেই খুৎবা দেয়া হয়।

গ) বাক্যালাপ করলে নামায নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু বাক্যালাপে খুৎবার কোন ক্ষতি হয়না বরং খুৎবা প্রদান কালে শ্রোতাদের মধ্যে কোন সমস্যা দৃষ্ট হলে তখন নবীজী ও ছাহাবাগণ প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করতেন।

ঘ) জুমুআ'হর নামায কোন কারণে ভঙ্গ হয়ে গেলে তার পুনরাবৃত্তি অপরিহার্য, কিন্তু খুৎবার ক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়।

আল্লামা সরখসী বলেন:

(قال بعض مشائخنا الخطبة تقوم مقام ركعتين ولهذا لا تجوز إلا بعد دخول الوقت والأصح أنها لا تقوم مقام شطر الصلوة)

অর্থাৎ: আমাদের কোন কোন পন্ডিত বলেছেন যে, যেহেতু খুৎবা দু রাকাত নামাযের স্থলাভিষিক্ত তাই দ্বিপ্রহরের পূর্বে তা প্রদান করা ঠিক নয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই, খুৎবা (যোহরের) দু' রাকাত নামাযের স্থলাভিষিক্ত নয়।[৩]
হিদায়ার ব্যাখ্যা আলইনায়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে:

(إنها ليست بركن لأن ركن الشيئ ما يقوم به ذلك الشيئ وصلاة الجمعة لا تقوم بالخطبة وإنما تقوم بأركانها)

অর্থাৎ: জুমু'আহর খুৎবা নামাযের রুকন তথা ভিত্তি নয়। কারণ ভিত্তি হচ্ছে ঐ বস্তু যার উপর কোন বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভরশীল। জুমু'আহর নামাযের অস্তিত্ব খুৎবার উপর নয় বরং ঐ নামাযের আরকানের উপরই নির্ভরশীল।

৫.২. জুমু'আহর নামায ও খুৎবার উদ্দেশ্য অভিন্ন নয়

এতে কোন সন্দেহ নাই যে খুৎবাও নামাযের অনুরূপ একটি 'ইবাদত। কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্য অভিন্ন নয়। নামাযে যা কিছু পাঠ করা হয় তার অর্থ বুঝতে না পারলেও নামাযের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে না..... । কিন্তু যে উদ্দেশ্যে খুৎবার প্রবর্তন তা খুৎবার অর্থ অনুধাবন ব্যতীত অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। কেননা খুৎবার প্রবর্তন মূলত: নামাযের মত আল্লাহর স্মৃতি, তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে দাসত্বের নিবেদন ইত্যাদি নয়, বরং এর উদ্দেশ্য হল দ্বীনের আহকাম সম্পর্কে জ্ঞাত করা, উপদেশ দান ও প্রশিক্ষণ। তাই এ উদ্দেশ্য ততক্ষণ অর্জিত হতে পারে না যতক্ষণ না এর বক্তব্য বিষয় শ্রোতাদের নিকট বোধ গম্য হবে।

কেউ কেউ মনে করেন যে, খুৎবার উদ্দেশ্য উপদেশ বা নছীহত নয় বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যিক্‌র যা পবিত্র আল-কুরআনে বর্ণিত فاسعوا إلى ذكر الله আয়াতে উল্লেখ আছে। তাই খুৎবা নামাযের মতই একটি 'ইবাদত। নামাযের অর্থ বুঝা যেমন অপরিহার্য নয় তদ্রূপ খুৎবার অর্থ বোধগম্য হওয়াও অপরিহার্য নয়।

এ প্রশ্নের উত্তরে সাইয়িদ মওদূদী বলেন যে, এ আয়তে ذكر الله বলতে, যে খুৎবা বুঝানো হয়েছে সে ব্যাখ্যা চূড়ান্ত নয়। বরং এর দ্বারা যে নামায বুঝানো হয়েছে যে সম্ভাবনাই প্রবল। বলা বাহুল্য আল কুরআনের অন্যান্য স্থানেও যিকর শব্দ দ্বারা নামায বুঝানো হয়েছে। এখানেও আয়াতের পূর্ববর্তী অংশে إذا نودى للصلوة তে উল্লিখিত صلوة এবং ذكرالله অভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া যায় যে উক্ত আয়তে ذكر الله বলতে নামায নয় বরং আল্লাহর যিকির (তথা খুৎবা) ই উদ্দেশ্য তা হলেও এর পক্ষে কি কোন প্রবল যুক্তি পেশ করা সম্ভব যে আল্লাহর যিকির একমাত্র আরবীতেই হতে হবে, অন্য কোন ভাষায় নয়? কেননা আল্লাহর যিকিরকে আরবী ভাষায় সীমাবদ্ধ করা তো কুরআন সুন্নাহ অথবা যুক্তি কোন দৃষ্টিকোন থেকেই গ্রহণযোগ্য বলা যেতে পারে না।

এ বিষয়টিও প্রনিধানযোগ্য যে, যদি খুৎবার বাধ্যবাধকতার পেছনে বিধানদাতা (শারি') এর উদ্দেশ্য যিকিরই ছিল তা হলে কি এর জন্য নামাযই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতোনা? তা হলে নামাযের মত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতকে সংক্ষিপ্ত করে খুৎবার জন্য কিছু অংশ নির্দিষ্ট করত একে জুম'আহর শর্তের অন্তর্ভুক্ত করার পেছনে কিই বা যৌক্তিকতা ছিল?

ফিক্বহ শাস্ত্রের পন্ডিতগণ জুমু'আহর নামাযের জন্য খুৎবাকে অপরিহার্য বলে সিদ্ধান্ত প্রদানের পেছনে প্রধান কারণ ছিল নবীজীর (স.) অব্যাহত ও ধারাবাহিক অভ্যাস, এমনকি নবীজী (স:) পরবর্তীকালে খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও কেউ কখনও খুৎবা ব্যতিরেকে জুমু'আহর নামায আদায় করেছেন এমন কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়নি। অনুরূপভাবে নবীজীর এবং ছাহাবায়ে কেরামের রীতি হতে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, খুৎবা শুধু হামদ-ছানার মধ্যে সীমিত ছিল না। বরং তাতে থাকত তাক্বওয়ার পথ অবলম্বনের উপদেশ, সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে বিরত থাকার দিক নির্দেশনা। শরীআহর বিধি বিধানের আলোচনা এমনকি চারিত্রিক দিক নির্দেশনাও অন্তর্ভূক্ত থাকত। শুধু তাই নয় খুৎবা প্রদানকালে ইমাম (খতীব) শ্রোতৃমন্ডলীর মধ্য হতে কোন ব্যক্তির কোন বিশেষ ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তাও সংশোধন করতেন। তাছাড়া খতীবের কোন কাজে শ্রোতৃমন্ডলীর কারো কোন আপত্তি থাকলে তাও পেশ করা হত এবং খতীব এ সম্পর্কে হয় প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিতেন অথবা তাঁর বক্তব্য শোধরিয়ে নিতেন।[৪]

নামায ও খুৎবার মধ্যকার আরেকটি পার্থক্য হচ্ছে এই, নামাযে যা কিছু পাঠ করতে হয় তার প্রতিটি শব্দই চিহ্নিত ও নির্দ্ধারিত। তাই কেউ আরবীর জ্ঞান না রাখলেও কিছু নির্দিষ্ট সুরা মুখস্ত করা ও তার অর্থ বুঝে নেয়া কোন দুষ্কর বিষয় নয়। তাই আরবী ভাষায় নামায আদায়ের বাধ্যবাধকতার কারণে নামায আদায়কারী নামাযে পঠিত সুরা ও দু'আর অর্থ বুঝার সুযোগ হতে বঞ্চিত হলো বলা যাবেনা। পক্ষান্তরে খুৎবার জন্য কোন নির্দিষ্ট পাঠ (text) চিহ্নিত নেই প্রত্যেক জুমু'আহর জন্য নতুন খুৎবা প্রদান হয়ে থাকে। তাই যারা আরবী ভাষার জ্ঞান রাখেনা তাদের পক্ষে প্রত্যেক সপ্তাহের পরিবর্তিত খুৎবার অর্থ আয়ত্ব করা সম্ভব না হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব

খুৎবার জন্য আরবী ভাষার অপরিহার্যতা আরোপের অর্থ দাঁড়ায় এই, যারা আরবী ভাষার জ্ঞান রাখে না তাদেরকে এমন কিছু শুনতে বাধ্য করা যা তাদের কাছে কিছু দুর্বোধ্য মন্ত্রের তুল্য। এতে করে বরং খুৎবার আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হতে বাধ্য। একজন সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের পক্ষেও এ কথা বুঝা কঠিন নয় যে একজন তুর্কি ভাষাভাষীর সম্মুখে সংস্কৃত ভাষায় বক্তব্য প্রদান এবং একজন ফার্সী ভাষীর সামনে জার্মান ভাষায় বক্তৃতা দেয়া একটি নিরর্থক প্রচেষ্টা বৈ কিছুই নয়। অতএব বিধান দাতার মত এমন এক বিজ্ঞ সত্ত্বার পক্ষ হতে এমন কোন নির্দেশের আশা বাতুলতা নয় কি যে, তিনি এমন এক ভাষায় উপদেশ দানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করবেন যা শ্রোতাদের কাছে বোধগম্য হবে না?

৫.৩. উপরের আলোচনা হতে তিনটি বিষয় সুস্পষ্ট :

(এক) খুৎবা নামাযের অংশ নয়। তাই যে ভাষায় নামায আদায়ের অপরিহার্যতা রয়েছে সে অপরিহার্যতা খুৎবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

(দুই) যদি এমন কোন ভাষায় খুৎবা প্রদান অপরিহার্য করা হয় যা শ্রোতাদের বোধগম্য নয় তা হলে খুৎবার আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে বাধ্য।

(তিন) নামাযের ভাষা পুরোপুরি আয়ত্বে আনা অনেকের পক্ষে সম্ভব না হলেও সামান্য প্রচেষ্টার দ্বারা এর মোটামোটি অর্থ আয়ত্বে আনা সম্ভব। কেননা এর পরিধি সীমিত কিন্তু খুৎবার পরিধি সীমিত না হওয়ার দরূণ এর অর্থ (বিশেষ আদেশ নিষেধ ও গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা সমূহ) আয়ত্বে আনা মোটেই সহজ নয়। ফলে খুৎবা একটি অর্থহীন আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হবে যদি না এর অর্থ বোধগম্য করা হয়।

৬. আরবী ভাষায় খুৎবা অপরিহার্য হওয়ার দাবী সমূহের পর্যালোচনা :

৬.১ আমাদের অবশ্যই সর্বপ্রথমে দেখতে হবে যে আরবী ভাষায় খুৎবার অপরিহার্যতার পক্ষে আল কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহর কোন বর্ণনা রয়েছে কিনা। তা না পাওয়া গেলে দেখতে হবে কোন বিশুদ্ধ বর্ণনায় এমন কোন ইঙ্গিত রয়েছে কিনা যার ভিত্তিতে আরবী ভাষায় খুৎবা প্রদানের অপরিহার্যতা নির্দ্ধারিত করা যেতে পারে?

এ প্রসঙ্গে এ কথা নির্দ্বধায় বলা যায় যে, পবিত্র কুরআন বা বিশুদ্ধ হাদীসের বিশাল ভান্ডারে এমন কোন বর্ণনার সন্ধান মিলেনি যাতে আরবী ভাষায় খুৎবা প্রদানের অপরিহার্যতা সাব্যস্ত করা যায়।

৬.২ অবশ্য আরবী ভাষায় খুৎবা প্রদানের অপরিহার্যতার দাবীদারগন একটি জোরালো যুক্তি পেশ করে থাকেন তা হলো এই, নবীজীর (স:) যুগ থেকে ছাহাবায়ে কেরাম এমনকি সত্যপন্থী (সলফ ছালেহীন) দের যুগ পর্যন্ত আরবী ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় খুৎবা প্রদানের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁরা আরও বলেন যে, নবীজীর যুগেও অনেক অনারব গোত্রের লোকেরা নবীজীর মসজিদে হাজির হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এমনকি তারা খুৎবা কালে উপস্থিত থাকার কারণে কখনও তাদের বিবচেনায় আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় খুৎবা প্রদান করা হয়নি। তাছাড়া নবীজীর পরবর্তী কালে ইসলামের পরিধি আরব অঞ্চল অতিক্রম করে অনারব অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করলেও আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় খুৎবা প্রদানের প্রথা চালু হয়নি। এ কারণে উলামাদের একটি বড় দল এ মত দিয়েছেন যে, খুৎবা আরবী ভাষাতেই প্রদান করা অপরিহার্য।

অবশ্য উল্লেখ্য যে, ইমামদের মধ্যে আবু হানীফার মত হচ্ছে এই, আরবী ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষাতেও খুৎবা প্রদান অনুমোদিত। অন্যান্য ইমামদের কেউ কেউ শুধু তাদের জন্য আরবী ভাষার খুৎবার বাধ্যবাধকতা আরোপ করেননি যারা আরবী ভাষার জ্ঞান রাখেন না।

৬.৩. সাইয়্যিদ মওদূদী এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, যাঁরা আরবী ভাষায় খুৎবা প্রদানের অপরিহার্যতার পক্ষে রায় দিয়েছেন তাঁরা কয়েকটি ভুল করেছেন। যেমন:

প্রথমত: তাঁরা শরী'আহ বিষয়ক কর্ম ও অভ্যাস সংক্রান্ত কর্মের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন নি। একথা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা যে নবীজীর ভাষা ছিল আরবী তাঁর শ্রোতাদের ভাষাও ছিল আরবী । অথবা দুএকজন অনারব থাকলেও তাঁরা আরবদের সাথে বসবাস করার কারণে আরবী ভাষা বুঝতে কোন সমস্যা হতো না। ভেবে দেখুন আল্লাহর রাসূলের পক্ষে অন্য কোন ভাষায় খুৎবা দানের অবকাশ ছিল কি? এমনকি দু একজন ব্যক্তি যদি এমনও বিদ্যমান ছিলেন যাঁরা আরবী বুঝতেননা তাহলেও অন্য কোন বিকল্প ছিলনা।

নবীজীর পরবর্তী যুগে ইসলাম যখন পার্শ্ববর্তী অনারব অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করেছিল তখনও মুসলমানরা ছিলেন শাসক শ্রেণী। এ কথা ব্যাখ্যার দাবী রাখেনা যে, শাসকদের ভাষাইতো সর্বদা সরকারী ভাষা হিসেবে পরিগণিত হয়। অন্যদের দায়িত্ব হয়ে পড়ে সরকারী ভাষা আয়ত্ব করা। তাই দেখা যায় যে ইসলাম যেখানেই বিস্তৃতি লাভ

করেছিল সে অঞ্চলে আরবী ভাষা ব্যাপকভাবে বোধগম্য হতো। ফলে সরকারী ভাষাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন ভাষায় খুৎবা দানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি।

আরবী কুরআন সুন্নাহর ভাষা হওয়ার পাশাপাশি ইসলামী জ্ঞানের পুরো ভান্ডার কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত আরবীতেই সীমিত ছিল। খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তার পরবর্তী কালের আলেমগন আরবী ভাষাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন ভাষায় দু'আ করাও পছন্দ করতেন না। তাঁদের এ দৃষ্টি ভঙ্গীর পেছনে কি কারণ ছিল তা চিন্তা করলে বুঝতে কষ্ট হবে না যে, তা ছিল মূলতঃ সে যুগের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার কারণে। এ জন্য নয় যে, এ জাতীয় কোন ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যদি তাই হতো তা হলে ইমাম আবু হানীফার (র.) ভিন্ন মত বিষয়ে কোন বর্ণনা লিপিবদ্ধ হতো না।

দ্বিতীয়তঃ পরবর্তীকালে এমন সব দেশের সংখ্যাগরিষ্ট জনগোষ্ঠী ইসলাম গ্রহণ করল যাদের ভাষা আরবী নয়। ফলে ঐসব অঞ্চলের ভাষা সমূহ অমুসলিম জনগোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার পরিবর্তে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভাষাতেই পরিণত হল। যেমন ফার্সী, উর্দ্দু, বাংলা, তুর্কী, মালয় এবং এমন আরো অনেক ভাষা। এ সব ভাষা-ভাষীদের বিরাট সংখ্যাই ইসলামের অনুসারী। এহেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যদি কেউ এ দাবী করেন যে, আরবী ভাষায় খুৎবা দেয়ার অপরিহার্যতা বিষয়ে পূর্ববর্তী উলামাদের ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তা হলে আমাদেরকে বলতে হবে এ সব আলেমদের বড় ভুল হচ্ছে এই, এরা পূর্ববর্তী আলেমদের উক্তি ও অভ্যাসকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করছেন, অথচ সে যুগের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতাকে বিবেচনায় না এনে চক্ষু বন্ধ করে ফতোয়া দিচ্ছেন।

আরবী ভাষায় খুৎবা দানের অপরিহার্যতার উপর আরেকটি দলীল পেশ করা হয়ে থাকে যে, আরবী আল কুরআনের ভাষা এবং ইসলামে সকল আহকামের উৎস হচ্ছে আরবীতে, তাই সকল মুসলমানের উচিৎ আরবী ভাষা শিক্ষা করা ও তা চর্চা করা। তাই লোকেরা আরবী ভাষা বুঝতে অক্ষম, এ দুর্বলতাকে বিবেচনায় এনে খুৎবার ভাষা পরিবর্তন করা মোটেই যুক্তিযুক্ত হবে না।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, এ যুক্তি খুবই শক্তিশালী যে, আরবী একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা এবং সকল মুসলমানের এ ভাষা চর্চা করা উচিৎ। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই, অধিকাংশ অনাবর মুসলিম বাস্তবে আরবী ভাষা বুঝতে সক্ষম নয়। উচিৎ ও বাস্তবতার মধ্যে যে পার্থক্য তাকে অস্বীকার করার কোনই উপায় নেই।[৫]

আরবীতে খুৎবা দানের পক্ষে আরেকটি যুক্তি খুবই জোরালো দেখা যায়। তা হলো আরবী ভাষা হচ্ছে মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক। আরবী ভাষাকে বাদ দিয়ে অন্য ভাষায় খুৎবা প্রদানের প্রথা চালু করা হলে মুসলমানদের মধ্যে ভাষা ভিত্তিক বিভক্তি ছড়িয়ে পড়তে পারে যা কখনও কাম্য নয়। কারণ ইসলামের অবস্থান হচ্ছে অঞ্চল, ভাষা ও গোষ্ঠীগত সকল বিভক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।

এ যুক্তিটি অবশ্যই প্রনিধান যোগ্য। এ সমস্যার সমাধান এভাবে করা যায় যে, খুৎবার একটি অংশ যাতে আল্লাহর হামদছানা রসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম, বিভিন্ন দিক নির্দেশনা বিষয়ক আল কুরআনের আয়াত ও রসূলের হাদীস থাকবে তা মূল আরবী ভাষায় পেশ করা হবে। এর পাশাপাশি শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে ইসলামের যে সকল গুরুত্বপূর্ণ আহকাম ও উপদেশ এবং চলমান পরিস্থিতিতে মুসলমানদের জন্য যে সব দিক নির্দেশনার প্রয়োজন তা হবে অধিকাংশ শ্রোতাদের কাছে বোধগম্য ভাষাতে। এ ক্ষেত্রেও ঐ সব ভাষাকেই প্রাধান্য দেয়া উচিৎ যা বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে অধিকতর বোধগম্য। যেমন ভারত ও পাকিস্তানে সাধারণভাবে উর্দ্দু সকলের কাছে বোধগম্য।[৬] অবশ্য যখন সকল অঞ্চলের মুসলমানদের আন্তর্জাতিক কোন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে তাতে আরবী ভাষার ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত বটে।

৬.৪. সাইয়িদ মওদুদী আরো বলেনঃ জুমু'আহর খুৎবা বিষয়ে জমহুর (অধিকাংশ) আলেমদের এ কড়াকড়ির কথা বিবেচনায় রেখে মুসলিম বিশ্বের কোথাও কোথাও মূল খুৎবার পূর্বে স্থানীয় ভাষায় খুৎবার অনুবাদ পেশ করার রেওয়াজ চালু করা হয়েছে, আবার কোথাও কোথাও জুমু'আর নামাযান্তে অথবা পরবর্তী সপ্তাহে স্থানীয় ভাষায় খুৎবার অনুবাদের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমি মনে করি খুৎবার মূল উদ্দেশ্য অর্জন ও কার্যকারিতার বিচারে এ ব্যবস্থাকে উত্তম বলা যায় না। বরং সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো ইমাম আবু হানীফার মতের অনুসরণে খুৎবার প্রথম দিকে হামদ সানা ও রাসূলের প্রতি দরূদের পর মূল বক্তব্যটি অধিকাংশ শ্রোতাদের কাছে বোধগম্য ভাষায় খুৎবা পেশ করা এবং ইসলামের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা ও আদেশ নিষেধ বিষয়ক আল কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতিসমূহ মূল আরবীতে পাঠ করা।

৭. প্রবন্ধকারের অভিজ্ঞতা :
আমি ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ও লন্ডনসহ অনেক দেশের খতীবদেরকে এ পদ্ধতি অনুসরণ করতে দেখেছি। পাকিস্তান আমলে ঢাকার প্রখ্যাত মুফতী দীন মুহাম্মদকে এবং পরবর্তীকালে মরহুম মৌলানা আমীনুল ইসলামকে দেখেছি যথাক্রমে উর্দু ও বাংলা ভাষায় খুৎবা প্রদান করতে। পাকিস্তানের মুফতী শফী সাহেবের মসজিদেও উর্দু ভাষায় খুৎবা দিতে দেখেছি, মালয়েশিয়ার প্রায় সর্বত্র প্রাথমিক হামদ সানার পর খুৎবাটি মালয় ভাষায় প্রদান করা হয়। লন্ডন, আমেরিকা ও কানাডায় খুৎবা দেয়া হয় ইংরেজীতে। অতএব যাঁরা আরবী ভাষায় খুৎবা প্রদানের উপর ইজমার দাবী করেছেন তাদের জবাবে এও বলা যায় যে আরবী ভাষায় খুৎবাদানের অপরিহার্যতার বিপরীতে বরং আম জনতার ভাষায় খুৎবা দানের বৈধতা বিষয়ে বর্তমান কালের আলেমদের ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৮. শায়খুল আযহারের ফতোয়া :
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শায়খ জাদুল হক এ মর্মে ফতোয়া দান করে বলেন: "আমার মতে ইমাম জুমু'আহর খুৎবাদ্বয়ের প্রত্যেকটি আরবী ভাষায় পেশ করার পর মিম্বরে দাঁড়ানো অবস্থাতেই স্থানীয় ভাষায় এর অনুবাদ পেশ করবেন। এবং আরবী ভাষায় পেশকৃত খুৎবা ও এর অনুবাদ মিলে একটি অভিন্ন খুৎবা বলে বিবেচিত হবে।"[৭]

৯. উপসংহার :
৯.১. উপসংহারে এ কথা উল্লেখ করা বাঞ্চনীয় যে স্থানীয় ভাষায় খুৎবার বৈধতার পক্ষে এ প্রবন্ধে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে- আমার ভয় হচ্ছে যে, তা পাঠ করার পর অনেকে এ মন্তব্য করতে দ্বিধাবোধ করবেন না যে প্রবন্ধকার মনে হয় বিষয়টি নিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি করছেন বা অনধিকার চর্চা করছেন, এদেশে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত আরবীতে খুৎবা দানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। এদের উদ্দেশ্যে আমি বিনীতভাবে বলতে চাই যে, পুরো প্রবন্ধে আমি যে সব যুক্তির উল্লেখ করেছি তার অধিকাংশই আমার নিজস্ব যুক্তি নয় বরং বড় বড় গবেষকদের গবেষণালব্ধ যুক্তিগুলোই আমি পেশ করার প্রয়াস পেয়েছি। তাদের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ যে আমাদের দেশের অধিকাংশ মসজিদ সমূহে ইমাম সাহেবরা খুৎবা প্রদান করেননা বরং এমন কিছু খুৎবা পাঠ করেন, যা শতাব্দী কাল কিংবা এরও পূর্ববর্তীকালে রচিত হয়েছিল। এদের অনেকেই জানেন না তাদের পঠিত খুৎবার মর্মার্থ কি? এমনকি বিশুদ্ধ করে এ খুৎবা পাঠের যোগ্যতাও এদের অনেকের নেই। ফলে এতে কি বলা হলো তা না বুঝার কারণে খুৎবার সময়টুকু শ্রোতারা ঘুমিয়েই কাটায়। এ পরিস্থিতি কি কখনও কাম্য হতে পারে?

৯.২. একটি সমস্যার বিষয়ে সাইয়িদ মওদূদীর সতর্কীকরণ :
সাইয়িদ মওদূদীর প্রতি আল্লাহ করুনা বর্ষণ করুন। তিনি একদিকে যেমন আরবী ভাষায় খুৎবা দানের অপরিহার্যতার বিষয়ে ফতোয়া দানকারীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন অপরদিকে স্থানীয় ভাষায় খুৎবা দানের বিষয়ে উন্মুক্ত লাইসেন্স প্রদানে যে সব সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে সে ব্যাপারেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন: যারা আরবী ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় খুৎবা প্রদানকে অবৈধ, মকরূহ তাহরীমি অথবা সুন্নাতের বিপরীত বলে মন্তব্য করেছেন আমার দৃষ্টিতে তারা ভুল করছেন। তবে এ মাসয়ালার সাথে সম্পৃক্ত আরেকটি দিক রয়েছে যা এতদসংক্রান্ত বিষয়ের বিধান প্রসঙ্গে নয় বরং কিছু বাস্তব সমস্যার সাথে যুক্ত। তা হলো সাধারণের কাছে বোধগম্য ভাষায় খুৎবা দানের যৌক্তিকতা মূলত এজন্য যে, শ্রোতারা যাতে খুৎবায় বিধৃত উপদেশ, বিধি বিধান ও দিক নির্দেশনা বুঝতে পারে এবং এতে উপকৃত হতে পারে। কিন্তু যদি কখনও অবস্থা এমন দাড়ায় যে, এতে জনগনের উপকার হওয়ার পরিবর্তে বরং উল্টো ক্ষতির কারণ হয়ে বসে তাহলে সে সম্পর্কে পূর্ব থেকেই সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন।

বর্তমানে মুসলিম সমাজের অবস্থা এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে ইসলামের দৃষ্টিতে ইমামতের পদ মর্যাদা যেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব ছিল এবং যে পদে সর্বোচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদেরকেই নিয়োজিত করার কথা ছিল সে পদে বর্তমানে নিয়োজিত হচ্ছেন এমন সবলোক যারা অন্য কোথাও কোন গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভে সক্ষম নয়। অনেকটা নাম মাত্র বেতনে এমনকি দুবেলা খাবারের বিনিময়েও এদেরকে নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে।

ইসলামের ইতিহাসে যে মসজিদ একদিন ইসলামের গগনচুম্বী সভ্যতার বিনির্মাণে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল তার দায়িত্ব আজ এমন সব লোকদের হাতে অর্পিত যারা অজ্ঞ, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী, ভিরু এবং চারিত্রিক দিক দিয়েও নিম্নমানের। এদের নিকট থেকে কি আপনি এ আশা করতে পারেন যে এরা মাতৃভাষায়

খুৎবা প্রদান করে মানুষকে ধর্মীয় দিক নির্দেশনা ও জাগতিক নেতৃত্বের পথ দেখাতে পারবেন? অপর পক্ষে বেশী দলাদলি ও সংকীর্ণ মতপার্থক্যে বিভক্ত জনগণের ভাষায় খুৎবা দানের সুযোগে এরা এত বেশী বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা করবেন ও নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এমন সব অসার যুক্তির অবতারনা করবেন যাতে মসজিদে ঝগড়া বিবাদ এমনকি মাথা ফাটাফাটির আশংকাও উড়িয়ে দেখা যায় না। কারণ এসব উলামারা নিজেদের মতের পক্ষে এত কঠোর ও সংকীর্ন মনা যে ভিন্ন মতালম্বীদের প্রতি কোনরূপ সৌজন্য প্রদর্শন করা গুনাহের তুল্য মনে করে থাকেন। আর এদের ভাষার মধ্যে এমন এক কঠোর ভঙ্গী রয়েছে যা অন্যদের অন্তরকে ক্ষত বিক্ষত করা ব্যতীত কোন বক্তব্যই এরা রাখতে পারেন না। পরিস্থিতি এমনও হতে পারে যে প্রত্যেক মতবাদের লোকদের জন্য আলাদা আলাদা জুমু'আহর আয়োজন করতে হবে। অপর পক্ষে সাধারণ শিক্ষিত লোকেরা যারা এসব বিতর্কে কোন দলের অন্তর্ভুক্ত নয় তারা লক্ষ্য করবেন যে খতীবগন মিম্বরে দাড়িয়েই দুর্বল হাদীস, অসাড় যুক্তি ও ইসলামের অপব্যাখ্যা প্রদান করছেন যাতে করে কোন অমুসলিম সত্যানুসারী হওয়া দুরে থাক মুসলমানদেরও বরং ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা দুষ্কর হয়ে পড়বে।

তাছাড়া ধর্মীয় মতপার্থক্যের কথা বাদ দিলেও বর্তমানে মুসলমানরা এত বেশী রাজনৈতিক মতপার্থক্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছে যে, যদি কোন মসজিদের ইমামতের দায়িত্ব কোন মিস্টার জাতীয় মৌলভী অথবা মৌলভী মার্কা মিস্টারের উপর অর্পিত হয় তা হলে তিনি আপন দলের সমর্থন ও বিপক্ষীয় দলের লোকদের হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবেন। এভাবে একটি নতুন ফিৎনার উদ্ভব হওয়াও বিচিত্র নয়, যার ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে নামায আদায় পর্যন্ত দুরূহ হতে পারে।

তাই আমার দৃষ্টিতে আরবী ভাষার স্থলে স্থানীয় ভাষায় খুৎবার প্রথা চালুর পূর্বে এসব উদ্ভুত সমস্যাবলীর সমাধান বিষয়ে ভালোভাবে চিন্তা ভাবনা করে কিছু সতর্কতা মূলক পদক্ষেপও নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এ সমস্যার সমাধান এভাবেই সম্ভব যে, ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী কোন মধ্যপন্থী দল বা সংস্থা খুৎবা রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, এবং এসব খুৎবায় মত বিরোধের বিষয়গুলোর অবতারনা পরিহার করা হবে আর মুসলমানদের মধ্যে বিশুদ্ধ ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গী ও দ্বীনি জযবা সৃষ্টির চেষ্টা করা হবে। আর সকলের চেষ্টা থাকবে যেন এ খুৎবাটি জুমু'আহর দিন একটি অঞ্চলের মসজিদসমূহে পেশ করা হয়। অথবা যদি কোন মসজিদে কোন যোগ্য ও শ্রোতৃমন্ডলীর কাছে গ্রহনযোগ্য কোন খতীব পাওয়া যায় যিনি এ দায়িত্বটি কাংখিত মানের করে আদায় করতে পারেন তাহলে এ সুযোগ গ্রহণ করা যায়। অন্যথায় অযোগ্য খতীবদের স্বেচ্ছাচারিতার উপর ছেড়ে দেয়ার চাইতে কম ক্ষতিকর ও প্রচলিত আরবী খুৎবা চালু রাখাই বাঞ্চনীয়।

তথ্যসূত্র

১ দেখুন ফতহুল ক্বদীর ১ম ,পৃ : ৪১৭. ও ইবন আবেদীন ১ম, পৃ : ৭৪৩

২ এ প্রবন্ধে বিভিন্ন মযহাবের যে সকল মতামতের উল্লেখ করা হয়েছে তার সূত্র মাজাল্লাতুল আযহার ৬৩ তম বর্ষ, জুমাদা আল উলা ১৪১১ হিজরী ডিসেম্বর ১৯৯১ সংখ্যায় প্রকাশিত খুৎবাতুল জুমআহ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ। বিস্তারিত তথ্যের জন্য মূল প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩ আল মবসূত: ৮ম খন্ড, জুমু আহ অধ্যায় ; তোফহীমাৎ ২য় খন্ড পৃ: ২০৪ দ্রষ্টব্য

৪ যেমনটি হযরত উমর (রা:) কর্তৃক খুৎবা প্রদানকালে অতিরিক্তি মহর ধার্য করার সমালোচনায় জনৈক মহিলা আপত্তি উথাপন করলেন যে খোদ আল্লাহ মহিলাদের মহর সম্পর্কে বলেছেন যে: "যদি তোমরা এদের কাউকে মহর হিসেবে ধন ভান্ডারও প্রদান করো তাহলেও তা ফেরৎ নিওনা" সুতরাং এ অধিকার খর্ব করার কোন অধিকার আছে কি আপনার? তখন হযরত উমর ভুল স্বীকার করে নিজ বক্তব্য প্রত্যাহার করলেন। এবং বললেন: মহিলার কথাই সঠিক।

৫ কোন কোন দেশে তা শিক্ষা ব্যবস্থা হতে আরবী এবং ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকেও ঝাঁঠিয়ে বের করে দেয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এমতাবস্থায় মুসলমানদেরকে আরবীতে খুৎবা শুনানোর জন্য বাধ্য করার মধ্যে কি কোন কল্যাণ আছে?

৬ মালয় অঞ্চলে মালয় ভাষা ও বাংলাদেশে বিশুদ্ধ বাংলাভাষা, ইউরোপ আমেরিকা ও কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় ইংরেজী ভাষা সকলের কাছে বোধগম্য ইত্যাদি।

৭ দেখুন আল আযহার সাময়িকী, ৬৩ তম বর্ষ, জুমাদা আল উখরা সংখ্যা- ১৪১১ হি:/১৯৯১ ইং পৃষ্ঠা ৬১২-৬১৬

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 15-25)

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় 'উশর এর ভূমিকা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

প্রফেসর ড.আ.ক.ম.আবদুল কাদের*

ভূমিকা:

'উশর ইসলামী অর্থব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর সম্পর্ক ভূমি হতে উৎপাদিত ফসলের সাথে। বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ হওয়ার কারণে এ দেশের অর্থব্যবস্থার উন্নয়ন,প্রবৃদ্ধি সাধন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে 'উশর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৫% মুসলিম। অথচ তারা 'উশর এর ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ শর'য়ী বিধান সম্পর্কে অবহিত নয়। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে 'উশর এর পরিচয়, এর সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন দিক এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর প্রায়োগিকতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

'উশর -এর পরিচয়:

'উশর'(العشر)শব্দটি একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হল - এক দশমাংশ جزء من عشرة (أجزاء)।[১] ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায়-মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভূমি হতে উৎপাদিত ফসলের যাকাত হিসাবে ভূমির প্রকারভেদে ১/১০ (এক দশমাংশ) অথবা ১/২০ তথা ৫ শতাংশ ফসল শরীয়াহ নির্ধারিত খাতসমূহে আদায় করাকে 'উশর বলা হয়।[২] ফিকহ ও হাদীসের গ্রন্থসমূহে 'উশরকে 'সাদাকাত' এবং যাকাত হিসাবেও অভিহিত করা হয়েছে। ১/১০ তথা 'উশর এবং ১/২০ তথা অর্ধ 'উশর ফরয হওয়ার বিষয়টি আল-কুরআন, সুন্নাহ এবং আয়িম্মায়ে কিরামের ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট একটি ফরয ইবাদত।

'উশর ফরয হওয়ার দার্শনিক ভিত্তি:

ভূমি হচ্ছে উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্র এবং জীবন-জীবিকার প্রধান উৎস। মহান আল্লাহ ভূমিকে মানুষের বসবাসযোগ্য করে সৃষ্টি করেছেন এবং একে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। আর জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় রিয্ক উৎপাদনের লক্ষ্যে এতে উর্বরাশক্তি দান করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

(وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ).

অর্থাৎ "নি:সন্দেহে আমি তোমাদেরকে এ যমীনে ক্ষমতা-ইখতিয়ার দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং এখানে তোমাদের জন্য জীবন-জীবিকার সামগ্রীর ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।" (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ১০।)

বস্তুত ভুমিতে বীজ বপন হতে শুরু করে ফসল উৎপাদন করা পর্যন্ত সকল পর্যায়ে অসীম শক্তির আধার মহান আল্লাহর অনুগ্রহের বিশেষ ছোঁয়ার প্রয়োজন পড়ে। পৃথিবীর সকল অঞ্চলের মাটি সমান উর্বরাশক্তি সম্পন্ন নয় এবং সকল মাটি সমান উৎপাদনশীলও নয়। বীজ লাগানোর পর অংকুরোদগম হওয়া হতে শুরু করে ফসল উৎপাদনক্ষম হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে পানির প্রয়োজন হয়। মহান আল্লাহ অনেক সময় তা আকাশ হতে বর্ষণ করেন। খাল-বিল, নদী-নালা এবং ঝর্ণা থেকেও তার ব্যবস্থা হয়ে থাকে, আবার মাটির গভীর হতেও পানি আহরণ করা যায়। মহান আল্লাহর কুদরতী ব্যবাস্থাপনায় এসব কিছু সম্পন্ন হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মানুষের কৃতিত্ব নিতান্ত গৌণ।

মহান আল্লাহ বলেন :

(أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ(٦٥) إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (٦٦) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ)

অর্থাৎ-" তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি ? তোমরা তাকে উৎপন্ন কর না আমি উৎপাদনকারী ? আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটা বানিয়ে দিতে পারি, অত:পর তোমরা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে যাবে।

---

* ডীন, ফ্যাকাল্টি অব শরীয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

(বলবে) আমরা তো ঋণের চাপে পড়ে গেলাম । বরং আমরা হৃত-সর্বস্ব হয়ে পড়লাম" । (আল্-কুরআন, সূরা আল্ ওয়াকিয়াহ, আয়াত ৬৩-৬৭ ।)

মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন-

(وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (٣٣)وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (٣٤) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ)

অর্থাৎ -"আর তাদের জন্য নিদর্শন হল মৃত ভূমি, আমি একে সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য, তারা তা থেকে ভক্ষণ করে । আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং তাতে প্রবাহিত করি নির্ঝরিণী, যাতে তারা তার ফল খায় এবং তাদের হাত একে সৃষ্টি করে না । অত:পর তারা কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না "?

(আল্-কুরআন, সূরা ইয়াসীন, আয়াত ৩৩-৩৫ ।)

মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন -

(فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (٢٤) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (٢٩) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (٣٠) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (٣١) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ)

অর্থাৎ-"মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, আমরা প্রচুর পানি বর্ষণ করেছি,অত:পর ভূমিকে উত্তমরূপে বিদীর্ণ করেছি । অত:পর তাতে শস্য উৎপন্ন করেছি । আর উৎপন্ন করেছি আঙ্গুর, শাক-সবজি,যয়তূন, খেজুর ,ঘন-সন্নিবেশিত উদ্যান,রকমারী ফল ও ঘাস । তোমাদের জন্য ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলোর জন্য জীবিকার সামগ্রী হিসাবে" । (আল্-কুরআন, সূরা আবাসা, আয়াত ২৪-৩২)

আল-কুরআনের উপরোক্ত আয়াতসমুহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহর একক ব্যবস্থাপনা ও সুনিপুণ কারুকার্যতায় তাঁরই সৃষ্ট এই ভূমি ফসল ও ফল-ফলাদির সমারোহে প্রাচুর্যময় হয়ে উঠে । তাই ভূমি হতে উৎপন্ন ফসলের 'উশর আদায়ের মাধ্যমেই কেবল তাঁর নিয়ামতের শুকর-গুজারী আদায় হতে পারে । যেহেতু উৎপাদন হল জমির প্রবৃদ্ধির অংশ,আর যে সব সম্পদে প্রবৃদ্ধি সাধিত হয় তাতে যাকাত ফরয,তাই ভূমির উৎপাদিত ফসল এবং ফল-মূলে 'উশর আদায়ের বিধানকে শরীয়াত আবশ্যম্ভাবী কর্তব্যরূপে চিহ্নিত করেছে ।[৩]

'উশর ফরয হওয়ার শরয়ী দলীল:

হাদীস এবং ফিকহের গ্রন্থসমূহে 'উশর বিষয়ক আলোচনা যাকাত অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে । আল-কুরআনে 'উশর শব্দের উল্লেখ নেই, তবে এতে ভূমি হতে উৎপন্ন ফসলের 'হক্ক' আদায় করার নির্দেশ রয়েছে । এ্যাসিরীয় ভাষায় - ISH-RU-U (ইশরুউ) এবং হিব্রু ভাষায় MAASHER (মাআশের) শব্দের উল্লেখ রয়েছে যার অর্থ হল শাসকবৃন্দ কর্তৃক ফসলের উপর ধার্যকৃত দশমাংশ কর । হযরত মূসা (আ.) কর্তৃক আনীত শরয়ী বিধানে গঅঅঝঐঊজ তথা দশমাংশ কর বাধ্যতামূলক প্রবর্তনের উল্লেখ আছে ।[৪] খৃষ্টানদের বাইবেলেও টঝঐটজ শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় ।[৫] প্রাচীন আরবের পৌত্তলিকরা ভূমির উৎপন্ন ফসল এবং পশু সম্পদ হতে দেবতার উদ্দেশ্যে নৈবদ্য প্রদানের বিষয়টি আল-কুরআনে আলোচিত হয়েছে । মহান আল্লাহ বলেন-

(وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا)

অর্থাৎ " আর এই লোকেরা আল্লাহর জন্য তাঁরই পয়দা করা ক্ষেত-খামারের ফসল এবং গৃহপালিত পশু হতে একটি অংশ নির্দিষ্ট করেছে ।" (সূরা আল্-আনআম, আয়াত ১৩৬ ।)

ইসলাম ভূমির উপর ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে । একজন ব্যক্তি কি পরিমাণ ভূমির মালিক হবে ইসলাম তার সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়নি সত্য ;তবে এই মালিকানা বৈধ পন্থায় হওয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করে । নিজের জমি নিজেকেই চাষাবাদ করতে হবে এমন শর্তও ইসলামে নেই । নিজে চাষাবাদ করলে অথবা অন্যের সাথে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে চাষাবাদ করলে কিংবা বার্ষিক কেরায়ার ভিত্তিতে অন্য কাউকে চাষাবাদের জন্য প্রদান করলে ইসলাম তা অনুমোদন করে । তবে এক্ষেত্রে মালিক এবং কৃষকের দায়িত্ব ,কর্তব্য ও অধিকার সুনির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্চনীয় । আর চাষাবাদের পর উৎপাদিত ফসল নিসাব পরিমাণ হলে তা হতে শরীয়াত নির্ধারিত অংশ সুনির্দিষ্ট খাত সমূহে যাকাত হিসাবে প্রদান করারও ইসলামে নির্দেশ রয়েছে । শরীয়তের পরিভাষায় একে 'উশর বলা হয় ।

মহান আল্লাহ সম্পদে বছরে কেবল একবার যাকাত ফরয করেছেন, আর কৃষি ক্ষেত্রে যাকাত তথা 'উশর' ফরয হওয়ার বিষয়টি বছর অতিক্রমণের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এর সম্পর্ক ফসল উৎপাদন ও তা আহরণের সাথে।[৬] মালিক কিংবা কৃষকের ভূমির প্রকার, কায়িক শ্রম এবং উৎপাদন ব্যয় অনুসারে উৎপাদিত ফসলের 'উশরের পরিমাণেও তারতম্য হয়ে থাকে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, মহানবী (সা.)-এর হাদীস এবং সাহাবা , তাবিঈন ও মুজতাহিদ ইমামগণের ইজমার ভিত্তিতে এটি প্রমাণিত যে, স্বাভাবিক উপায়ে উৎপাদিত ফসলে 'উশর তথা ১/১০ অংশ এবং কৃত্রিম উপায়ে তথা সেচ ইত্যাদির মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলে অর্ধ 'উশর তথা ১/২০ অংশ আদায় করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ)

অর্থাৎ - "হে ঈমানদারগণ ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপাদন করেছি তা হতে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর।" (সূরা আল্-বাকারাহ, আয়াত ২৬৭।)

উপরোক্ত আয়াতের ومما أخرجنا لكم من الارض অংশের ব্যাখ্যায় আল্লামা তাবারী (রহ.) ভূমি হতে উৎপাদিত ফসল ও ফলের উপর যে সাদাকাত ও যাকাত ওয়াজিব হয়েছে তা আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।[৭] আর ফসল ও ফলের যাকাত হচেছ 'উশর।

মহান আল্লাহ বলেন-

(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)

অর্থাৎ - "তিনিই আল্লাহ যিনি নানা প্রকারের লতা বিশিষ্ট এবং স্বীয় কান্ডের উপর দন্ডায়মান বৃক্ষ বিশিষ্ট বাগান সৃষ্টি করেছেন। আর যিনি খেজুর গাছ ও শস্য ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছেন যা হতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য লাভ করা যায় । আর যিনি যায়তুন আর আনারের গাছ সৃষ্টি করেছেন , যে গুলোর ফল বাহ্যিকরূপে সাদৃশ্যপূর্ণ কিন্তু স্বাদে রয়েছে বৈসাদৃশ্য । তোমরা এগুলোর ফল খাও যখন তা ফলন্ত হয়, আর কর্তনের সময় এর 'হক্ক'আদায় কর। আর তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না"। (সূরা আল-আন্আম, আয়াত ১৪১)

উক্ত আয়াতে বর্ণিত - واتوا حقه يوم حصاده (আর কর্তনের সময় তোমরা এর হক আদায় কর)-এর ব্যাখ্যায় হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) এবং হাসান বসরী (রহ.) হতে এর দ্বারা ফরয যাকাতের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে বলে বর্ণিত আছে।[৮] পক্ষান্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) এর দ্বারা 'উশর এবং অর্ধ 'উশর প্রদানের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন।[৯] এ আয়াতটি মক্কী যুগে নাযিল হয়েছে এবং প্রাথমিক অবস্থায় এর দ্বারা যাকাত নির্দেশ করা হয়েছে সত্য, কিন্তু পরবর্তীতে মহানবীর (স.) সুস্পষ্ট হাদীসের ভিত্তিতে এর দ্বারা 'উশর কিংবা অর্ধ 'উশর বুঝানো হয়।

'উশর কিংবা অর্ধ উশর ফরয হওয়া বিষয়ে মহানবীর নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রণিধান যোগ্য-[১০]

عن عبد الله عمر عن ابيه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وما سقىبا لنضح نصف العشر .

অর্থাৎ -" হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) হতে বর্ণিত,তিনি তাঁর পিতা উমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন , তিনি মহানবী (স.) হতে বর্ণনা করেন। মহানবী (স.) বলেন- যে সব ভূমি বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা অথবা নদ-নদী দ্বারা স্বভাবিক ভাবে সিঞ্চিত হয় তাতে 'উশর ধার্য্য হবে, আর যে সব ভূমিতে পানি সেচ করতে হয় তাতে অর্ধ 'উশর ধার্য্য হবে"।

এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীসটি ও উল্লেখ করা যেতে পারে-[১১]

عن جابر بن عبد الله انه سمع النبى صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الانهار والغيم العشور وفيما سقى بالسانية نصف العشر .

অর্থাৎ -"যাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত ,তিনি মহানবী (স.)-কে ইরশাদ করতে শুনেছেন, মহানবী (সা.) বলেন - খাল-নদী ও বৃষ্টির পানিতে ফসল উৎপাদিত হলে তাতে 'উশর ধার্য্য হবে। আর সেচের মাধ্যমে সিক্ত হয়ে ফসল উৎপাদিত হলে অর্ধ 'উশর ধার্য্য হবে।"

ইয়ামনে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মহানবী (সা.) ইয়ামনবাসীদের নিকট যে পত্র দেন তাতে তিনি উল্লেখ করেন যে, যে সব ভূমিতে প্রবাহিত নহরের পানির সাহায্যে ফসল উৎপন্ন হয় তাতে 'উশর এবং যে ভূমিতে কৃত্রিম উপায়ে সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপন্ন হয় তাতে অর্ধ 'উশর দিতে হবে।[১২]

'উশরী ভূমি, 'উশর আদায় পদ্ধতি এবং 'উশর আরোপের ক্ষেত্রে ফসলের প্রকার ভেদ ইত্যাদিতে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে কিছু মতভেদ থাকলেও ভূমির উৎপাদিত ফসলে 'উশর কিংবা অর্ধ 'উশর ফরয হওয়া বিষয়ে তাঁদের মধ্যে 'ইজমা' তথা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[১৩]

'উশরী ভূমির পরিচয়:

মহানবীর (স.) যুগে মক্কা, মদীনা, ইয়ামানসহ সমগ্র আরব ভূমি 'উশরী ভুমি হিসাবে পরিগণিত হয়। ইসলামী সম্রাজ্যের বিস্তৃতির ফলে 'উশরী ভুমির পরিমাণও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়। মুসলিমদের নতুন নতুন অঞ্চল বিজয়ের পর বিজিত অঞ্চলের পরিত্যক্ত ভূমি 'উশর প্রদানের শর্তে মুসলমানদেরকে প্রদান করা হয়। শান্তিপূর্ণ সন্ধি সূত্রে যে সব ভূমি মুসলমানদের দখলে আসত তাতে ইতোপূর্বে কোন ভূমিকর ধার্য্য না থাকলে সেগুলো 'উশর আদায়ের শর্তে মুসলমানদের নিকট পত্তন দেয়া হত। যে সব ভূমির উপর কোন কর ধার্য্য ছিল না সে গুলোর মালিক ইসলাম কবুল করলে এবং তাতে তার মালিকানা বহাল থাকলে সে সব 'ভূমি উশরী ভূমি হিসাবে পরিগণিত হত।[১৪] পরিত্যক্ত ভূমি যা আবাদ করার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ হতে বন্টন করা হয় , মৃত ভূমি যা কোন মুসলিম পানি সেঞ্চন করে আবাদ ও সঞ্জীবিত করে, কোন মুসলিম অপর কোন মুসলিম থেকে ক্রয় কিংবা দান সূত্রে যেই ভূমির মালিকানা অর্জন করে এবং সেই ভূমি যদি কোন স্বাধীন মুসলিম চাষাবাদ করে তবে তাও 'উশরী ভূমি হিসাবে পরিচিত হবে।[১৫]

ইমাম আবূ ইউসুফের মতে - যেসব ভূমির মালিক ইসলাম কবুল করেছে, সেই সব ভূমির উপর তাদের মালিকানা পূর্ববৎ বহাল থাকবে এবং তা 'উশরী ভূমি হিসাবে পরিগণিত হবে।[১৬] মুসলিম বিজয়ের পর যদি অধিকৃত অঞ্চলের কোন ভূমি যোদ্ধাদের মাঝে গণীমত হিসাবে বন্টন করা হয় তাও 'উশরী ভূমি হিসাবে পরিগণিত হবে।[১৭] প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ আল্লামা কাসানী 'উশরী ভূমির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন- হিজায ও আরবের সমুদয় ভূমি,বিনা যুদ্ধে বিজিত অঞ্চলের ইসলাম গ্রহণকারী জনগোষ্ঠীর মালিকানাধীন ভূমি, যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে বিজিত অঞ্চলের সেই সব ভূমি যা রাষ্ট্র প্রধান গণীমতের সম্পদ হিসাবে মুসলিম যোদ্ধাদের নিকট বন্টন করেন এবং পরিত্যক্ত ভূমি যা সরকারের অনুমতিক্রমে মুসলিমগণ চাষাবাদের জন্য আবাদ করে নেয় তা 'উশরী ভূমিরূপে পরিগণিত হবে।[১৮]

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) তিন প্রকারের ভূমিকে 'উশরী ভূমি- রূপে চিহ্নিত করেছেন।

১. মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলের যে ভূমি মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়;

২. এমন ভূমি যার মালিকগণ স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করেন এবং ভূমির মালিকানা তাদের নিকট বহাল থাকে, এবং

৩. আরবের সমুদয় ভূমি।[১৯]

মোট কথা, কোন লোক ইসলাম কবুল করলে তার চাষাবাদযোগ্য ভূমি,আরবের সমুদয় ভূমি, মুজাহিদগণ ও গণীমত প্রাপ্তদের মধ্যে বন্টনকৃত বিজিত অঞ্চলের ভূমি, কোন পরিত্যক্ত ভূমি যা মুসলমানগণ আবাদ করেছেন, সরকারী খাস ভূমি যা মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করা হয় এবং উত্তরাধিকারীবিহীন যিম্মীর মৃত্যুর পর মুসলমানদের দখলে আসা ভূমি 'উশরী ভূমি হিসাবে পরিগণিত হবে।[২০]

কোন কোন ফসলে 'উশর ফরয?:

'উশর মুসলমানদের ভূমিতে উৎপাদিত কৃষি ফসলের সাথে সম্পৃক্ত একটি বিষয়। কিন্তু কোন ধরনের ফসলের 'উশর প্রদান করতে হবে এ বিষয়ে ইসলামী আইনবেত্তা ও মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। হযরত অব্দুল্লাহ ইবন 'উমর (রা.) কিছু সংখ্যক তাবি'ঈ এবং পরবর্তী কিছু ফকীহ এ মত পোষণ করেন যে, গম ও যব ব্যতীত অন্য কোন শস্যে এবং খেজুর ,কিসমিস ও মুনাক্কা ব্যতীত অন্য কোন ফলে 'উশর নেই। প্রমাণ হিসাবে তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসটি উপস্থাপন করেন -[২১]

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال انما سن رسول لله صلى الله عليه وسلم الزكاة فى هذه الخمسة فى الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة .

ইমাম মালিক (রহ.) -এর মতে - যে সব ফসল খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং যা সংরক্ষণ উপযোগী তাতে 'উশর ফরয । যথা-ভুট্টা, গম, ধান, ডাল ইত্যাদি ।

তিনি বলেন -[২২]

السنة عندنا فى الحبوب التى يدخرها الناس ويأكلونها انه يؤخذمما سقت السماء من ذلك والعيون وما كان بعلا العشر.

তাঁর মতে - আখরোট, বাদাম, কিসমিস, পেস্তা , আপেল, ডালিম, পেয়ারা , যয়তুন, ইত্যাদি সংরক্ষণ উপযোগী হলেও এগুলো সাধারণত: খাদ্য হিসাবে প্রসিদ্ধ নয় । তাই এগুলোতে 'উশর ফরয নয় ।[২৩] কিন্তু ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর মতে - যেহেতু হিজাযের অধিবাসীগণ খেজুর ও আঙ্গুরের উপর অধিক নির্ভরশীল তাই এগুলোর উপরও 'উশর ধার্য্য করা হবে ।[২৪]

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) এর মতে - যে সব উৎপাদিত ফসল পরিমাপ করা যায় ,সংরক্ষণ করা যায় এবং শুকিয়ে রাখা যায় সেই সব ফসলের 'উশর আদায় করতে হবে । যথা ভুট্টা, গম, খোসাবিহীন যব, ধান, শস্য, তৈলবীজ, সীমবীচি, মসুর, কলাই, বুট, জিরা, ধনিয়া, প্রভৃতি । আর সব ধরনের ফল মূলও শাক-সবজি যেহেত সংরক্ষণ উপযোগী নয় ,তাই তাতে কোন 'উশর নেই ।[২৫]

ইমাম আবু হানীফার (রহ.)মতে- জমি চাষাবাদের মূল লক্ষ্য হল উৎপাদন । তাই উৎপাদিত ফসলে 'উশর কিংবা অর্ধ উশর প্রদান করতে হবে । এমন কি,ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ও অর্থ উপার্জনের নিমিত্তে বাঁশ, বেত, ঘাস, কাঠ, ইত্যাদি উৎপাদন করা হলে তাতেও 'উশর কিংবা অর্ধ 'উশর প্রদান করতে হবে ।[২৬] তাঁর মতে - উৎপাদিত পণ্য খাদ্য দ্রব্য জাতীয় হওয়া, সংরক্ষণ উপযোগী হওয়া, শুকিয়ে রাখার উপযোগী হওয়া ও পরিমাপ যোগ্য হওয়া শর্ত নয় । তিনি তাঁর মতের স্বপক্ষে নিম্নোক্ত দলীলসমূহ পেশ করেন ।

এক : ومما اخرجنا لكم من الأرض (আর যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি হতে উৎপন্ন করেছি) শীর্ষক আল-কুরআনের বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভূমি হতে উৎপাদিত যে কোন ফসলেই 'উশর ফরয ।

দুই : আল- কুরআনের وأتوا حقه يوم حصاده (আর কর্তনের সময় তোমরা এর হক্ক আদায় কর) শীর্ষক বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উৎপাদিত ফসল এবং ফল কর্তনের দিনই তার 'উশর অথবা অর্ধ 'উশর আদায় করতে হবে । কোন ধরনের ফসলের 'উশর আদায় করতে হবে তার কোন প্রকার ভেদ বর্ণনা করা হয়নি ।

তিন : মহনবী (স.) এর বাণী - فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر (যে ভূমি বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা অথবা নদ-নদী দ্বারা স্বভাবিকভাবে সিঞ্চিত হয় তাতে 'উশর ধার্য্য হবে) দ্বারা প্রামণিত হয় যে, ভূমি হতে উৎপাদিত সব ধরনের ফসলে 'উশর কিংবা অর্ধ 'উশর ফরয ।[২৭]

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রসঙ্গিক মনে করি । আর তা হলো, ফসল আহরণের দিন তার 'হক্ক' আদায় করা বিষয়ে মহান আল্লাহ যে নির্দেশ প্রদান করেছেন তা এমন ফসলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা সংরক্ষণ উপযোগী নয় । কারণ, তাতে বিলম্বে 'উশর প্রদান করা হলে সেগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে । কিন্তু কিছু কিছু ফসলের 'উশর দারিদ্র্য বিমোচনের স্বার্থে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার অধীনে ইসলামী রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে সংগ্রহ করার প্রয়োজন দেখা দিলে এবং সে গুলো সংরক্ষণ উপযোগী হওয়ার করণে তা নষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা না থাকার কারণে সেগুলোতে 'উশর বিলম্বে আদায় করা হলেও কোন অসুবিধা নেই । যেমন - ধান, যব, ভুট্টা, ইত্যাদি ।

'উশরের নিসাব :

'উশর যেহেতু ভূমির উৎপাদিত ফসলের উপর ফরয তাই এটি উৎপাদিত ফসল হতেই আদায় করতে হয় । এখন প্রশ্ন হল, কি পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হলে তাতে 'উশর প্রদান করতে হবে ? উশরের নিসাব বা পরিমাণ নিয়ে সাহাবা কিরাম এবং আয়িম্মা মুজতাহিদীন - এর মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় । হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর ও জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা.) প্রমূখ সাহাবী, 'উমর ইবন 'আবদুল 'আযীয, হাসান বসরী, 'আতা, মাকহুল, ইবরাহীম নাখ'ঈ, প্রমুখ তবি'ঈ এবং ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, সুফিয়ান আল - ছাওরী, আওযা'ঈ ও ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) প্রমুখ ফিকহ্ শাস্ত্রবিদগণের মতে -

উৎপাদিত ফসলে 'উশরের নিসাব হল পাঁচ ওসক। উৎপাদিত ফসল পাঁচ ওসকের কম হলে তাতে 'উশর ফরয হবে না।[২৮] এ মতের সমর্থনে তাঁরা নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতসমূহ উপস্থাপন করেন -

(ক)عن ابى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ليس دون خمسة أوسق صدقة ولادون خمس ذود صدقة ولادون خمسةأواق صدقة .

অর্থাৎ-"আবূ সাঈদ খুদরী হতে বর্ণিত , মহানবী (সা.) বলেন -ফসল পাঁচ ওসকের কম হলে সাদাকাহ নেই, উট পাঁচটির কম হলে সাদাকাহ নেই,এবং রূপা পাঁচ আওকিয়ার কম হলে সাদাকাহ নেই " ।[২৯]

(খ)عن ابى سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فى حب ولاتمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق.

অর্থাৎ -হযরত আবূ সাঈদ খুদরী হতে বর্ণিত, মহানবী (স.) বলেন - কোন শস্য কিংবা খেজুর পাঁচ ওসক না হওয়া পর্যন্ত তাতে সাদাকাহ তথা 'উশর নেই" ।[৩০]

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে -'উশরের নির্দিষ্ট কোন নিসাব নেই । উৎপাদিত ফসল কম হোক কিংবা বেশী হোক , তা বৃষ্টির পানিতে সিক্ত হয়ে উৎপাদিত হলে তাতে 'উশর এবং কৃত্রিম উপায়ে পানি সেঞ্চনের মাধ্যমে উৎপাদিত হলে তাতে অর্ধ 'উশর প্রদান করতে হবে। প্রমাণ হিসাবে তিনি আল- কুরআনের আয়াত ومما أخرجنا لكم من الارض এবং وأتوا حقه يوم حصاده ও মহানবীর (সা.) হাদীস . فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وما سقى با لنضح نصف العشر প্রভৃতি উপস্থাপন করেন। এতে উশর আদায়ের বিষয়ে বলা হলেও এর কোন নিসাব বর্ণনা করা হয়নি।[৩১] ইমাম আবূ হানীফার শিষ্য ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)বলেন - আমরা ইমাম আবূ হানীফার এই মতকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না। বরং এ ক্ষেত্রে আমরা ليس دون خمسة اوسق صدقة তথা "পাঁচ ওসকের কম ফসলে কোন সদকাহ নেই" শীর্ষক মহানবীর (সা.) হাদীসটি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করবো।[৩২]

দেশের প্রায় প্রতিটি নাগরিক কিছু না কিছু শস্য ও ফসল উৎপাদন করে থাকেন। যদি উৎপাদিত ফসলের উপরে ন্যূনতম কোন নিসাব না থাকে তা হলে সকল উৎপাদনকারীকে 'উশর আদায় করতে হবে। ফলে 'উশর গ্রহণকারী পাওয়া দুষ্কর হবে।তা ছাড়া মহানবী (সা.)- تؤخذ من أغنيائهم وتردّ إلى فقرائهم শীর্ষক বাণীর মাধ্যমে ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় এবং গরীবদের মধ্যে তা বিলি-বন্টনের যে দর্শন পেশ করেছেন তাও ব্যাহত হবে।[৩৩] এতে বুঝা যায় , স্বর্ণ-রৌপ্যের নিসাবের ন্যায় উৎপাদিত ফসলেরও একটা নিসাব থাকা বাঞ্চনীয়,আর তা হল মহানবী (সা.) কর্তৃক নির্ধারিত পাঁচ ওসক। আল -কুরআনের واتوا حقه يوم حصاده শীর্ষক আয়াতটি নাযিল হয়েছে মক্কী যুগে , যাতে ফসল ও ফলের উৎপাদিত অংশের 'হক্ব' তথা যাকাত /সাদাকাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর ومما اخرجنا لكم من الارض শীর্ষক আয়াতে এবং فيما سقت السماء والعيون اوكان عثريا العشر শীর্ষক হাদীসে ভূমি হতে উৎপাদিত ফসলে 'উশর প্রদানের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ليس دون خمسة اوسق صدقة শীর্ষক আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে 'উশরের নিসাব ধার্য্য করা হয়েছে।[৩৪] সুতরাং বলা যায়, 'উশরের নিসাব হল পাঁচ ওসক উৎপাদিত শস্য।

এখন প্রশ্ন হল - বাংলাদেশী হিসাবে পাঁচ ওসকের পরিমাণ কত ? এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ওসক মূলত: পাত্র দ্বারা পরিমাপের হিসাব। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে যেহেতু পাত্রের পরিমাপ সর্বত্র প্রচলিত নেই,তাই সর্বত্র সমভাবে অনুসরণের সুবিধার্থে আমরা একে ওজনে রূপান্তর করেছি। ইবন কুদামা তাঁর আল-মুগনী গ্রন্থে এবং ইমাম নবভী সহীহ মুসলিম গ্রন্থের 'ওসক'বিষয়ক হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন যে, প্রতি ওসক = ৬০ সা', আর প্রতি সা'= ৫⅓ ইরাকী রতল।[৩৫] বাংলাদেশী হিসাবে প্রতি সা' = ৩.৩১২ গ্রাম,সুতরাং ৫ ওসক তথা ৩০০সা'= ৯৯৩.৬ কেজি যা ২৬ মনের চাইতেও বেশী , স্থানীয় মান হিসাবে প্রতি সা' = ৩ সের ৬ ছটাক । সুতরাং ৩০০ সা'= ১০১৩ সের, যার ওজন ২৬ মনের চাইতে কিছু কম। সব কিছু বিবেচনায় রেখে 'উশরের নিসাব বাংলাদেশী হিসাবে ২৬ মন।

'উশরের বিধান:

উশর একটি ফরয ইবাদত । যাকাতের ন্যায় 'উশরও সরকারী ব্যবস্থাপনায় আদায় ও বিলি- বন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইসলামী সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ইসলামী সরকারই নির্ধারণ করবে কোন জমিতে 'উশর এবং

কোন জমিতে অর্ধ 'উশর ধার্য্য হবে। কিন্তু যেহেতু বর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু নেই তাই ব্যক্তিগত উদ্যেগে যাকাত আদায়ের ন্যায় 'উশর ও আদায় করতে হবে।

ইসলামে ভূমির ধরন, ফসল আহরণে কষ্টের পরিমাণ,আর্থিক বিনিয়োগ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে 'উশরের বিধান আরোপ করা হয়েছে। যদি ভূমি 'উশরী হয় এবং নদী নালা কিংবা বৃষ্টির পানিতে সিক্ত হয়ে এতে ফসল উৎপাদিত হয় তবে তাতে 'উশর তথা ১/১০ অংশ প্রদান করতে হবে। আর যদি কূপ খনন করে কিংবা পানি সেঞ্চন করে ফসল উৎপাদন করা হয় তবে তাতে অর্ধ উশর তথা ১/২০ অংশ প্রদান করতে হবে। এ উভয় অবস্থায় 'উশরের হারের তারতম্যের কারণ হল ফসল উৎপাদনে কায়িক পরিশ্রম ,অতিরিক্ত মজুরী প্রদান এবং পানি সেঞ্চনে অতিরিক্ত ব্যয় এবং বৃষ্টির পানি কিংবা নদী-নালার পানিতে ফসল উৎপাদনে অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয়টি জড়িতনা থাকা।[৩৬]

গভীর নলকূপ স্থাপন, নালা তৈরী , এবং পানি ক্রয় করে সেচ করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয় বিধায় এতে অর্ধ 'উশর ধার্য্য হওয়া যুক্তিযুক্ত । তা ছাড়া, যে জমিতে অতিরিক্ত পরিচর্যার পাশাপাশি সার,কীট নাশক ইত্যাদির প্রয়োজন পড়ে তাতেও অর্ধ 'উশর আদায় করা উচিত।[৩৭]

কোন ভূমিতে এক মৌসুমে বৃষ্টির পানি এবং অপর মৌসুমে সেচের পানিতে ফসল উৎপন্ন হলে সে ক্ষেত্রে এক সৌসুমে 'উশর এবং অপর সৌসুমে অর্ধ 'উশর প্রযোজ্য হবে। পানি প্রবাহের জন্য খাল-নর্দমা ইত্যাদি খননের প্রয়োজন হলে একে পতিত ভূমি আবাদ করণের নীতিতে ফেলে এতে 'উশর দিতে হবে । কিন্তু প্রথম বার যদি ব্যয়ের পরিমাণ অধিক হয় তা হলে প্রথম বার অর্ধ 'উশর এবং পরবর্তীতে 'উশর প্রযোজ্য হবে। কারণ প্রতি মৌসুমে এ ধরনের খাল কিংবা নর্দমা খননের প্রয়োজন পড়েনা।[৩৮] 'উশর কিংধা অর্ধ উশর আদায়ের ক্ষেত্রে সব ধরনের উৎপাদিত ফসলের নিসাব একত্রে ধার্য্য করা যাবেনা। প্রত্যেক প্রকারের ফসলের পৃথক পৃথক হিসাব করে নিসাব ধার্য্য হবে।[৩৯] 'উশর ফরয হবে ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পদে, কোন সংস্থার জন্য ওয়াকফকৃত সম্পদে নয়।[৪০]

'উশর, খারাজ ও ভূমিকর কি একই সাথে প্রযোজ্য ?:

'উশর,খারাজ ও ভূমিকর একই সাথে প্রযোজ্য কি না এ বিষয়ে ইমামগণের বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। যদি কোন স্বাধীন মুসলিম খারাজ আদায়ের শর্তে ভূমি চাষাবাদ করে অথবা তাকে খারাজী ভূমি চাষাবাদের জন্য পত্তন দেয়া হয় তা হলে তাকে খারাজ আদায়ের পাশাপাশি উৎপন্ন

ফসলের 'উশর কিংবা অর্ধ 'উশর আদায় করতে হবে। ইমাম লাইছ ইবন সাদের মতে খারাজী ভূমিতে 'উশর আরোপ করা হবে না।[৪১] ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও তাঁর সঙ্গীদের মতে খারাজ ধার্য্য থাকা অবস্থায় 'উশর আদায় করা ফরয নয়। কেবল খারাজী ভূমির উপরই খারাজ ধার্য্য হতে পারে। ইমাম ইবনু আবী শাইবাহ ও ইকরামা (রহ.) এই মত পোষণ করেন। প্রমাণ হিসাবে তাঁরা হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত মহানবীর (স.) নিম্নোক্ত হাদীসটি উদ্ধৃত করেন-[42]

لا يجمع العشر والخراج فى أرض مسلم

অর্থাৎ-"কোন মুসলিমের ভূমিতে 'উশর ও খারাজ একত্রে ধার্য্য হতে পারে না"।

জমহুর আলিমগণের মতে -'উশর একটি অনিবার্যরূপে আদায়যোগ্য ইবাদত। তাই এটি খারাজ কিংবা ভূমিকর ধার্য্য হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক নয়। খারাজ ও ভূমিকর ধার্য্য হয় ভূমির উপর,চাই তাতে চাষাবাদ হোক বা না হোক, ভূমির মালিক মুসলিম হোক কিংবা অমুলিম হোক। খারাজ ও ভূমিকরের মাধ্যমে ভূমির উপর ব্যক্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর 'উশর ধার্য্য হয় ভূমি হতে উৎপাদিত ফসলের উপর তথা জমিতে প্রবৃদ্ধি সাধনের উপর । আর এটি ধার্য্য হয় কেবল মুসলিমদের উপর । 'উশর ফরয হয়েছে আল-কুরআনের সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে আর খারাজ ও ভূমিকর ধার্য করা হয় প্রচলিত আইনের আওতায় ।সুতরাং 'উশর এবং খারাজ ও ভূমিকর দুটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির হক্ক যা ভিন্ন ভিন্ন কারণে ধার্য্য করা হয়।'উশর ব্যয় হয় আল-কুরআন নির্দেশিত ৮টি খাতে , আর খারাজ ও ভূমিকর ব্যয় হয় রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা, নিরাপত্তা বিধান, সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণ এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ড সম্পাদন খাতে। সুতরাং 'উশর এবং খরাজ ও ভূমিকর একই সাথে ধার্য্য হওয়ার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই এবং খারাজ ও ভূমিকর ইত্যাদির কারণে আল্লাহ তায়ালা ও রাসুল (সা.) কর্তৃক নির্দেশিত 'উশর রহিত হতে পারে না। যেমন ব্যবসায় পরিচালনার জন্য দোকান ভাড়া নিয়ে নিয়মিত ভাড়া আদায় করার

কারণে দোকানে মজুদ মালামাল ও পুঁজির উপর আরোপিত যাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।[৪৩] যেমন আয়কর আদায় করার কারণে যাকাত আদায় করা হতে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না অনুরূপ খারাজ ও ভূমিকর আদায়ের কারণে 'উশরের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না।[৪৪]

বাংলাদেশের ভূমি কি 'উশরী ভূমি ?:

১২০৩ ঈসায়ী সালে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন বখতিয়ার খলজীর নেতৃত্বে বাংলায় মুসলিম শাসনের গোড়া পত্তন হয়। উক্ত সময় হতে বর্তমান পর্যন্ত সময়কালকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নরূপভাবে বিভক্ত করা হয় :

ক. ১২০৩ - ১৩৪০ সাল, দিল্লীর মুসলিম বাদশাহগণ কর্তৃক নিযুক্ত সুবেদারদের শাসন ;

খ. ১৩৪০ - ১৫৭৬ সাল পর্যন্ত স্বাধীন সুলতানগণের শাসন ;

গ. ১৫৭৬ - ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত দিল্লীর মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে শাসন ;

ঘ. ১৭৫৭ - ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বৃটিশ শাসন ;

ঙ. ১৯৪৭ - ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান আমল ;

চ. ১৯৭১ সাল থেকে বাংলাদেশ আমল ।

উপরোক্ত বিবরণীতে দেখা যায় যে, ১২০৩ সালে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৭৫৭ সালে বৃটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশ নামক ভূখন্ডটি মুসলিম শাসকদের অধীনে ছিল।১৭৫৭ সালে মুসলিম শাসনের অবসানের পর এখানে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে লর্ড কর্ণওয়ালিশ কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালুর মাধ্যমে এদেশের কৃষকগণ জমি-জমার মালিকানার অধিকার হতে বঞ্চিত হয়। অত:পর ইংরেজদের নিয়োজিত জমিদারদের কাছ থেকে কৃষকগণ রাজস্ব আদায়ের শর্তে জমির বরাদ্দ লাভ করে। ফলে এদেশের আলিম সমাজ ও ফকীহগণ মনে করেন - এদেশের ভূমি 'উশরী নয় । তাঁদের মতে - 'উশর কেবল সেই সব ভূমির উৎপন্ন ফসলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যে গুলো ইসলামী হুকুমত কর্তৃক কৃষকদের মধ্যে বরাদ্দ দেয়া হয়। যে সব ভূমি অমুসলিমদের নিকট হতে ক্রয় করা হয় কিংবা অমুসলিম কর্তৃপক্ষের নিকট হতে রাজস্ব আদায়ের শর্তে বরাদ্দ নেয়া হয় সেই সব ভূমির উৎপাদিত ফসলে 'উশর প্রদান অত্যাবশ্যকীয় নয়।[৪৫]

উপরে উল্লেখিত কালপরিক্রমায় আমরা যদি বাংলার ভূমি মালিকানার বিষয়টি পর্যালোচনা করি তা হলে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দেখতে পাই :

ক. মুসলিম বিজয়ের পর নব দীক্ষিত মুসলিমদের ভূমি,যাতে তাদের পূর্বের মালিকানা বহাল ছিল ;

খ. বিজিত অঞ্চলে মুসলিম শাসকবৃন্দ কর্তৃক মুসলিমদের মধ্যে বন্টনকৃত ভূমি ;

গ. উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভূমি যা বংশানুক্রমিকভাবে মুসলিমদের দখলে ছিল বলে প্রমাণিত ;

ঘ. উত্তরাধিকার সূত্রে কিংবা ক্রয়সূত্রে প্রাপ্ত ভূমি যা কখন-কিভাবে মুসলিমদের দখলে এসেছে তা অজ্ঞাত;

ঙ. ক্রয়, দান কিংবা ওয়াকফসূত্রে প্রাপ্ত ভূমি, যা মুসলিমগণ বংশ পরম্পরায় ভোগ-দখল করে আসছে ;

চ. এমন ভূমি, ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মুসলিমগণ অন্য মুসলিমগণের নিকট থেকে যার মালিকানা অর্জন করে ;

ছ. এমন ভূমি, যা ইংরেজগণ চাষাবাদের জন্য মুসলিমদেরকে পত্তন দিয়েছে কিন্তু পূর্বে এতে কার মালিকানা ছিল তা জানা নেই ;

জ. এমন অনাবাদী ভূমি, যা মুসলিমগণ আবাদ করেছে ;

ঝ. এমন পরিত্যক্ত বা খাস ভূমি, যা চাষাবাদের জন্য মুসলিমগণ পত্তন নিয়েছে।

ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'উশরী ভূমির পরিচয় শীর্ষক আলোচনার আলোকে বাংলাদেশের মুসলিমদের ভূমি মালিকানার দিকগুলো পর্যালোচনা করলে আমরা একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে,বাংলাদেশের মুসলিমদের মালিকানাধীন অধিকাংশ ভূমিই 'উশরী ভূমি। তাই এ দেশের 'উশরী ভূমিতে উৎপাদিত ফসলে 'উশর কিংবা অর্ধ 'উশর প্রদান করা ফরয।

বাংলাদেশের উৎপাদিত ফসলে 'উশর এর আনুমাণিক হিসাব :

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এটি একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে পরিচিত হলেও বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী এটি নিম্ন আয়ের দেশসমূহের অন্তর্গত। ১৪ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত এদেশের ৫২% লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করে। কৃষি খাত এদেশের আয়ের প্রধান উৎস। প্রায় ১০ কোটি লোকের অর্থনৈতিক অবস্থা দরিদ্র সীমার নীচে। প্রায় ২৫% লোক ভূমিহীন। পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত দেশের প্রায় ৯০% ভূমি সমতল। ছোট-বড় প্রায় সাত শতাধিক নদ-নদী এদেশের ভূমিকে বিপুল উর্বরা শক্তি দান করেছে। ১৯৯২ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের মোট আবাদ- যোগ্য ভূমির পরিমাণ ৩,৪৭,৮৬,০০০ একর। এর মধ্যে সেচের আওতাভূক্ত ভূমির পরিমাণ মোট ভূমির ২০.৮% তথা ৭২,৩৫,৪৮৮ একর এবং সেচের আওতা বহিভূর্ত ভূমির পরিমাণ মোট ভূমির ৭৯.২% তথা ২,৭৫,৫০,৫১২ একর। উক্ত ভূমির মধ্যে এক ফসলী ভূমির পরিমাণ ৮১,৪০,০০০ একর,দুই ফসলী ভূমির পরিমাণ ৯৬,৩৪,০০০ একর , তিন ফসলী ভূমির পরিমাণ ২৪,২৪,০০০ একর, মোট ২,০১,৯৮,০০০ একর। অবশিষ্ট ১,৪৫,৮৮,০০০ একর ভূমিতে ফল- মূল ও অন্যান্য ফসলের চাষ হয়ে থাকে। আবার কিছু কিছু ভূমি পরিত্যক্তও রয়েছে।[৪৬] ১৯৯৬-৯৭অর্থ বছরে কৃষিভূমিতে মোট উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ ছিল ২০.৩ মিলিয়ন টন, যার ⅓ অংশ উৎপাদিত হয় বৃষ্টির পানিতে। অবশিষ্ট ⅔অংশের ফসল উৎপাদিত হয় নদীর পানি সেচের মাধ্যমে অথবা গভীর নলকুপের পানি সেচের মাধ্যমে।[৪৭] উপরোক্ত হিসাবের উপর ভিত্তি করে 'উশর ও অর্ধ 'উশর ধার্য করা হলে তার হিসাব হবে নিম্নরূপ: ⅓ অংশ ফসলের কোন 'উশর হবেনা , কারণ তার উৎপাদনকারীদের উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ হয়ত ৫ ওসক তথা ২৬ মনের নীচে নতুবা তারা অমুসলিম। পরবর্তী ⅓ অংশের উপর 'উশর তথা ১/১০ অংশ, অবশিষ্ট ⅓ অংশের উপর অর্ধ 'উশর তথা অংশ আরোপ করা হবে । সুতরাং মোট উৎপাদিত ফসল তথা ২০.৩ মিলিয়ন টনের ১/২০ অংশের পরিমাণ হল ৬.৭১ মিলিয়ন টন যার 'উশর হল ৬ লক্ষ ৭১ হাজার টন, পরবর্তী ⅓ অংশ এর অর্ধ 'উশর হল ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টন, সর্বসাকুল্যে এর পরিমাণ হল ১০.০৭ লক্ষ টন। যার বাজার মূল্য প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা । 'উশরের এই পরিমাণ কেবল উৎপাদিত ধান এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যান্য কৃষি পণ্যে এর হিসাব ধরা হলে তা ১৫শত কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

উপসংহার :

'উশর ইসলামী অর্থব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ । ভূমি হতে উৎপাদিত ফসলের সাথে এর সম্পর্ক । বাংলাদেশের ভূমি 'উশরী ভূমি। শরীয়াত নির্ধারিত নিসাব পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হলে এতে 'উশর আদায় করা ভূমির মালিক কিংবা কৃষকের উপর ফরয। এটি ব্যক্তিগত উদ্যোগে এর প্রকৃত হকদারের নিকট কিংবা বায়তুল মালে পৌছিয়ে দিতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলে সরকারী উদ্যোগেই তা আদায় করার বিধান দিয়েছে ইসলাম। বর্তমানে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে 'উশর বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। দেশে বর্তমানে দারিদ্রাবস্থার লোক সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি এবং পূর্ণ দারিদ্রাবস্থার লোক সংখ্যা প্রায় ২.৫০ কোটি । ৮০% লোকের মাথা পিছু আয় ৩৮০ ডলার। বেকার ,প্রান্তিক ক্ষেত-মজুর এবং শ্রমজীবিরা বার্ষিক গড়ে ১৮০ দিনের বেশী কাজ পায় না। এমতাবস্থায় শরীয়াতের নির্দেশিকা অনুসারে 'উশর আদায় এবং পরিকল্পিতভাবে বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করা হলে এবং এই সব জনগোষ্ঠীকে ত্রাণ, পুনর্বাসন, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, আত্মকর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, ক্ষুদ্র ঋণ বাস্তবায়ন প্রকল্প ও শিল্প -কারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দারিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনে 'উশর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

সূত্র নির্দেশ :

১ ইবরাহীম মাযকূর ও অন্যান্য, আল-মু'জাম আল-ওয়াসীত, কায়রো : ১৯৭২, পৃ. ৬০২ ।

২ প্রাগুক্ত, পৃ.৬০২ ।

৩ **আবদুর রহমান আল্-জাযিরী,** কিতাব আল-ফিকহ্ আলা আল্ মাযাহিব আল আরবা'আহ, বৈরুতঃ দারু ইহ্ইয়া আল্-তুরাছ আল-আরবী, তা.বি. ১ম খন্ড,পৃ. ১৬; আল্লামা ইউসুফ আল্-কারযাভী, ইসলামের যাকাত বিধান (বাংলা সংস্করণ), ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী,২০০৩, ১ম খন্ড, পৃ.৩১৫- ৩১৬ ।

৪ সম্পাদনা পরিষদ,সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২, ১ম খন্ড, পৃ.২৪১ ।

৫ আবদুর রাযেক রহীম সিলাল আল-মুহী,আল-ইবাদাত ফী আল্ আদইয়ান আল্-সামাভিয়্যাহ- আল- ইয়াহুদীয়্যাহ-আল্ মাসিহীয়্যাহ আল্ ইসলাম আল্ আওয়ায়েল,দামেশ্ক:২০০১,পৃ.১৭৬ ।

৬ আবদুর রহমান আল্ জাযিরী,কিতাব আল্-ফিকহ আলা আল্ মাযাহিব আল্ আরবা'আহ, ১ম খন্ড,পৃ.৬১৬ ।

৭ **ইমাম আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আল্-তাবারী,** জামি' আল্-বয়ান আন তাফসীরি আয়িল কুরআন, বৈরুত:দার আল্-ফিকর, ১৯৮৮,৩য় খন্ড,পৃ.৮০ ।

৮ **ইমাম ইবন্ জারীর আল-তাবারী,** জামি'আল্ বায়ান, ৮ম খন্ড,পৃ.৫৩ ।

৯ প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড,পৃ.৫৩ ।

১০ **ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল- বুখারী,** সহীহ আল-বুখারী, দিল্লী:কুতুবখানা রশীদীয়্যাহ, ১৩৭৫হি.১ম খন্ড, পৃ ২০১ ।

১১ **ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ,** আল্-সহীহ লি-মুসলিম, কলিকাতা: দার আল্ ইশাআত আল্-ইসলামিয়্যাহ,১ম খন্ড,পৃ.২১৬ ।

১২ **ইমাম ইয়াহইয়া ইবন আদম,** কিতাব আল্-খারাজ ,বৈরুত:দার আল্-মা'রিফাহ , ১৯৭৯, পৃ . ১১৬ ।

১৩ **ইবন কুদামা আল্- মাকদাসী,** আবদুল্লাহ ইবন্ আহমদ, আল্-মুগনী আলা মুখতাছার আল্-কারখী, বৈরুত: দার আল্-কুতুব আল্-ইলমিয়্যাহ,১৯৯৪,২য় খন্ড,পৃ.৪৩৩ ।

১৪ সম্পাদনা পরিষদ, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খন্ড,পৃ-২৪২ ।

১৫ **আবূ জাফর আহমদ আল্-দাউদী,** কিতাব আল্- আমওয়াল,ইসলামাবাদ : ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট,১৯৯৫,পৃ.৫০ ।

১৬ **ইমাম আবূ ইউসুফ,** কিতাব আল-খারাজ, বৈরুত:দার আল্-মারিফাহ ,১৯৭৯, পৃ.৬৯ ।

১৭ প্রাগুক্ত,পৃ.৬৯ ।

১৮ **আলা উদ্দীন আবূ বকর আল্- কাসানী,** বাদায়ি' আল্- সানায়ি' ফী তারতীব আল্- শারায়ি', দেওবন্দ: দার আল্ কিতাব, তা.বি., ২য় খন্ড, পৃ.১৭৬-১৭৭ ।

১৯ **মাওলানা আশরাফ আলী থানভী,** বেহেস্তী যেওয়ার মুকম্মাল-মুদাল্লাল, দেওবন্দ;মাকতাবা থানভী , তা.বি. ৩য় খন্ড,পৃ . ৩০ ।

২০ **মুহাম্মদ হিফযুর রহমান,** ইসলাম কা ইকতেসাদী নেযাম, চট্টগ্রাম -১৯৮৫,পৃ. ১১৬ ।

২১ **ইমাম ইবন মাজাহ,** সুনান ইবন মাজাহ , দেওবন্দ: ইসলামিক একাডেমী, তা.বি.পৃ.১৩১ ।

২২ **ইমাম মালিক ইবন আনাস,** আল্ মুয়াত্তা লিল ইমাম মালিক,দেওবন্দ : ইয়াসির নদীম এন্ড কোং, তা.বি.পৃ.১১৮ ।

২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১ ।

২৪ **আল্লামা ইউসুফ আল্- কারযাভী,** ইসলামের যাকাত বিধান, ১ম খন্ড,পৃ.৩২২ ।

২৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩ ।

২৬ **ইবনু কুদামা আল্- মাকদাসী,** আল্-মুগনী , ২য় খন্ড, পৃ.৪৩৪ ।

২৭ **আল্লামা ইউসুফ আল্- কারযাভী,** ইসলামের যাকাত বিধান, ১ম খন্ড,পৃ.৩২৪-৩২৫ ।

২৮ **ইবনু কুদামা আল্- মাকদাসী,** আল-মুগনী, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৩৬ ।

২৯ **ইমাম মুসলিম,** আল্-সহীহ লি-মুসলিম, ১ম খন্ড, পৃ.৩১৫, ইমাম বুখারী , সহীহ আল্-বুখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ২০১ ।

৩০ ইমাম মুসলিম, আল্-সহীহ লি- মুসলিম, ১ম খন্ড, পৃ. ৩১৬।

৩১ ইবনু কুদামা আল্-মাকদাসী, আল্- মুগনী, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৩৬; আলা উদ্দীন আল্- কাসানী, বাদায়ি' আল্-সানায়ি',২য় খন্ড,পৃ.১৮০।

৩২ মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল্- শায়বানী, কিতাব আল্- হুজ্জাহ আলা আহলিল মদীনাহ, হায়দারাবাদ: দায়িরাহ আল্-মা'আরিফ আল্-ইসলামিয়্যাহ, ১৩৮৫হ,পৃ.৪৯৭।

৩৩ ইমাম বুখারী, সহীহ আল-বুখারী,১ম খন্ড,পৃ.২০২।

৩৪ আলা উদ্দীন আল্-কাসানী, বাদায়ি'আল্-সানায়ি, ২য় খন্ড,পৃ.১৬৯ - ১৭০।

৩৫ ইবনু কুদামা আল্-মাকদাসী, আল্-মুগনী, ২য় খন্ড, পৃ.৪৩৯ ; ইমাম মুসলিম, আল্ সহীহ লি- মুসলিম, ১ম খন্ড,পৃ.৩১৫, ইমাম নবভীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৬ মুহাম্মদ হিফযুর রহমান,ইসলাম কা ইকতেসাদী নেযাম, চট্টগ্রাম - ১৯৮৫, পৃ.১১৬।

৩৭ মহিউদ্দীন খান, রোযা,যাকাত ও অন্যান্য প্রসঙ্গ,ঢাকা : মদীনা পাকলিকেশন্স, ২০০১, পৃ. ৬১।

৩৮ আল্লামা ইউসুফ আল্-কারযাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, ১ম খন্ড,পৃ.৩৪১।

৩৯ আলা উদ্দীন আল্ কাসানী, বাদায়ি'আল্-সানায়ি', ২য় খন্ড,পৃ . ১৮১-১৮২।

৪০ আবদুর রহমান আল্-জাযিরী, কিতাব আল্-ফিকহ আলা আল্- মাযাহিব আল্-আরবা'আহ, ১ম খন্ড, পৃ . ৬১৭।

৪১ আবু জাফর আহমদ আল্- দাউদী, কিতাব আল্- আমওয়াল, পৃ . ৫০।

৪২ ইমাম ইয়াহইয়া ইবন আদম, কিতাব আল্- খারাজ,পৃ. ২৪।

৪৩ আল্লামা ইউসুফ আল্-কারযাভী , ইসলামের যাকাত বিধান, ১ম খন্ড,পৃ.৩৬৯।

৪৪ মুফতী মুহাম্মদ শফী, ইসলামে ভূমি ব্যবস্থা (বাংলা সংস্করণ) , ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫, পৃ.১৯৯।

৪৫ মহি উদ্দীন খান ,রোযা যাকাত ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃ. ৬২।

৪৬ BBS, Bangladesh Statistical year Book, 1992,P,148.

৪৭ Ibid, P, 114, 168.

Da'wah Students' Journal
August 2009

ইসলামের দৃষ্টিতে বাংলাদেশে কবর সংস্কৃতি

ড. আ.ছ.ম. তরীকুল ইসলাম*

ভূমিকা:

ইসলাম একটা পরিপূর্ণ জীবন বিধান। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র সম্পর্কেই রয়েছে ইসলামের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। শুরু হয় অনন্ত জীবন। কবরের মধ্যে দাফনের মধ্য দিয়েই সূচনা হয় সেই অনন্ত জীবনের। এই কবরকে কেন্দ্র করেও ইসলামের রয়েছে নিজস্ব দর্শন। শিরক একটা মারাত্মক গুনাহ। অন্য গুনাহ মাফ হলেও শিরকের গুনাহ মহান আল্লাহ কখনো ক্ষমা করেন না।[১] বাংলাদেশের কবর গুলোতে যে সব কাজ হয় তার অনেকটাই শরী'আতের দৃষ্টিতে বৈধ হলেও কিছু কিছু কবরে এমন সবকর্মকান্ড সংঘটিত হচ্ছে, যা মূলতঃ শিরকেরই নামান্তর। জেনে অথবা না জেনেই, এ সব কবরে ইসলামের নামে এমন সব আচরণ করা হচ্ছে, যা ইসলামের মূল দর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক। এমনকি স্বচ্ছ ধারণার অভাবে এ কাজগুলো যে শিরকেরই অন্তর্ভূক্ত তা অনেকেই মানতেও রাজী হয় না। সে জন্য কুরআন ও সুন্নাহ এর আলোকে কবরে মানুষ এই সব যে কর্মকান্ড করে থাকে তার মূল্যায়ন হওয়া খুবই জরুরী। বাংলাদেশের কবরসমূহে যে সব কর্মকান্ড সংঘটিত হয়; তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও ইসলামের দৃষ্টিতে এর পর্যালোচনাই হচ্ছে আলোচ্য প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

বাংলাদেশের কবরগুলোতে অনুষ্ঠিত কর্মকান্ড:

বাংলাদেশের কবরগুলোতে অসংখ্য কর্মকান্ড অনুষ্ঠিত হয়। এর উল্লেখযোগ্য কাজ কর্মগুলো ইসলামের আলোক এখানে তুলে ধরা হলো। যেমন-

যিয়ারাত:

ইসলামের দৃষ্টিতে মৃত্যুকে স্মরণ করা ও মৃতব্যক্তির জন্য দু'আ ও ইসতিগফার করার উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারাতের অনুমতি রয়েছে। এ প্রসংগে ইমাম বারকাওয়ী বলেন -[২]

إن فائدة زيارة القبور إحسان الزائر إلى نفسه وإلى الميت، أما إحسانه إلى نفسه فيذكر الموت والآخرة والزهد في الدنيا والاتعاظ والاعتبار بحال الميت، أما إحسانه إلى الميت فبالسلام عليه والدعاء له بالرحمة والمغفرة وسؤال العافية.

"কবর যিয়ারতের উপকারিতা হলো- যিয়ারতকারী ও মৃত ব্যক্তি উভয়ের কল্যান সাধন করা। যিয়ারতকারীর কল্যাণ এই যে, সে পরকাল ও মৃত্যুকে স্বরণ করবে, দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত হবে এবং মৃত ব্যক্তির অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

কবর যিয়ারাত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছগুলোর অন্যতম হাদীছ হচ্ছে:[৩]

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه كان في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :... ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا.

আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদাহ তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল (স.) এর এক মজলিসে উপস্থিত ছিলেন, সেখানে তিনি বলেছেন.....আর আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত থেকে নিষেধ করেছি, তারপরও যে কবর যিয়ারত করতে চায় সে যেন তা করে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তোমরা অবাঞ্চিত কোন কথা বলবেনা (মৃত ব্যক্তির কাছে কোন কিছু চাইবেনা)।

অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে :[৪]

عن أبي هريرة قال : زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت.

---

* সহযোগী অধ্যাপক, দাওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (স.) তাঁর মায়ের কবর যিয়ারতে কান্নায় ভেঙ্গে পরেন। তাঁর সাথে আশেপাশের লোকেরাও কেঁদে ফেলেন। অতপরঃ রাসূল (স.) এরশাদ করেনঃ আমি আমার রবের কাছে তাঁর (মায়ের) জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চেয়েছি, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। অতপরঃ আমি তাঁর কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলাম এবং আমাকে তা করার অনুমতি দেয়া হল। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত করো কারণ ইহা মানুষকে মৃত্যুর কথা স্বরণ করিয়ে দেয়।

এ হাদীছে মূলতঃ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম) মৃত্যুকে স্মরণ করার জন্য কবর যিয়ারাতের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামের প্রথম দিকে কবর যিয়ারাত নিষিদ্ধ ছিল। পরে অবশ্য যিয়ারাতের অনুমতি দেয়া হয়। এ প্রসংগে বলা হয়েছে-[৫]

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه.

"রাসূল (স.) শিরকের পথ রুদ্ধ করনার্থে লোকদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছেন। অতপরঃ যখন আল্লাহর একাত্ববাদ তাঁদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তখন তাঁদেরকে শরীয'ত সম্মতভাবে কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রদান করেছেন"।

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম) যে, কবর যিয়ারাতের সময় ভিন্ন ভিন্ন দু'আ পড়তেন তারও প্রমাণ পাওয়া যায়-[৬]

عن ابن عباس قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر.

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূল (স.) মদীনার একটি কবরস্থানের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাদের প্রতি মুখ ফিরালেন এবং বললেন ঃ ওহে কবরবাসী আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ আমাদের ও আপনাদেরকে ক্ষমা করুন। আপনারা আমাদের অগ্রজ আর আমরা আপনাদের অনুজ।

যেমন আরো বর্ণিত হয়েছে, তিনি কবর যিয়ারাতের সময় বলতেন-[৭]

السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم لنا سلف فارط ونحن لكم تبع عما قليل لاحق اللهم اغفر لنا ولهم.

ওহে মু'মিন মুসলিম কবরবাসী আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আপনারা আমাদের অগ্রজ আর আমরা আপনাদের অনুজ। অচিরেই আমরা আপনাদের সাথে মিলিত হব। হে আল্লাহ আমাদের ও তাদের ক্ষমা করুন।

এই হাদীছগুলো বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় যে, মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে স্মরণ করা ও সেজন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহনের উপদেশ লাভের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম) কবর যিয়ারাত করতেন। কবরে অবস্থানকারী মৃত্যু ব্যক্তির নাজাত ও মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করাও তার উদ্দেশ্যে ছিল। শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই আমাদের কবর যিয়ারাত করা উচিত।

আল্লামা ইবন তায়মিয়্যাহ যিয়ারাতুল কুবুরকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন-[৪]

أما زيارة القبور فهي على وجهين شرعية وبدعية، فالشرعية مثل الصلاة على الجنازة المقصود بها الدعاء للميت كما يقصد بذلك الصلاة على جنازته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع ويزور شهداء أحد... وأما الزيارة البدعية: فهي زيارة أهل الشرك، من جنس زيارة النصارى الذين يقصدون دعاء الميت والاستعانة به وطلب الحوائج عنده ويصلون عند قبره ويدعون به فهذا ونحوه لم يفعله أحد من الصحابة.

কবর যিয়ারত দুই প্রকার, ক. শরয়ী' বা বৈধ প্রক্রিয়া, খ. বিদয়ী' বা অবৈধ প্রক্রিয়া। বৈধ প্রক্রিয়া যেমন মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা যেমনটি রাসূল (স.) ওহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী সাহাবীদের কবর কিংবা জান্নাতুল বাকীতে দাফনকৃতদের ক্ষেত্রে করেছেন এবং তার জানাজার নামাজে অংশগ্রহণ করা। আর অবৈধ প্রক্রিয়া হচ্ছে- মুশরিক ও খৃষ্টানদের প্রক্রিয়া- যারা কবরবাসীকে সম্বোধন করে নিজেদের চাহিদা ব্যক্ত করে তার কাছে সাহায্য চায়, তার কবরের কাছে নামাজ পড়ে, তাদেরকে মাধ্যম বানিয়ে দোয়া করে ইত্যাদি। এ ধরনের কোন কাজ কোন সাহাবী করেননি।

আমাদের দেশে মহিলাদের কবর যিয়ারতের প্রচলন রয়েছে। হাদীসের দৃষ্টিতে এটি নিষিদ্ধ। বর্ণিত হয়েছে-[৯]

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور.

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (স.) কবর যিয়ারতকারী মহিলাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন।

সুতারাং যাতে শিরকী যিয়ারাত থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

কবরস্থানে কুরআন তিলাওয়াত:

কবরস্থানে কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে ইসলামের প্রসিদ্ধ মণীষীদের মধ্যে নেতিবাচক মতামত পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখযোগ্য মতামত গুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ [১০]

القراءة عند القبور مكروهة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله في رواية لأنه محدث لم تردبه السنة.

ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও আহমদের (র) মতে কবরের কাছে কুরআন তেলাওয়াত করা মাকরূহ, কারণ এটি পরবর্তিতে চালু হয়েছে এবং এক্ষেত্রে কোন হাদীসও বর্ণিত হয়নি।

মালিকি মাযহাবের মতামত হিসাবে বলা হয়েছে যে- [১১]

قال الشيخ ابن أبي جمرة: إن القراءة عند المقابر بدعة ليست بسنة... وكره قراءة شيء من القرآن عند الموت وبعده على القبور لأنه ليس من عمل السلف، وإنما كان من سأنهم الدعاء بالمغفرة والرحمة والاتعاظ.

শেখ আবু হামযা (র.) বলেনঃ কবরস্থানে কুরআন তেলাওয়াত করা সুন্নাত তো নয়ই বরং ইহা একটি বিদয়া'ত। তার মতে মৃত্যুকালে কিংবা মৃত্যুর পর কবরের কাছে কুরআন তেলাওয়াত করা মাকরূহ। কারণ সালফে সালেহীনগণ এটি করেননি, বরং তারা মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও রহমতের দোয়া করেছেন এবং এ থেকে শিক্ষা গহণ করেছেন।

ইমাম বারকাওয়ী দীর্ঘ আলোচনা উপাস্থাপন করে কবরে কিরআতুল কুরআনকে অবৈধ বলে মতামত দিয়েছেন [১২] ইমাম আহমাদ ইবন হামবাল সম্পর্কে বলা হয়েছে -[১৩]

قال الإمام أحمد لمن يراه يقرأ على القبر، يا هذا، إن قراءة القرآن على القبر بدعة، وهو قول جمهور السلف وعليه قدماء أصحابه وقال أيضا والقراءة على الميت بعد موته بدعة.

ইমাম আহমদ (র.) এক ব্যক্তিকে কবরের কাছে কুরআন তেলাওয়াত করতে দেখে বললেন: ওহে ভাই! কবরের কাছে কুরআন তেলাওয়াত করা বিদআ'ত, এটি পূর্বকালের অধিকাংশ আলেমদের (সালাফ) মত। সাহাবায়ে কিরামও এ মত পোষণ করতেন। তিনি আরও বলেছেন: মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির কাছে কুরআন পড়াও বিদআ'ত।

উপরোল্লেখিত মতামতের পক্ষে বর্ণিত হাদীসটি হচ্ছে[১৪]-

قال عليه السلام– اقرؤا سورة البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا.

রাসূল (স.) বলেছেন: তোমরা তোমাদের ঘরের মধ্যে সূরা আল বাক্বারাহ পড়, তোমরা তোমাদের ঘরকে কবর বানিওনা।

এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম) বাড়ীতে সূরাতুল বাকারাহ তিলাওআতের নির্দেশ দিয়েছেন। একই সাথে বাড়ীতে সূরাতুল বাকারাহ তিলাওয়াত না করে বাড়ীকে কবরস্থান বানাতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ বাড়ীতে তিলাওয়াত না করা বাড়ীকে কবরস্থান বানানোরই নামান্তর। এর অর্থ হচ্ছে, কবরস্থান কুরআন পাঠের জায়গা নয়। সুতরাং কবরে কুরআন পাঠ বৈধ নয়।

কবরস্থানে মসজিদ তৈরী করা:

কবরকে সিজদাহ এর স্থান বানানো শিরকের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম) কঠোর ভাষায় এই কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন [১৫]

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لولا ذلك أبرز أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا

হযরত আয়ে'শা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (স.) যখন শেষবারের মত অসুস্থ হয়েছিলেন এবং সে অসুস্থতা থেকে তিনি আর সুস্থ হননি, তখন তিনি বলেছেন: আল্লাহ ইহুদী এবং খৃষ্টানদের অভিশপ্ত করুন, তারা তাদের নবীদের কবর সমূহকে মসজিদ বা সিজদার স্থান বানিয়েছে। যদি এটা নাও হয়ে থাকে আশংকা করা হচ্ছে যে, অচিরেই তা হবে।

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে [১৬]

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

হযরত আবু হরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (স.) বলেছেন: আল্লাহ তায়া'লা ইহুদীদের ধ্বংস করুন, এরা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বা সিজদার স্থান বানিয়েছে।

অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে- [১৭]

عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله.

হযরত আয়ে'শা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (স.) যখন অসুস্থ হলেন তখন তার কোন কোন স্ত্রী ইথিওপিয়ায় অবস্থিত একটি গীর্জার বর্ণনা দিলেন। ঐ গীর্জাটির নাম ছিল মারীয়া। উম্মে ছালমা ও উম্মে হাবীবাহ যখন ইথিওপিয়ায় গিয়েছিলেন, তখন তারা এই গীর্জাটি দেখেছিলেন। তারা রাসূল (স.) এর কাছে এর সৌন্দর্য্য ও বিভিন্ন চিত্র বা মূর্তির বর্ণনা দিলেন। তখন রাসূল (স.) তাঁর মাথা তুলে বললেন: এদের মধ্যে যখন কোন ভাল লোক মারা যায়, তখন তারা তার কবরের উপর মসজিদ বা সিজদার স্থান বানায়, অত:পর উহাতে উহাতে তাদের ছবি চিত্রায়িত করে, এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি।

এ প্রসংগে আরো বর্ণিত হয়েছে, [১৮]

حدثني جندب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول قد كان أخوة وأصدقاء وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل وإن الله عز وجل قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.

হযরত যুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) এর মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে তিনি তাঁকে বলতে শুনেছেন যে, আমার অনেক ভাই বন্ধু ছিল কিন্ত আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে আমার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, বরং আল্লাহ আমাকে তাঁর পরম বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন যেমনটি করেছেন হযরত ইবরাহীম (আ.) কে উম্মাতের কাউকে পরম বন্ধু হিসেবে গ্রহন করতাম, তা হলে অবশ্যই তা করতাম আবু বকরকে, মনে রেখ, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবীদের ও নেককার লোকদের কবরকে সিজদাগাহ বানিয়েছে। অতএব সাবধান, তোমরা কবরকে সিজদাগাহ বানিও না। আমি তোমাদেরকে এ কাজ থেকে নিষেধ করছি।

উপরোল্লেখিত হাদীসগুলোতে মূলতঃ নবীদের কবরকে সিজদাহ এর স্থল বানাতে অর্থাৎ সেখানে ছালাত আদায়কে শক্ত ভাষায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং অলী, পীর, মাশাইখ ও অন্যান্যদের কবরে সিজদাহ দেয়া অবশ্যই যে নিষিদ্ধ তাতে কোন সন্দেহ নেই। সাধারণ এই সব কবর সম্পর্কেও রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম) এর বাণী অত্যন্ত স্পষ্ট। এর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে [১৯]

عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد.

আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি যে, সবচেয়ে খারাপ লোক হল যারা কিয়ামতের সময় জিবীত থাকবে এবং যারা কবরকে মসজিদ বা সিজদাগাহ হিসেবে গ্রহন করবে।

এই আলোকে কবরকে ছালাত আদায়ের স্থল বানানো বা কবরে সিজদাহ দেওয়া ইসলামে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। তেমনি ভাবে কবরের উপর মসজিদ প্রতিষ্ঠা করাও নিষিদ্ধ। কেননা এটা মূলতঃ কবরবাসীকে আল্লাহর সাথে শরীক বানানোর উত্তম মাধ্যম হিসাবে কাজ করে থাকে। বলা হচ্ছে [২০]

لأن بناء المساجد على القبور من أعظم وسائل الشرك بالمقبورين فيها.

কারণ কবরের উপর মসজিদ বা সিজদাগাহ বানানো শিরকের একটি মাধ্যম। এর মাধ্যমে কবরস্থ ব্যক্তির দ্বারা আল্লাহর সাথে শিরক করা হয়।

এই কারণে কবরকে সামনে নিয়ে যেমন ছালাত আদায় নিষিদ্ধ তেমনি কবরের উপরও ছালাত আদায় নিষিদ্ধ, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন- [২১]

عن ابن عباس قال عليه السلام: لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر.

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (স.) বলেছেনঃ "তোমরা কবরের দিকে ফিরে নামায পড় না এবং কবরের উপরেও নামায পড় না।"

কবরস্থানকে মাসজিদ বানানো মূলত: কাবিরাহ গুনাহ এর অন্তর্ভূক্ত। প্রসিদ্ধ ফকীহ আল-হায়ছামী বলেন:[২২]

الكبيرة الثالثة اتخاذ القبور مساجد.

তৃতীয় কবীরাহ গুনাহ হচ্ছে কবরকে মসজিদ বা সিজদাগাহ বানানো।

কুরতুবী (রহ:) এটাকে হারাম বলেছেন- তার ভাষায়-[২৩]

هذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد.

নবী ও আলিমদের কবরকে মসজিদ বা সিজদাগাহ বানানো মুসলমানদের জন্য হারাম।

সূর্য উদয়, অস্ত ও মধ্যস্থানে অবস্থানের সময় মুশরিকগণ সুর্যকে ছালাত নিবেদন করত; কোন মুসলমান এ সময়ে সূর্যের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় না করলেও এ সময়ে ছালাত আদায় ইসলামে নিষিদ্ধ। সেজন্য কবর কেন্দ্রিক মসজিদ হলে কবরের উদ্দেশ্যে ছালাত না হলেও এই ফিতনার ভয়ে ইসলামে কবর কেন্দ্রিক মসজিদ হওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[২৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম) আবু বকর (রাদিআল্লাহু 'আনহু) ও মাসজিদে নাববীর মধ্যে অবস্থিত। এ দ্বারা মাসজিদের ভিতরে কবর রাখা, কবরকে মাসজিদ বানান বৈধ মনে করার কোন সুযোগ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম) এর কবর যাতে মাসজিদে রূপান্তরিত না হয়, যে জন্য তাকে তার মৃত্যুবরণ করার স্থান আয়িশা (রাদিআল্লাহু 'আনহু) এর কামরাতেই দাফন করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে আবূ বাকর (রাদিআল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ[২৫]

إني سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول: ماقبض نبي إلا دفن حيث يقبض فرفع فراش رسول الله صلى عليه وسلم الذي توفى عليه فحفر له تحته.

আমি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি যে, "নবীদের যেখানে মৃত্যু হয়েছে সেখানেই দাফন করা হয়েছে। অতএব রাসূল (স.) এর মৃত্যুর পর যে বিছানায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল তা সরিয়ে সেখানেই কবর খনন করা হয়েছে।

সেই কারণে হযরত উছমান (রাদিআল্লাহু 'আনহু) যখন মাসজিদে নাববীকে প্রশস্ত করেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম) এর কবরকে মাসজিদের বাহিরে রেখেই অন্য দিকে প্রশস্ত করা হয়। তবে আল-অলীদ আব্দুল মালিক ৮৬ হিজরীতে খলিফা হন। এর পর তিনি এই মাসজিদের সংস্কার ও সমপ্রসারনের জন্য কাজ করেন। সেই সময়েই মূলতঃ তার কবর মসজিদের ভিতরেই রয়ে যায়।[২৬] এই ঘটনা যখন ঘটে তখন সর্ব শেষ ছাহাবী জাবির ইবন আব্দুল্লাহও বেঁচে ছিলেন না। কেননা তিনি ৭৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[২৭] সুতরাং এই ঘটনা কোন সাহাবীর জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়নি। তাছাড়াও মাসজিদ প্রশস্ত করনের জন্য অপারগ হয়েই মুলতঃ কবর গুলোকে মসজিদে ভিতরে রাখা হয়। সেজন্য এটাকে দলীল মনে করে কবরকে মাসজিদের অন্তর্ভূক্ত করাকে বৈধ মনে করার কোন সুযোগ নেই।

বাংলাদেশে মসজিদের ভিতরেও অনেক কবর দেখা যায়। অনেকেই কবরকে কেন্দ্রকরেও মসজিদ তৈরী করে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা অবৈধ।

কবর গাথা ও এর উপর বিল্ডিং বানান ঃ

বাংলাদেশের প্রতিটি গোরস্থানেই অসংখ্য গাথা কবর দেখা যায়। অনেক কবরে দেয়া হয়েছে সুশোভিত গম্বুজ। এখানে দ্বীনি ব্যক্তিত্ব, পীর, সুফী,, ওলী সহ যে কোন খ্যাতিমান ব্যক্তিদের কবরও গাঁথুনী থেকে রেহাই পায় না। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।[২৮]

عن جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام نهى عن تجصيص القبر وقال لا تجصصوه.

জাবির (র.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (স.) কবর পাকা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা কবরকে পাকা কর না।

মূলতঃ কবর গাথাকে উপলক্ষ করেই নূহ (আলায়হিস সালাম) এর সম্প্রদায়ের মাধ্যমে শিরকের উৎপত্তি ও সম্প্রসারন শুরু হয়।[২৯] আমাদের দেশেও যে সমস্ত কবরে শিরক সংঘটিত হয় তার সবগুলোই গাথা কবর।

এদেশেরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গাথা কবরের বহর দেখলে কবর গাথা যে ইসলামে নিষিদ্ধ এই বিষয়টি এদেশের মুসলিম জনগণ জানে বলেই মনে হয় না। এমনকি কোন কোন পীর ওলীর কবরে গম্বুজসহ সুরম্য অট্টালিকাও বানান হয়। কুষ্টিয়ার বার শরীফ দরবার, সাতক্ষীরার খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ এর কবর ও সিলেটের শাহ জালাল, বাগেরহাটের খান জাহান আলী, চট্টগ্রামের বায়জীদ বোস্তামির কবর এ বিষয়ে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কবরগুলো বিশেষ এক শ্রেণীর লোকদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলো ইসলামী আকিদাহ বিশ্বাসের পরিপন্থী।

কবর গাথাতো দূরের কথা এমনকি কবরে মাটি উঁচু করে দেয়াও ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে [৩০]

عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته.

আবু হাইয়াজ আল-আসাদী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আলী (র.) আমাকে বলেছেন, "রাসূল (স.) আমাকে যে জন্য প্রেরণ করেছেন, আমিও তোমাকে সে জন্য প্রেরণ করছি। যেখানেই কোন মূর্তি পাবে, তা নিশ্চি করে দেবে। আর যেখানেই কোন উঁচু কবর দেখবে, তা সমান করে দিবে।

বন্য পশু হতে কবরের লাশ সংরক্ষণের জন্য নতুন কবরে বেড়া দেয়া এবং সমগ্র কবর স্থানকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা শরী'আতে অবৈধ নয়। তবে আমাদের দেশে কবরের উপর যে ছাদ দেয়া হয়, গম্বুজ তৈরী হয় তা ইসলামের দৃষ্টিতে কোন ক্রমেও বৈধ নয়। ইমাম শাওকানী বলেন-[৩১]

فمن إشراف القبور أن يرفع سمكها، أو يجعل عليها القباب أو المساجد فإن ذلك من المنهي عنه بلا شك ولا شبهة.

কবর উঁচু করার অর্থ হচ্ছে, কবরের ছাদ বা যমিনের উপরের অংশ উঁচু করা কিংবা এর গম্বুজ কিংবা সিজদাগাহ বানানো। শরীয়তের দৃষ্টিতে এগুলো নিঃসন্দেহে নিষিদ্ধ কাজ।

কবরে কিছু লেখাঃ

পাথরে খোদাই করে সিমেন্ট দিয়ে এদেশের অনেক কবরে মৃত ব্যক্তির নাম সহ তার জন্ম তারিখ ও মৃত্যু তারিখ প্রভৃতি লেখা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এই লেখা আপত্তি কর। রাসুলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম) কবরে কিছু লিখতে নিষেধ করেছেন।[৩২]

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر أو يكتب عليه.

রাসূল (স.) কবর পাকা করতে কিংবা এর উপর কোন কিছু লিখতে নিষেধ করেছেন।

'উরস উদযাপনঃ

'উরস এর অর্থ যাই হোক না কেন বছরের নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত কবরে বিশেষ উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়াই হচ্ছে বাংলাদেশে 'উরস পালনের মূল লক্ষ্য। এমনি ভাবে একত্রিত হয়ে কবর কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান করা ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। এর উদেশ্য হচ্ছে, কবরকে সম্মানিত জ্ঞান করে একে ইবাদতের লক্ষ্যবস্তু বানান। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন[৩৩]- لاتتخذوا قبري وثنا. আমার কবরকে তোমরা মূর্তি বানিয়ো না। তিনি আরো বলেন[৩৪]- لاتتخذوا قبري عيدا আমার কবরকে তোমরা পূজার বস্তুতে পরিণত করো না।

তিনি তার কবর যাতে পূজার বস্তুতে পরিণত না হয়, সে সম্পর্কে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন- [৩৫]

اللهم لاتجعل قبري وثنا

হে আল্লাহ তুমি আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত কর না।

সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে কবরে সিজদাহ দিয়ে, একে অতিরিক্ত সম্মান প্রদান করে, একে বরকতময় জ্ঞান করে স্পর্শ করা বা চুমু দিয়ে একে পূঁজার মূর্তির আসনে অধিষ্ঠিত করা কোন ক্রমেও বৈধ নয় বরং এগুলো শিরকেরই অন্তর্ভূক্ত। [৩৬]

কবরবাসীর নিকট দু'আ করা ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে দু'আ ইবাদাতেরই অন্তর্ভূক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম) বলেছেন[৩৭]- الدعاء هو العبادة দু'আ একটি ইবাদাত।

আর ইবাদত কবরমুখী হয়ে করা অবৈধ। সালামাহ ইবন অরদান বলেন- [৩৮]

رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم : يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو.

আমি আনাস বিন মালেককে রাসূল (স.) এর কবরে সালাম দিতে দেখেছি। সালাম শেষে তিনি কবরের দিকে পিঠ দিয়ে দো'আ করতেন।

দু'আ যেহেতু ইবাদাত সেহেতু ইবাদত আল্লাহর জন্যই নির্ধারন অত্যাবশ্যক। সেজন্য কবরকে সম্মুখে নিয়ে কোন ইবাদাত বৈধ নয়। ইমাম বারকাওয়ী বলেন-[৩৯]

فالسلف من الصحابة والتابعين جردوا العبادة لله تعالى ولم يفعلوا عند القبر منها شيئا إلا ما أذن فيه النبي عليه السلام من السلام على أصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم.

সাহাবী ও তাবেয়ীরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করেছেন। কবরের কাছে তারা কোন ইবাদাত করেন নি। তবে যে সব বিষয়ে রাসূল (স.) অনুমতি দিয়েছেন। যেমনঃ কবরবাসীক সালাম দেওয়া, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং রহমতের দোয়া করা।

একই ভাবে কবরবাসীর নিকট কোন কিছু চাওয়া শিরকেরই অন্তর্ভূক্ত। এরশাদ হচ্ছে: [৪০]

وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنْ الظَّالِمِينَ

যারা তোমাদের উপকার অপকার কিছুই করতে পারে না, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তুমি তাদেরকে আহ্বান কর না। যদি তুমি তা কর, তাহলে তুমি যালিমদের (মুশরিকদের) অন্তর্ভূক্ত হবে।

সুতরাং আমাদের দেশে বিভিন্ন অলীদের কবরে যেয়ে বিপদমুক্তি, সন্তান প্রাপ্তি, সমস্যার সমাধান প্রভৃতি ক্ষেত্রে যা কিছু চাওয়া হয় তা মূলতঃ শিরকেরই নামান্তর।

কবরে বাতি জ্বালান:

এদেশের অনেক কবরে বাতি জ্বালাতে দেখা যায়। কবরে বাতিদানকে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম) অভিসম্পাত দিয়েছেন। বর্ণিত হয়েছে- [৪১]

أنه عليه السلام لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.

যে সব মহিলা কবর যিয়ারত করে এবং যারা কবরকে সিজদাগাহ বানায় ও কবরে বাতি দেয়। তাদেরকে রাসূল (স.) অভিশাপ দিয়েছেন।

এ সম্পর্কে আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদাসী বলেন-[৪২]

لو كان اتخاذ السرج عليها مباحا لم يلعن من فعله؛ وقد لعن لأن فيها تضعيعا للمال في غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور تشبيها بتعظيم الأصنام، ولهذا قال العلماء لايجوز أن ينذر للقبور، لاشمع ولازيت ولا غير ذلك، فإنه نذر معصية لايجوز الوفاء بالاتفاق.

কবরে বাতি দেওয়া যদি বৈধ হত, তাহলে যারা এ কাজ করে, তাদেরকে রাসূল (স.) অভিশাপ করতেন না। যেহেতু এ কাজে অনর্থক অর্থ অপচয় করা হয় এবং প্রতিমাকে সম্মান প্রদর্শনের মত কবরবাসীকে সম্মান প্রদর্শনে ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা হয়। তাই রাসূল (স.) তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন। এ জন্যই ওলামায়ে কিরাম বলেছেনঃ "কবরের জন্য তেল, মোমবাতি ইত্যাদি মানত করা বৈধ নয়। কারণ এটি গুনাহের কাজে মানত। আলিমদের সর্ব-সম্মতিক্রমে এ ধরনের মানত পূর্ণ করা বৈধ নয়।"

এ দ্বারা স্পষ্ট একথাও পরিষ্কার হল যে, আমাদের দেশে কবরসমূহে যে, মোমবাতি ও কেরোসীন তেল মানত করা হয়, তাও শরী'আতের দৃষ্টিতে অবৈধ।

কবরবাসীর উদ্দেশ্যে মানত করা ঃ

মানত ইবাদাতের অন্তর্ভূক্ত। সে জন্য মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য ব্যতীত মানত ইসলামে বৈধ নয়। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে মানত করা শিরকের নামান্তর। সৌদি আরবস্থ দারুল ইফতার ফাতওয়াতে উল্লেখ হয়েছে: [৪৩]

النذر نوع من أنواع العبادة التي هي حق لله وحده لايجوز صرف شيء منها لغيره فمن نذر لغيره فقد صرف نوعا من العبادة التي هي حق الله تعالى لمن نذر له ومن صرف نوعا من أنواع العبادة نذرا أو ذبحا أو غير ذلك لغير الله يعتبر مشركا مع الله غيره.

মানত এক প্রকারের ইবাদাত যা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহ ছাড়া আর কারও জন্য কোন ইবাদাত নিবেদন করা বৈধ নয়। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য কোন মানত করে, সে ঐ ব্যক্তির

জন্যই ইবাদাত নিবেদন করে। আর যে ব্যক্তি কোন প্রকারের ইবাদাত যেমনঃ মানত করা, যবেহ করা ইত্যাদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য নিবেদন করে, সে আল্লাহর সাথে শিরককারী হিসেবে বিবেচিত হবে।

সুতরাং কোন কবরবাসী অলীর কবরেও মানত করা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। হানাফি মাযহাবের উদ্বৃতি দিয়ে উল্লেখ হয়েছে যে,[৪৪]

وفي كتب الأحناف: أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم ... فهو بالإجماع باطل وحرام.

হানাফী মাযহাবের কিতাবে রয়েছে যে, সাধারণ মানুষেরা মৃত ব্যক্তির জন্য যে মানত করে, কিংবা ওলিদের মাজারে তাদের নৈকট্য লাভের আশায় যে সব টাকা-পয়সা, মোমবাতি কিংবা তেল ইত্যাদি গ্রহন করা হয় এ সবই নিষিদ্ধ এবং হারাম কাজ। এ ব্যাপারে ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সুতরাং কবরবাসীর সাহায্য পাওয়ার উদ্দেশ্যে মানত করা সঠিক নয়। এ প্রসংগে উল্লেখ হয়েছে : [৪৫]

ولو كان ميتا وقصد الناذر الاستغاثة به وطلب الحاجات منه فإن هذا النذر معصية لايجوز الوفاء به.

যার জন্য মানত করা হয়, সে যদি মৃত হয় এবং মানতকারী এর দ্বার সাহায্য লাভ কিংবা উদ্দেশ্য পূরণের আশা করে থাকে, তা হলে এ মানত গুনাহের মানত হিসেবে বিবেচিত হবে। এরূপ মানত পূর্ণ করা বৈধ নয়।

সুতরাং আমাদের দেশে কবরের নামে যা কিছু মানত করা হয়, তা,কোন ক্রমেও বৈধ নয়, এমনকি যদি কেউ মানত করে তা পূরণ করা অত্যাবশক হবে না।

কবরবাসীর নামে পশু জবহ করাঃ

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে জবহ করা শিরকের অন্তর্ভূক্ত। এরশাদ হচ্ছে ঃ [৪৬]

وما أهل لغير الله به.

এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে যবেহ করা হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে জবহকৃত এই পশুর গোশত ভক্ষন করাও হারাম। বলা হয়েছে :[৪৭]

الذبح لغير الله شرك، وحكم الذبيحة حكم الميتة ولايجوز أكلها ولو ذكر عليها اسم الله إذا تحقق انها ذبحت لغير الله.

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে যবেহ করা শিরক। এ ধরনের যবাইকৃত প্রাণী মৃত প্রাণীর অন্তর্ভূক্ত। যদি প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশ্যে তা জবাই করা হয়েছে, তাহলে আল্লাহর নাম নিয়ে যবাই করলেও তা থেকে কিছু খাওয়া বৈধ না।

সুতরাং আমাদের দেশে কোন কোন অলির কবরে যে পশু জবহ করা হয় তা মূলতঃ শিরক। এই পশুর গোশত একেবারেই হারাম।

কবরস্থানে বসাঃ

আমাদের দেশে অনেককেই বিভিন্ন কবরে ধ্যানমগ্ন হতে বা বসে ইবাদাত করতে দেখা যায়। এ সবের মূল উদ্দেশ্য যাই হোক ইসলামের দৃষ্টিতে এটা বৈধ নয়। বর্ণিত হয়েছে, [৪৮]

رواه عمرو بن حزم قال رأي رسول الله متكئا على قبر فقال : لا تؤذ صاحب هذا القبر أو تؤذه.

আমর ইবনে হাযম বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স.) এক ব্যক্তিকে কবরের কাছে হেলান দিয়ে বসে থাকতে দেখলেন, তখন তিনি তাকে বললেনঃ "তুমি কবরবাসীকে কষ্ট দিয়ো না।

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে: [৪৯]

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلي جلده خير له من أن يجلس على قبر.

আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (স.) বলেছেন- "কবরের কাছে বসে থাকার চেয়ে আগুনের কয়লার উপর বসে থাকা উত্তম- যে কয়লা তার কাপড় জ্বালিয়ে দেবে এবং দেহে আঘাত করবে।"

আসলে কবরস্থানে কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত এভাবে বসা হয় না। কবরবাসীর কাছে কিছু চাওয়া পাওয়াই হয় এর উদ্দেশ্য। আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে চাওয়া শিরক, যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

কবর ঢেকে দেয়া:

আমাদের দেশে অলীদের কবর গালিচা, মখমলের কাপড় বা অন্য কাপড় দিয়ে আচ্ছাদন করার প্রচলন অহরহ দেখা যায়। এ সম্পর্কে সায়য়িদ সাবিক বলেন ঃ [৫০]

لايحل ستر الأضرحة، لما فيه من العبث وصرف المال في غير غرض شرعي و تضليل العامة.

কবরকে কাপড় দিয়ে আচ্ছাদিত করা বৈধ নয়। কারণ এটি একটি বেহুদা কাজ এবং শরয়ী কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই সম্পদের অপচয় সাধন। আর এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে পথভ্রষ্ট করা হয়।

এ প্রসংগে আয়িশাহ (রাদিআল্লাহু 'আনহা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে-[৫১]

قال عليه السلام: إن الله لم يامرنا أن نكسو الحجارة والطين.

রাসূল (স.) বলেছেনঃ

"আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কোন পাথর কিংবা মাটিকে কাপড় পরাতে আদেশ করেননি।"

একই ভাবে কবরে ফুল প্রদানও ইসলামে বৈধ নয়। এটা মূলতঃ অন্য ধর্মাবলম্বীদের উদ্ভাবিত প্রথা, যা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই মুসলিম সমাজে ব্যাপক হারে প্রচলন শুরু হয়েছে। এ দ্বারা কবরবাসীর কোন উপকারই হয় না।

কবরের ধূলা ও মাটির দ্বারা বরকত হাছিল করা:

এ দেশে গাথা কবরের উপর জমে থাকা ধূলা বালি গায়ে মুখে মেখে বরকত হাছিলের প্রচলন ও দেখা যায়। ইসলামে এর কোন ভিত্তি নেই। উল্লেখ হয়েছে : [৫২]

وليس في الإسلام أيضا تبرك بأحجار وتراب القبور.

কবরের মাটি বা পাথর দ্বারা বরকত হাসিল করা ইসলাম স্বীকৃত নয়।

কবরের উপর গাছের ডাল পুঁতে দেয়া:

আমাদের দেশে নতুন কবরের উপর খেজুরের ডাল বা অন্য গাছের তাজা ডাল পুঁতে দেয়ার প্রচলন রয়েছে। ইসলামে এটাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। বর্ণিত হচ্ছে-[৫৩]

عن بن عباس قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا.

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূল (স.) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বললেনঃ "এ কবরবাসীদয়কে আযাব দেওয়া হচ্ছে। তবে কোন কষ্টকর কাজের জন্য তাদেরকে আযাব দেওয়া হচ্ছে না বরং তাদের একজন পরচর্চা করত। আর অন্যজন পেশাব করার পর পবিত্রতা অর্জন করত না।" রাবী বলেনঃ "অতঃপর রাসূল (স.) একটি তাজা খেজুরের ডাল নিয়ে আসতে বললেন। তারপর তিনি এটিকে দ্বিখণ্ডিত করে প্রতি কবরে একখণ্ড খেজুরের ডাল পুতে দিলেন এবং বললেন, হতে পারে এর মাধ্যমে ডালদয় না শুকানো পর্যন্ত তাদের আযাব লাঘব করা হবে।"

উপসংহার:

বাংলাদেশের কবরগুলোকে কেন্দ্র করে যে সকল কর্মকান্ড সংঘটিত হয়, তন্মধ্যে কিছু কিছু কর্মকান্ড বিধান সম্মত। যেমন কবর যিয়ারাত, কবরের উপর গাছের ডাল পুতে দেয়া, বন্যপশু থেকে নুতন লাশ সংরক্ষনের জন্য বেড়া দিয়ে ঘেরা প্রভৃতি। তবে এখানের অধিকাংশ কর্মকান্ডই শরী'আত বহির্ভূত; যেমন কবর গাথা, কবরের উপর গম্বুজ;তৈরী করা, কবরে পুষ্পমাল্য অর্পন করা, কবরে বাতি দেয়া, গালিছা বা অন্য কিছু দিয়ে কবর আচ্ছাদন করা প্রভৃতি। এমনকি ইসলামের আলোকে এই কাজগুলোর অধিকাংশই সর্ব নিকৃষ্ট পাপকাজ শিরকের অন্তর্ভূক্ত। এ দেশের জনগণকে কবর কেন্দ্রিক এই ভয়াবহ শিরক সম্পর্কে সচেতন করে তোলা অত্যাবশ্যক। তারা মুলতঃ অসচেতন। আমাদের দেশের আলেমদের এ প্রসংগে যথেষ্ট ভূমিকা পালন না হওয়াটা এর অন্যতম কারণ। এ বিষয়ে লেখালেখি, আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতির মাধ্যমে গনসচেতনতা সৃষ্টি করা আমাদের সকলেরই ঈমানি দ্বায়িত্ব। গোড়ামী বর্জন করে কুরআন সুন্নাহ এর আলোকেই

যেন আমরা কবর কেন্দ্রিক কর্মকান্ডগুলো পর্যালোচনার মাধ্যমে সত্যকে গ্রহন করতে পারি, হে আল্লাহ, আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করুন। (আমীন)

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. দেখুন সূরাহ আন-নিসা ঃ ১১৬।
২. আল-বারকাওয়ী, মুহিউদ্দীন মুহাম্মদ, যিয়ারাতুল কুবুরিশ শার'ইয়্যাহ, ওশ শিরকিয়্যাহ,(রিয়াদ,১৪০৪হিঃ), পৃ.২৪
৩. আল-নাসাঈ, সুনানুন নাসাঈ, (হালব, ১৪০৬ হিঃ), ৪খ. পৃ.৮৯।
৪. মুসলিম, ছাহীহ মুসলিম, (বায়রূত, তা,বি), ২খ. পৃ.৬৭১।
৫. আব্দুল অহ্হাব, সুলায়মান ইবন আব্দুল্লাহ, তায়সীরুল আযীযুল হামীদ,(বায়রূত-দামিশক, ১৩৯৭ হিঃ),পৃ. ৭০৬।
৬. তিরমিযী, সুনান, (বায়রূত, তা.বি.), ৩খ. পৃ.৯৬৩।
৭. আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কাব্বীর, (আল-মাওছিল, ১৪০৪ হিঃ), ৪ খন্ড. পৃ.৬৫।
৮. ইবন তায়মিয়্যাহ, মাজমু'উল ফাতাওঅ, (রিয়াদ, ১৪১২ হিঃ), ২৪ খ, পৃ. ৩২৬-৩২৭।
৯. আল মুবারাকপুরী, মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান, তুহফাতুল আহঅযী, (বায়রূত, তা.বি.), ৪খ. পৃ. ১৩৭।
১০. ইমাম মুল্লা আলীল কারী, আল-ফিকহুল আকবার তা.বি. পৃ. ১১০।
১১. মুহাম্মাদ আহমাদ আব্দুস সালাম, হুকমুল কিরা'আতুলিল আমওয়াত, (তাইফ, তা.বি)., পৃ. ২১-২২।
১২. আল-বারকাওয়ী, পৃ. ২৬-২৭।
১৩. মুহাম্মাদ আহমাদ আব্দুস সালাম, পৃ. ২২।
১৪. আল-মানাওয়ী, আব্দুর রাউফ, ফায়দুল কাদীর, (মিশর, ১৩৫৬ হি.) ২খ. পৃ.৬৬।
১৫. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد এর অর্থ তিনটি ১. কবরের উপর সিজদাহ ২. কবরের উপর সিজদা দেয়া, তাকে সামনে নিয়ে সালাত আদায় করা ও দু'আ করা ৩. তাঁর উপর মাসজিদ বানান ও সেখানে সালাত আদায়ের ইচ্ছা করা। আল-আলবানী, মুহাম্মাদ নাসীর উদ্দীন, তাহযীরুস সাজীদ, বায়রূত, ১৩৯৮ হিঃ, পৃ. ২৯; দেখুন আল- বুখারী, ছাহীহুল বুখারী, (বায়রূত, ১৪০৭ হিঃ), ১খ. পৃ. ৪৬৮।
১৬. আল-বুখারী, ১ খ., পৃ. ১৬৮ ও মুসলিম, ১খ. পৃ. ৩৭৬।
১৭. আল-বুখারী, ১খ. পৃ. ৪৫০।
১৮. আবু 'আঅনাহ আল-আসফারাইনী, মুসনাদ আবি আঅনাহ, (বায়রূত, ১৯৯৮), ১খ. পৃ.৩৩৫।
১৯. আল ইসমাইলী, আবু বাকর, মু'অজামুশ শুয়ূখ আবী বাকারিল ইসমাইলী , (মদীনাহ, ১৪১০ হিঃ) ৩খ. পৃ. ৭৯৯।
২০. আল-খাতিব মুহিবুবদ্দীন, আল-আসকালানী, প্রণীত ফাতিহুবারী গ্রন্থের হাশীয়া, (কায়রো, ১৪০৯ হিঃ), ৩খ, পৃ. ২৪৭।
২১. আজ-জাহিরী, আলী ইবন আহমাদ, আল-মাহাললী, (বায়রূত, তা,বি.) ৪খ. পৃ. ৩১।
২২. আল-হায়ছামী, ইবন হাজার, আল-যাওআজির 'আন ইকতিরাফিল কাবাইর, (কায়রো, ১৩৩৫ হিঃ) ১খ, পৃ.১২০.
২৩. কুরতুবী, আল-জামি' লিল আহকামিল কুরআন, (কায়রো, ১৩৬৯ হিঃ), ১০খ, পৃ.৩৮।
২৪. আল-বারকাওয়ী, মহিউদ্দীন, মুহাম্মদ, পৃ.৯।
২৫. ইবন হিশাম, আল-সীরাতুন-নববীয়্যাহ, (কায়রো, তা.বি.), ৩খ. পৃ. ১৫২২।
২৬. ইবন কাছির, আল-বিদাআহ অন-নিহায়াহ, (বায়রূত, ১৪০৫ হিঃ), ৯খ. পৃ.৭৯-৮০।
২৭. আল-আলবানী, মুহাম্মাদ নাছির উদ্দীন, পৃ. ৮৫।
২৮. আবু শায়বাহ, আবু বাকর, মুছাননিফ ইবন আবি শায়বাহ, (রিয়াদ, ১৪০৯হিঃ), ৩খ. পৃ. ২৫।
২৯. আল-বুখারী, ৪খ. পৃ. ১৮৭৩।
৩০. মুসলিম, পৃ. ২৯, ৬৬৬।
৩১. আল-শাওকানী, শারহিছ ছুদুর বি তাহরিমি রাফ'ইল কুবূর, (রিয়াদ, ১৪০৮ হিঃ), পৃ. ১৮-১৯।
৩২. আন-নাঅভী, আবু যাকারিয়া, শারহী নাঅভী আলা ছহীহি মুসলিম, (বায়রূত, ১৩৯২ হিঃ), ৭খ, পৃ.২৭।
৩৩. আজীমাবাদী মুহাম্মাদ শামসুল হক, 'উয়ূনুল মা'বুদ, (বায়রূত, ১৪১৫ হিঃ) ৮খ, পৃ. ১৯২।
৩৪. আবূ দাউদ, সুনান, (বায়রূত, তা.বি.,) ২খ. পৃ.২১৮।
৩৫. মালিক, আল ইমাম, মুঅততা মালিক, (মিশর, তা.বি.), ১খ. পৃ. ১৭২।

৩৬. বিস্তারিত দেখুন, আর-রিআসাতুল 'আমমাহ লি ইদারাতিল বুহুছিল ইসলামিয়াহ অল-ইফতা অদ- দাওয়াতি অল-ইরশাদ, ফাতাঅল লাজনাতিদ্দায়িমাতি লিল বুহুছিল ইসলামিয়াতি অদ-দাওয়াহ, (রিয়াদ, ১৪১১ হি):, ১খ. পৃ.২০৯-২০৪ ।
৩৭. আন-নিসাপুনী, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ, আল-মুসতাদরাক আলাছ ছহীআইন, (বায়রূত, ১৪১১ হি:), ১খ.পৃ. ৬৬৭ ।
৩৮. আল-বারকাওয়ী, পৃ. ৩৫ ।
৩৯. প্রাগুক্ত ।
৪০. সূরাহ ইউনুস,১০৬, এ প্রসংঙ্গে আরো দেখুন সুরাহ ফাতির ১৩, সুরহ আহকাফ ৫ ও ৬, সুরাহ আল মু'মিনুন, ১১৭ ।
৪১. আত-তাবারানী, সুলায়মান ইবন আহমাদ, ১২ খ, পৃ. ১৪৮ ।
৪২. আল-বারকাওয়ী. পৃ. ০৭ ।
৪৩. আর-রিআসাতুল আমমাহ লি ইদারাতিল বুহুছিল ইসলামিয়াহ অল-ইফতা অদ-দাওয়াতি অল-ইরশাদ, ১খ. পৃ.১১০
৪৪. আন-সায়য়িদ সাবিক, ফিকহুস সুন্নাহ, (মিশর, ১৪১৪হি:), ২খ. পৃ.৬৬ ।
৪৫. প্রাগুক্ত, ২খ. পৃ.৬৭ ।
৪৬. সূরা আল-মায়িদা: ৩ ।
৪৭. আর-রিআসাতুল আমমাহ লি ইদারাতিল বুহুছিল ইসলামিয়াহ অল-ইফতা অদ-দাওয়াতি অল-ইরশাদ, ১খ. পৃ.১৪১ ।
৪৮. মুবারকুপুরী, ৪খ, পৃ. ১৩১ ।
৪৯. মুসলিম, ২খ, পৃ. ৬৬৭ ।
৫০. সায়য়িদ সাবিক, ১ খ.পৃ. ২৯৫ ।
৫১. মুসলিম, ৩খ. পৃ. ১৬৬৬ ।
৫২. আর-রিআসাতুল আমমাহ লি ইদারাতিল বুহুছিল ইসলামিয়াহ অল-ইফতা অদ-দাওয়াতি অল-ইরশাদ, ১খ. পৃ.২ ।
৫৩. মুসলিম, ১খ. পৃ. ২৪০ ।

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 37-41)

শিক্ষা ব্যবস্থা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

নূরুল আমিন আতিক*

শিক্ষার আরবী প্রতিশব্দ ইল্‌ম বা জ্ঞান এবং বিশেষক্ষেত্রে হিকমত বা কৌশল হিসেবেও এর প্রয়োগ দেখা যায়। এক্ষেত্রে 'শিক্ষা' বলতে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত শক্তিপুঞ্জের 'বিকাশ সাধন' বা তার অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার 'বহিঃপ্রকাশ' ও 'বাস্তবায়ন' বোঝায়। ইংরেজিতে 'Educere' থেকে উদ্ভূত হয়েছে যার ভাবার্থ হলো 'to bring up ' অথবা 'to train' অথবা 'to mould' [১] অর্থাৎ 'শিক্ষা' বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীকে 'লালন করা' অথবা 'প্রশিক্ষণ দেয়া' অথবা কোন কিছুর আদলে তৈরি করা'।

শিক্ষা এমন একটি ধারবিহীন অস্ত্র যা দিয়ে চিন্তা জগতের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়ে থাকে। সৃষ্টির সূচনা হতেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়ে আসছে। পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম (আঃ) আল্লাহ পাকের প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমেই ফিরিশতাকুলের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেন এবং সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হিসেবে বিবেচিত হন। তার ফলশ্রুতিতে আজ মানুষই সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে পরিগণিত ও স্বীকৃত। শিক্ষা মূল্যায়নের মানদণ্ড। টিকে থাকা ও না থাকার মাপকাঠি। শিক্ষা হলো এমনই একটি প্রক্রিয়া যার চূড়ান্ত অর্থ 'মানুষের মুক্তি'।

শিক্ষা হচ্ছে মানসিক গুনাবলীর অনুশীলন মাত্র, বস্তু জগতের দ্রব্য সামগ্রী ও তার গুনাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত। কেউবা মনে করেন, 'বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের অর্থ শিক্ষা'। কিন্তু যারা সমাজের সাধারন লোক তারা শিক্ষা বলতে বিদ্যার্জনকেই বুঝে থাকেন। অর্থাৎ পুঁথিগত বিদ্যাকে শিক্ষা বলে মনে করে থাকেন। শিক্ষাকে যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হোক না কেন, কোনটাকেই যেমন একবারে বাদ দেওয়া যায় না, আবার সেগুলোকে শিক্ষার পরিপূর্ণ সংজ্ঞা বলে গ্রহণও করা যায় না; যেমন : অ, আ, ই, কা, তা, এগুলোকে আপাত দৃষ্টিতে শিক্ষা বলে ধারণা করা হয় বটে, কিন্তু তাই বলে তাকে সত্যিকারের শিক্ষা বলা যায় না। বরং সেগুলো শিক্ষার উপকরণ মাত্র। আবার কোন কোন জিনিসের নাম বা তার গুনাবলী জানা ও পূর্ণ শিক্ষা নয়। কারণ তাকে ঠিকমত কাজে প্রয়োগ করার কৌশল জানা, তাকে প্রকাশ করাও ভবিষ্যতে বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের সাফল্য ও নিশ্চয়তা দান করার নামই শিক্ষা।

শিক্ষা এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে নর-নারী, যুবক-বৃদ্ধ সকলেই নিজ ও তার সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এটি সমাজে সঠিকভাবে তার দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত করে। পুটোর ভাষায়, 'সমাজের সকলের উপকারের জন্য ব্যক্তি বিশেষের মেধা ও প্রতিভা যে কাজে যথাযোগ্য হবে সেই কাজের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়াটাই শিক্ষা।'[২]

মহা কবি আল্লামা ইকবালের মতে, 'মানুষের খুদী বা রূহকে উন্নত করার প্রচেষ্টার নামই শিক্ষা।'

মহা কবি মিলটনের মতে, 'Eduction is the harmonious development of body, mind and soul' অর্থাৎ দেহ, মন ও আত্মার সমন্বিত উন্নতির নামই শিক্ষা।[৩] কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, 'মানুষের অন্তর্নিহিত গুনাবলীর উন্নতি ও বিকাশ সাধনই শিক্ষা।'

জন ডিইউর মতে, 'সময়ের প্রয়োজনের সাথে খাপ খাওয়ানোর যোগ্যতা অর্জনের নামই শিক্ষা।'

সক্রেটিসের মতে, 'knowledge is power by which things are done'

এজন্য অনেকেই জ্ঞানার্জনকে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গন্য করেছেন। সক্রিটিসের মতো বেকন ও কামেনিয়াসও জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে শিক্ষা লাভের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তারা জীবনের বস্তুগত, সামাজিক, নৈতিক, আত্মিক ও অর্থনৈতিক সকল জ্ঞানকে অপরিহার্য বলে বিবেচনা করেছেন।[৪]

আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা তিন ধরনের রয়েছে, যা প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু- ১. মাদ্‌রাসা শিক্ষা, ২. বাংলা মাধ্যম এবং ৩. ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা, এই তিনটি স্বতন্ত্র ধারা শুধু মৌলিকত্বেই ভিন্ন নয়, বরং এরা পরস্পর সাংঘর্ষিকও বটে।

---

* ৬ষ্ঠ সেমিষ্টার, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

এক. মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা: এই শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলাম ধর্মীয় রীতিনীতি ও আইন-কানুন শেখানো হয়। এখানে দু'ধারার মাদ্‌রাসা (ক) সরকারি বা আলিয়া মাদ্‌রাসা, (খ) কাওমি মাদ্‌রাসা, উভয় শিক্ষা ব্যবস্থা পদ্ধতি, সিলেবাস ও চিন্তাধারার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আলিয়া মাদ্‌রাসায় বাংলা ও আরবিতে এবং কাওমি মাদ্রাসায় আরবী, উর্দু ও ফারসি ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়।

আলিয়া যা মানুষের জৈবিক সামাজিক চাহিদার পাশাপাশি মৌলিক চাহিদা তথা আখেরাতের সম্বল পূরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর কাওমি যেখানে মানুষের জৈবিক-সামাজিক চাহিদা উপেক্ষিত।

দুই. বাংলা মাধ্যম: এই মাধ্যম দেশের স্বীকৃত শিক্ষা ব্যবস্থা। এটি সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয় এবং জৈবিক সামাজিক বিষয় বস্তুর পাশাপাশি জাতীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সমন্বয়ের একটি প্রচেষ্টা এখানে রয়েছে, কিন্তু নীতি-নৈতিকতার অভাব রয়েছে যা ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে আসে।

তিন. ইংরেজী মাধ্যম: এই শিক্ষা ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে এর শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বললে ভুল হবে, মূলত সুনির্দিষ্ট কতিপয় দেশের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে এর শিক্ষাক্রম প্রণীত। ইংল্যান্ডে প্রণীত এই শিক্ষাক্রমের বিষয় বস্তুর সাথে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ও চিন্তা চেতনার কোন মিল নেই। ফলে এর শিক্ষার্থীরা জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সমাজ ব্যবস্থা এবং ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে কোন ধরনের জ্ঞান ও দক্ষতা ছাড়াই বেড়ে ওঠে।

এই তিনটি স্বতন্ত্র ধারার মধ্যে আবার নানারূপ বিভক্তি ও উপ-বিভক্তি দেখা যায়। এই বিভক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্যের একটি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এদেশের ধনী লোকদের সন্তানরা ইংরেজি মাধ্যমে, মধ্যবিত্ত বা স্বল্পবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েরা বাংলা মাধ্যমে আর অধিকাংশ দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা আলিয়া বা কাওমি পড়া-লেখা করে। ফলে সামাজিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে এক ধরনের বিভেদের সৃষ্টি হচ্ছেই। এই ভিন্ন ভিন্ন ধারায় শিক্ষা প্রাপ্ত শিক্ষিতদের মধ্যে মনোভঙ্গির যে তারতম্য কচি বয়স থেকেই গড়ে ওঠে, উচ্চ শিক্ষা পর্যায় বা কর্মজীবনে সেটা সাধারণত বাড়ে কিংবা আরো ঘনীভূত হয়। খুব কম ক্ষেত্রেই সেই তারতম্য ঘোঁচানোর স্বাভাবিক বা সচেতন প্রচেষ্টা কার্যকর হয়।

ফলে সমাজ সংঘাতের ক্ষেত্রে তৈরি হয় এক ধরনের নাগরিক বৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য, পারিবারিক বন্ধনের বৈষম্য, ধর্মীয় বৈষম্য, রাজনৈতিক বৈষম্য। জাতীয় ঐক্যে বৈষম্য। এক ধরনের শ্রেণী বিদ্বেষের শুঁচিবাই শিক্ষাঙ্গন থেকেই সৃষ্টি হয়। এর ফলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যেমন বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে, তেমনি আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়া বহির্ভূত কৃত্রিম শ্রেণী সংঘাতের অন্ধকূপে আবদ্ধ হয়ে জাতি রাষ্ট্রের জন্য পিছুটান হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

যেমন: ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা নিজ দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ধর্মীয় জ্ঞান এবং মূল্যবোধের বাস্তবতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের (শিক্ষার) অভাবে বেড়ে ওঠে একটা বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী হিসেবে। ফলে এদেশের মাটি ও মানুষ এবং ধর্মীয় মূল্যাবোধের সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে তারা পাড়ি জমায় বিদেশে, পরিচিত হয় অভিবাসী হিসেবে, পরিণত হয় ছিন্নমূল (Rootless) জনগোষ্ঠীতে।

অপরদিকে, বাংলা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তরেই ৮ (আট) ধরনের বিদ্যালয় রয়েছে। যেমন:

	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শতকরা হার
১	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭৬৭১	৪৮.২২
২	রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৪২৮	২৮.৮৭
৩	নন রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৭১	২.৫০
৪	পিটি আই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়	৫৩	০.০৭
৫	কিন্ডারগার্টেন স্কুল	২৪৭৭	৩.১৭
৬	এনজিও বিদ্যালয়	১৭০	০.২২
৭	কমিউনিটি বিদ্যালয়	৩২৬৮	৪.১৮
৮	উচ্চ মাধ্যমিক সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৭৬	২.০৪

এই বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু ও শিক্ষাদান পদ্ধতি একটি থেকে অন্যটি ভিন্ন।[৫]

অন্যদিকে, আলিয়া সর্বাত্মক নীতি নৈতিকতা ও ইসলামী আইন-কানুন বজায় রেখে যুগ-উপযোগী সিলেবাস নির্ণয়ের প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কাওমি জৈবিক সামাজিক চাহিদাকে অগ্রাহ্য করে কেবল ইসলামী আইন-কানুন, নীতি-নৈতিকতাকে প্রাধান্য দিযে নিজেদের ও সামাজিক উন্নয়নে প্রচেষ্টার ব্যর্থতা প্রমান করছে। এক্ষেত্রে কেবল তাদের ব্যর্থতা নয় বরং এদেশের শিক্ষানীতি নির্ধারক ও সরকারগুলোও ব্যর্থ বলে প্রমানিত।

পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে জন্ম হয় "স্বাধীন বাংলাদেশ"। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন আর আশা-আকাঙ্খার রূপায়নে শিক্ষাকে হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই প্রয়োজন হলো নতুন শিক্ষানীতি কিন্তু না, নতুন শিক্ষানীতি সেই স্বপ্নপূরণে সক্ষম হলো না। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে গঠিত হয় নতুন কমিশন। এভাবে একে একে ৯টি কমিশন:[৬]

১. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (সভাপতি : ড. কুদরত-ই-খুদা)–১৯৭৪

২. অন্তবর্তীকালীন শিক্ষানীতি: জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশ (সভাপতি: কাজী জাফর আহমেদ/ আবদুল বাতেন)–১৯৭৯

৩. শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থাপনা কমিশন (সভাপতি: আবদুল মজিদ খান)–১৯৮৩

৪. বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন (সভাপতি: মফিজ উদ্দিন আহমেদ) – ১৯৮৬

৫. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্স (সভাপতি: আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন)–১৯৯৩

৬. জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি (সভাপতি: মোহাম্মদ শামসুর হক)–১৯৯৭

৭. জাতীয় শিক্ষা কমিটি - ২০০০

৮. শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটি (সভাপতি: মুহাম্মদ আব্দুল বারী)–২০০২

৯. জাতীয় শিক্ষা কমিশন (সভাপতি: মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা)–২০০৩[৭]

এতে দেখা যায়, পাঁচ শিক্ষা কমিটি / কমিশনের (১৯৭৪, ১৯৭৯, ১৯৮৬, ২০০০ ও ২০০২) মোট ৭২টি সুপারিশের মধ্যে ৯টি বাস্তবায়িত হয়েছে, ৮টি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে, ৩টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, ১১টি মোটেও বাস্তবায়িত হয়নি আর বাকি ১০টি নানা ধরনের পরিবর্তন সাপেক্ষে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সুতরাং সুপারিশসমূহের অধিকাংশই (উপরের হিসাব মতে ৫৭%) বাস্তবায়িত হয়নি। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

আর বর্তমান শিক্ষানীতি সংস্কার কমিটিতে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, জাতীয় অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধি, শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং একজন শিক্ষা বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। কমিটি এবং শিক্ষানীতি নির্ধারকগণের আলোকে বর্তমান শিক্ষানীতি প্রণীত হবে "ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন" এবং "শামসুল হক কমিটি"র রিপোর্টের ভিত্তিতে। এই দু'টি কমিশন/কমিটি রিপোর্টের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। উভয় রির্পোটেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার কাঠামোগত সংস্কারের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরের আওতা প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বর্ধিত করণ ও সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক ও অভিন্ন পাঠ্য বিষয় থাকবে। অন্যদিকে, মাধ্যমিক স্তর হবে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। উচ্চ শিক্ষা স্তর মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকবে এবং শিক্ষাকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে যুগোপযোগী ও উন্নয়ন মুখী করার কথা বলা হয়েছে। তবে উভয় কমিশনের রিপোর্টে ধর্ম শিক্ষার প্রতি অনীহা প্রদর্শন করা হয়েছে। ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট ধর্ম শিক্ষা বা নৈতিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করা হয়নি, তা ঐচ্ছিক বা গৌন। আর শামসুল হক কমিটির রিপোর্টে ধর্ম শিক্ষাকে যদিও আবশ্যিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে, কিন্তু এর নম্বর কমিয়ে ৫০ নির্ধারণ করা হয়। যা মূলত ধর্ম শিক্ষার প্রতি অনীহা প্রদর্শন করে ধর্মনিরপেক্ষ নীতির আলোকে এই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে।

Concrete ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা বিকাশ ঘটবে কিন্তু ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ ও তার নৈতিক গুনাবলীর পরিস্ফুটন ঘটবে না। কারণ ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ ও নৈতিকতার জাগরণ ধর্মীয় শিক্ষা থেকে উৎসারিত।[৮]

এক্ষেত্রে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মীয় তথা ইসলামী শিক্ষাকে আবশ্যক করতে হবে। মাধ্যমিক স্তরে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি পেশাগত দক্ষতা অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা ঐ বিষয়ে পড়াশোনা করে সুনির্দিষ্ট পেশায় নিয়োগ লাভ করতে পারে। উচ্চ শিক্ষাকে পেশাগত উচ্চ শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি মৌলিক জ্ঞান চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে,

বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে, এজন্য গবেষণা খাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। যার মৌলিক ভূমিকা পালন করবে শিক্ষানীতি নির্ধারকগণ ও সরকার। এর পাশাপাশি যে সমস্ত বিষয়গুলোর প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন, তা হলো:

১. জনগণের চাহিদা ও আকাঙ্খা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে ইসলামী পদ্ধতি ও যুযোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা হওয়া।
২. মেধা ও সৃজনশীলতার চর্চা ও বিকাশের লক্ষ্যে উৎসাহমূলক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।
৩. জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্ধ এবং তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করণ।
৪. শিক্ষকদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বেতন ভাতাসহ সকল সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে শিক্ষার মান নিশ্চিত করা।
৫. শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষকদের ত্রৈমাসিক, অর্ধবাৎসরিক এবং বাৎসরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
৬. মনিটরিং ও সুপারভিশন বাস্তবায়ন করা।
৭. শিক্ষা খাতে নৈরাজ্য ও বৈষম্য বন্ধ করা।
৮. সর্বক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং দেশপ্রেমকে প্রাধান্য দেওয়া।
৯. শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা ও প্রচার মাধ্যমগুলোর জোরাল ভূমিকা পালন করা।
১০. জাতির প্রতি কর্তব্যবোধ ও আনুগত্য পরায়ন এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করন।
১১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি বা গভার্নিং বোডিং অথবা পরিচালনা কমিটি অবশ্যই সু-শিক্ষিত হওয়া।
১২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নত হওয়া।
১৩. শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মাঝে মাতৃ ও পিতৃসুলভ সম্পর্ক থাকা।
১৪. সর্বোপরি শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষার তথা ইসলামী শিক্ষার সক্রিয়তা ও স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে হবে।[৯]

আর এই সমস্ত বিষয়গুলোকে ইসলাম ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা সমর্থন করে। কেননা আজকের পৃথিবী এ কথাই প্রমাণ করছে যে, মানুষের শান্তির জন্য প্রধান হুমকি কেবল অনুন্নয়ন ও দারিদ্রতাই নয় বরং অনৈতিকত ও একটি বড় সমস্যা। আর পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্যই প্রয়োজন Morality, Manner বা Ethics। আর সেই জিনিস মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র জাগ্রত করতে পারে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা। এই জন্যই মহাগ্রন্থ আল কুরআনের প্রথম অবতীর্ন বাণী ছিল

"اقرأ باسم ربك الذي خلق "

অর্থাৎ পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আলাক: ১)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

"هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون "

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জ্ঞান রাখে আর যে জ্ঞান রাখে না এ দু'ব্যক্তি কি সমান হতে পাবে? (সূরা আয-যুমার:৭)

আরো বলা হয়েছে

من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا

অর্থাৎ যাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করা হয়েছে তাকে মহাকল্যানে ভূষিত করা হয়েছে।

(সূরা আল-বাকারা: ২৬৯)

কুরআনে আরো বলা হয়েছে, "يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات'

অর্থাৎ তোমাদের মাঝে যারা ঈমানদার এবং জ্ঞানপ্রাপ্ত মহান আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দেবেন। (সূরা আল-মুজাদালাহ: ১১)

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "طلب العلم فريضة على كل مسلم"
অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ইলম অর্জন করা ফরয। (মিশকাত)

এ প্রসঙ্গে, S.N.O Zulfaqar Ali তার 'The Modern Teacher' গ্রন্থের শুরুতে উল্লেখ করেছেন,

"In the Quran education has been urged as a duty. It is to be noted that the holy book opens with the verse Ekra Bismee Rabbika llaji khalaqa." : Read in the name of the lord and the very title Quran which is derived from the word kara'a means the thing reads.[10]

শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামের কাজ হলো পরিপূর্ণ মানবসত্ত্বাকে লালন করা, গড়ে তোলা, এমন একটি কর্মসূচী যা মানুষের দেহ, তার বুদ্ধিবৃত্তি এবং আত্মা, তার বস্তুগত ও আত্মীক জীবন এবং পার্থিব জীবনের প্রতিটি কার্যকলাপের একটিকেও পরিত্যাগ করে না, আর কোন একটির প্রতি অবহেলাও করে না।

অনৈসলামিক শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষের বাহিরে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটাতে পারলেও, ভেতরের মানুষকে সুন্দরতম হিসেবে বিকশিত করতে পারে না। সারা দুনিয়া আজ পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থার অনুকরণ ও অনুসরণ করে জাতে ওঠার চেষ্টা করছে, অথচ পশ্চিম তার গগনচুম্বী উন্নতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দূরতিক্রম্য অগ্রযাত্রা সত্ত্বেও মানবিকতার এক করুন সংকট মোকাবেলা করছে। শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তসারশূন্য আয়োজন। সেখানে ডিগ্রীর পাশাপাশি নৈতিকতাকে স্থান না দেয়ায় শিক্ষা ব্যবস্থা একটি কারখানায় পরিণত হয়েছে। যেখানে ধর্ম উপেক্ষিত সেখানে সকল মহৎ চিন্তা, সৎকর্ম কল্যাণকামিতা ও কল্যাণধারা অনুপস্থিত। ধর্মবোধ তথা স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যই মানুষকে দায়িত্ববোধ সম্পন্ন, কর্তব্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ন, সৎকর্মশীল, জবাবদিহিতা, বিনয় ও দেশ প্রেমিক হতে শেখায়। তাই আজ জাতির ক্লান্তিলগ্নে বাংলার সমাজকে সু-প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুগ উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে আবশ্যক করা একান্ত প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র:

১ ঘোষ ও রায় : ১৯৮৭ঃ১

২ ড. এম জাফর ইকবাল, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রেক্ষিত ইসলাম, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯, ১৯৯৬, পৃ: ৪৭

৩ আহসান হাবীব ইমরোজ, আলোকিত জীবন চাই, মাসিক ছাত্র সংবাদ, ৪৮/১-এ, পুরান পল্টন, ঢাকা- ১০০০, পৃষ্ঠা-২৫,

৪ মুহাম্মদ রেজাউল করিম, শিক্ষার মৌলতত্ত্ব, মাসিক ছাত্র সংবাদ, জুন ২০০৯, পৃষ্ঠা-২৫

৫ জাতীয় শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন ২০০৩ (প্রকাশিত মার্চ ২০০৪) পৃ: ২৮

৬ শাহরিয়ার শফিক, শিক্ষানীতি সংস্কার সংকট ও করণীয়, মাসিক ছাত্র সংবাদ, জুন ২০০৯, পৃ: ৮-১০

৭ এ.কে.এম. আজহারুল ইসলাম, শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্‌রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম, আহসান পাবলিকেশন, ৩৮/৩ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, জুন ২০০৩

৮ শাহরিয়ার শফিক, শিক্ষানীতি সংস্কার সংকট ও করণীয়, মাসিক ছাত্র সংবাদ, জুন ২০০৯, পৃ: ১০-১১

৯ ড. মোঃ আশরাফ আলী, শিক্ষা প্রসঙ্গ, সূচীপত্র, ৩৮/২(ক) বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, ২০০৬

১০ Ali : 1968:3

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 42-55)

মানব সভ্যতায় ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের বাস্তবতা : প্রেক্ষিত নিন্দুকদের সমালোচনা

আতাউর রাহমান নাদভী*

মানব সভ্যতা ও সমাজে ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা নুতন কিছু নয়। আল্ কোরআন ও হাদীসে নাববীতে ইসলামী রাষ্ট্রের সু-স্পষ্ট একটি চিত্র পাওয়া যায়। তাছাড়া ইসলামী পন্ডিতরা অত্যন্ত নিরলসভাবে যুগে যুগে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা জাতির সামনে তুলে ধরছেন। তবে মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্য পোষণের পরও কিছু কিছু বিষয়ে তাদের মাঝে মত বিরোধ ছিলো। যুক্তি প্রমাণ নিয়ে তর্ক বিতর্ক তখনও ছিলো এখনও আছে। তবে ঐ সব ছিলো Theorycal আলোচনা ও সমালোচনা। কিন্তু মানব ও মানব সমাজ ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের Practical অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে বহু আগেই। শত শত বছর ধরে মানব সভ্যতা উপরোক্ত অভিজ্ঞতার ফলও ভোগ করে আসছে। তার পরও অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য বর্তমান যুগে কোথাও যদি কেউ ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের স্বপক্ষে কোনো যুক্তি দেখিয়ে বর্তমান বিশ্বে ইসলামী বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন তাহলে নিন্দুকরা তার উপর এমনভাবে ঝাপিয়ে পড়ে যেন তিনি কোনো মহা পাপ করে ফেলেছেন। তাই তথাকথিত সুশীল(?) সমাজের ব্যানারে সভা সমিতি, সেমিনার ও সেম্পোজিয়াম করে দেশ ও জাতিকে সতর্ক সংকেত দেয়া তাদের এক মহা কর্তব্য মনে করে। বোকা জাতিকে বুঝাতে চায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা হলে দেশ রসাতলে যাবে শুধু তাই নয়, বরং সর্বত্র মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবে। ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কাল্পনিক অভিযোগ উত্থাপন করে তাদেরকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারলেই কেল্লা ফাতেহ মনে করে। ইসলাম এযুগে অচল, বিশ্বায়নের যুগে আবার সেকেলের ইসলাম? বিশ্ব যেখানে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে যাচ্ছে সেখানে আমরা সেকেলের ইসলামের দিকে ফিরে যাবো? আমাদের দেশের কাঠমোল্লারা হায় ইসলাম ! হায় ইসলাম বলে জাতিকে পশ্চাদে ফিরে নিয়ে যেতে চায়। ইসলাম একটি স্বেচ্চাচারী ধর্ম। যে ধর্ম অন্যের ধর্ম কর্মকে সহ্য করে না। এখানেই শেষ নয়, তারা ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রপাগান্ডা চালিয়ে বলতে থাকে যে, ইসলামে উদারতা নেই। মুক্তচিন্তা ও বাকস্বাধীনতাসহ ভিন্ন মত ও পথ অবলম্বন ও প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে কট্টরপন্থা ও গোড়ামী শিক্ষা দেয়। শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তারা ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটাতে চায়। ইসলামের আঙ্গিনায় ন্যায় ইনসাফের কোনো বালাই নেই। ইসলাম ও তার অনুসারীরা কোনো নিয়ম নীতি মানতে চায় না। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে অমুসলিমদের অধিকার বলতে কিছুই নেই। ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিমদের অধিকার নিশ্চিত করেনা। ইসলাম সব সময় সেকেলের চিন্তা চেতনাকে লালন করতে শেখায়। আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার কোনো শিক্ষা ইসলাম দেয় না। মোদ্দাকথা ইসলাম আধুনিক শিল্পকর্মসহ সভ্যতা ও সাংস্কৃতির চির শত্রু। উল্লেখ্য যে, নিন্দুকরা সরকারের যেমন সহযোগীতা পায় তেমনিভাবে তথ্য প্রযুক্তির সকল সুযোগ সুবিধাও ভোগ করে। মিডিয়ার সকল প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ যেমন পাচ্ছে তেমনিভাবে তারা মিডিয়ার জগতের লোকদেরও শতভাগ সাপোর্ট পাচ্ছে। ইসলামের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে তারা এক প্রকার Paranoia বা বদ্ধমূল ধারণাঘটিত অনারোগ্য রোগে ভোগে। যার অর্থ নিজেরা উন্নত আর অন্যরা অনুন্নত। এটি একটি Delusions of grandeur বা বিশালতার প্রতারণা যা একটি মানসিক রোগ। এই রোগে কেউ আক্রান্ত হলে সে নিজেকে সব সময় বড় মনে করে। তাই তারা ইসলামের বিরুদ্ধে উপরোক্ত সকল অপপ্রচার ও অত্যন্ত নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাচ্ছে। আজ কাল ইসলামের বিরোধীতা করা এক প্রকারের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। এটিকে তারা দেশ-বিদেশে পরিচিতির সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করছে। তাই তারা আধাজল খেয়ে ইসলামের বিরোধীতার জন্য মাঠে নেমে পড়েছে। প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে, আধুনিক বিশ্বে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অবাস্তব ও সেকেলের চিন্তাধারা ছাড়াও এটি একটি অমূলক দাবী। তাই ক্বোরআন, হাদীস ও ইতিহাসের আলোকে নিন্দুকদের উপরোক্ত মিথ্যা প্রপাগান্ডার জাওয়াব দেয়ার জন্যই আমার এই সামান্য প্রয়াস।

---

* সহকারী অধ্যাপক, (CENURC), IIUC.

পৃথিবীর যেখানেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে অংকুরেই সে সবের মুলোৎপাটনের জন্য বিভিন্ন প্রকারের ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। ইসলামের স্ফুলিঙ্গকে নিভিয়ে দেয়ার জন্য প্রকাশ্যে হুংকার দেয়া হচ্ছে শুধু তা নয়, রাজনৈতিক শক্তি ব্যবহারেও ইসলাম বিরোধী শক্তি কখনো পিছপা হচ্ছে না। ইসলামপন্থীদের উপর যুলুম-অত্যাচার নির্যাতন ও নিপীড়নের সময় তারা গণতন্ত্র ও বাকস্বাধীনতা, মুক্তচিন্তা ও সহিষ্ণুতা, উদারতা ও ন্যায় নীতি, আদ্‌ল ও ইনসাফের সকল দাবী ও মানবাধিকারের সকল শ্লোগান বে-মালুম ভুলে যাচ্ছে। যেন ইসলামের হাত হতে দেশ ও জাতিকে বাঁচানোর জন্য অত্যাচারের সকল সীমা অতিক্রম করা শুধু বৈধ নয়, বরং তাদের আঙ্গিনায় এটি সম্পূর্ণ স্বীকৃতও বটে। তাই এখানে ইসলামের বিরুদ্ধে দোস্ত-দুশমণ সকল আঙ্গিনায় উত্থাপিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ইসলামের সঠিক অবস্থান ও নীতি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ইসলামে ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব:

যুলুম-অত্যাচার, নির্যাতন-নিপীড়নের নির্দিষ্ট কোনো আকার আকৃতি নেই। এটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকসহ সংজ্ঞা না জানা আরো কত প্রকারের হতে পারে তা শুধু যালেম ও মযলুমরাই বলতে পারে। বিশ্বের সকল মানব সম্প্রদায় নির্যাতনের এসব তিক্ত অভিজ্ঞতা অতীতে যেমন অর্জন করেছে বর্তমানেও করছে। আজ যেসব দেশ ও জাতি যত উন্নত ও সভ্য বলে দাবী করছে তাদের জগতে যুলুম অত্যাচারের চিত্রও তত ভয়াবহ। অথচ ইসলাম কোনো প্রকারের যুলুম অত্যাচারের সমর্থন করে না। ইসলামে কোনো ভাবেই নির্যাতন ও নিপীড়নের কোনো অনুমতি নেই। বরং ইসলাম তার অনুসারীদেরকে শুধু ন্যায় ইনসাফের শিক্ষা দেয় না বরং জীবনের সকল মোড়েও মানতে বাধ্য করে। ইসলামের এই সু-মহান মূল নীতির উপর মানব সভ্যতার সু-উচ্চ ইমারাত প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেই শান্তিময় এক পৃথিবী মানব ও মানবতাকে উপহার দেয়া সম্ভব। এসম্পর্কে আল্ কোরআনে সু-স্পষ্ট বলা হয়েছে :

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)

(আল্লাহ ন্যায়নীতি, পরোপকার ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করার হুকুম দেন এবং অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা ও দুস্কৃতি এবং অত্যাচার বাড়াবাড়ী করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষালাভ করতে পারো)[১]

অন্যত্র আরো বলা হয়েছে :

{ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسطِ } (তাদেরকে বলে দাও, আমার রব তো সততা ও ইনসাফের হুকুম দিয়েছেন)[২]। এখানেই শেষ নয়, পবিত্র কোরআনে আরো বলা হয়েছে :

{ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}

(ওজন ও পরিমাপে পুরোপুরি ইনসাফ করো, প্রত্যেক ব্যক্তির উপর আমি ততটুকু দায়িত্বের বোঝা রাখি যতটুকু তার সামর্থের মধ্যে রয়েছে। যখন কথা বলো তখন ন্যায্য কথা বলো, চাই তা তোমার আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারই হোক না কেন)[৩]।

উল্লেখিত আয়াত সমূহ ঈমান ও ইয়াক্বীনের সাথে অধ্যয়ন করলে যে কোন ব্যক্তি অতি সহজে ইসলামের সঠিক পয়গাম অনুধাবন করতে পারবে। মানব সমাজে ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠাই হলো ইসলামের মূল লক্ষ্য। অতএব ইসলামের বিরুদ্ধে যা বলা হচ্ছে এসব মিথ্যা প্রপাগান্ডা ছাড়া আর কিছুই নয়, এটি বুঝতে তার আর বাকী থাকবে না। ন্যায়-নীতি, আদ্‌ল-ইনসাফের রশী মুসলমানের হাত হতে কখনো পৃথক হতে পারে না। এই ময়দানে আত্মীয়-স্বজনের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলেও তাকে আল্লার হুকুমের সামনে মাথা নত করে অবিচল থেকে ঈমানের নমুনা পেশ করতে হবে। এটি ঈমান ও ইয়াক্বীনের দাবী। এমন কঠিন পরীক্ষায় তাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। পবিত্র ক্বোরআনে একথাটি আরো পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। দেখুন ক্বোরআন কী বলে :

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً }

(হে ঈমানদারগণ ! ইনসাফের পতাকাবাহী ও আল্লাহর সাক্ষী হয়ে যাও। তোমাদের ইনসাফ ও সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের ব্যক্তিসত্তার অথবা তোমাদের বাপ-মা ও আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে গেলেও। উভয় পক্ষ ধনী বা অভাবী যাই হোক না কেন আল্লাহ তাদের চাইতে অনেক কল্যাণকামী। কাজেই নিজেদের কামনার

বশবর্তী হয়ে ইনসাফ থেকে বিরত থেকো না। আর যদি তোমরা পেঁচালো কথা বলো অথবা সত্যতাকে পাশ কাটিয়ে চলো, তাহলে জেনে রেখো তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ তার খবর রাখেন)[৪]

সমাজ হতে যুলুম-অত্যাচার দূর করে ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধারের প্রথম কর্তব্য ও দায়িত্ব। কারণ ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত সমাজ বা রাষ্ট্রে কোনো প্রকারের যুলুম-নির্যাতন, না-ইনসাফি ও অধিকার লঙ্ঘনের কোনো সুযোগ নেই। এসম্পর্কে আল্ কোরআনের সু-স্পষ্ট বক্তব্য হলো :

{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً}

আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমানাত তাদের হক্বদারদের হাতে ফেরত দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর লোকদের মধ্যে ফায়সালা করার সময় আদ্‌ল ও ন্যায়নীতিসহকারে ফায়সালা করো। আল্লাহ তোমাদের বড়ই উৎকৃষ্ট উপদেশ দান করেন। আর অবশ্যই আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন[৫]।

ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম, শত্রু-মিত্র সবই সমান। এখানে কোনো বিপর্যয় বরদাশ্‌ত করা হবে না বলেও সতর্ক করা হয়েছে। পবিত্র কোরআন এ সম্পর্কে বলেছে :

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }

(হে ঈমানদারগণ! সত্যের উপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত ও ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাও। কোনো দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন উত্তেজিত না করে দেয়, যার ফলে তোমরা ইনসাফ থেকে সরে যাও। ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করো। এটি আল্লাহভীতির সাথে বেশী সামাঞ্জস্যশীল। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কে আল্লাহ পুরোপুরি অবগত আছেন)[৬]।

আদ্‌ল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় কোনো সমস্যা দেখা দিলে সেখানে শক্তি প্রয়োগেরও ইসলাম অনুমতি দিয়েছে। এ সম্পর্কে আল্ কোরআনে বলা হয়েছে :

{لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}

আমি আমার রাসূলদের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং হিদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছি। তাদের সাথে কিতাব ও মিযান নাযিল করেছি, যাতে মানুষ ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর লোহা নাযিল করেছি যার মধ্যে বিরাট শক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে। এটা করা হয়েছে এজন্য যে, আল্লাহ জেনে নিতে চান কে তাঁকে না দেখেই তাঁকে ও তাঁর রাসূলদের সাহায্য করে। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী[৭]।

ইসলাম এভাবেই জীবনের সকল মোড়ে আদ্‌ল ও ইনসাফ কায়েম রাখার আদেশ দিয়েছে। ব্যক্তি ও পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে এসম্পর্কে বাধ্য করা হয়েছে। এব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য এতই পরিষ্কার যে, বিবেকবান কোনো মানুষই এ সীমা লঙ্ঘন করার সাহস করতে পারে না। এর পরও যদি কেউ এই সীমা অতিক্রম করে তাহলে পুরো দায় দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। নিজের কৃত কার্যের জন্য ইসলামকে বদনাম করা যাবে না। ব্যক্তির কথা ও কাজের সাথে ইসলামকে জড়িয়ে অপপ্রচার চালানোর প্রবণতা আমাদের সমাজে লক্ষ করা গেলেও ইসলাম এসব অপকর্ম হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও অনেক দূরে তার অবস্থান।

ইসলাম প্রতিষ্ঠায় শক্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধ :

ইসলামের বিরুদ্ধে নিন্দুকরা যেসব অভিযোগ করে আসছে তার অন্যতম অভিযোগ হলো ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের স্বভাবের মধ্যে জোর জবরদস্তির মানসিকতা রয়েছে। ইসলাম অন্যদেরকে জোর করে নিজের অনুসারী বানাতে চায়। বল প্রয়োগের মাধ্যমে বিপরীত চিন্তাধারাকে দাবিয়ে রাখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ইসলামপন্থীরা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার ও রাষ্ট্রকে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে বাধ্য করতে চায়। এসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে আমরা এখানে বলতে চাই, পৃথিবীতে অসংখ্য মতাদর্শ ও ধর্ম-কর্ম রয়েছে। অগণিত বহুমুখী চিন্তাধারার লোকও সমাজে রয়েছে। সবার দাবী হলো তারাই সর্বোত্তম জাতি ও তাদের ধর্ম-কর্মই হলো সঠিক। ঠিক অনুরূপভাবে ইসলামও একমাত্র সত্য ও সঠিক ধর্ম বলে দাবী করছে। তাই ইসলাম তার গতিকে বিশ্বের সকল মানুষের কাছে দা'ওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে পৌঁছে দিতে চায়। শক্তি প্রয়োগের কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যাচার ও বিদ্বেষ প্রসূত। কারণ ইসলামের মূল শক্তি হলো আল্লাহর কোরআন ও তাঁর রাসুলের সুন্নাত।

উপরোক্ত দু'টির কোথাও এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে বলে প্রমাণ করা তো দূর কী বাত, আজ পর্যন্ত কেউ দাবীও করতে পারেনি। কারণ কোরআন তার অনুসারীদেরকে দা'ওয়াতের কাজ শেখাতে গিয়ে এমন এক পন্থা অবলম্বন করতে বলেছে যা মাবন সমাজের কোনো ধর্ম এর পূর্বে কল্পনাও করতে পারেনি। কোরআন ঐ পন্থাকে শত্রু মিত্র সবার জন্য এভাবে বেকর্ড করেছে :

{ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}

হে নবী! প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং সদুপদেশ সহকারে তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও, এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। তোমার রবই বেশী ভাল জানেন কে তাঁর পথচ্যুত হয়ে আছে এবং কে আছে সঠিক পথে[৮]।

যিনি পয়গামের স্রষ্টা তিনি নিজেই সেই পয়গামের প্রচার ও প্রসারের জন্য দা'য়ীদেরকে যুক্তি প্রমাণ অবলম্বনের মাধ্যমে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য বলার পর সে পয়গামের অনুসারীরা শক্তি প্রয়োগ করে দল ভারী করতে চাওয়াটা বোকামী নয় কি ? অতএব সাধারণ জনগণকে সত্য উপলব্ধি করে সহজ ও সঠিক পথ অবলম্বনের দা'ওয়াত দেয়াই হলো দা'য়ী ইলাল্লাহর কাজ। এটিকে যদি কেউ "বল প্রয়োগ" বলে তাহলে আমরা বলবো তিনি হয়ত "বল প্রয়োগ" শব্দের অর্থ বুঝতে পারেননি অথবা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে তিনি বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেন। কারণ ইসলামের পয়গামের সাথে এই দাবী সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইসলামের যেহেতু অন্যকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা রয়েছে সেহেতু তার পয়গাম প্রচার ও প্রসারে কৌশল বা শক্তি প্রয়োগের কোনো প্রয়োজন নেই। অথচ আমরা বিশ্বব্যাপী দেখে আসছি যেসব মতাদর্শ অন্যকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার ক্ষমতা রাখে না তার অনুসারীরা সুযোগ পেলেই বিরোধী মতালম্বীদের উপর আক্রমণ করে বসে। কিন্তু ইসলাম এমন এক গভীর ঈমান ও ইয়াক্বীনের সাথে মানুষের নিকট উপস্থিত হয় তখন ইসলামের যুক্তি তর্ক ও বাস্তাবতার সাথে সামঞ্জস্যের কারণে ইসলামের পয়গামকে অবাস্তব বা সেকেলের বলে পরাজিত করা সম্বোধিত ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাই ইসলামের পয়গাম প্রচার ও প্রসারে জোর জবরদস্তির কোন প্রয়োজন নেই। ইসলামের ঊষালগ্ন হতে আজ পর্যন্ত শক্তি প্রয়োগের কোনো ঘটনা ঘটেনি এবং আগামীতেও ঘটবে না, এটি আমরা বুকে হাত রেখে বলতে পারি। কোরআন এই সম্পর্কে আরো স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে :

{لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ۝ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}

দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই। ভ্রান্ত মত ও পথ থেকে সঠিক মত ও পথকে ছাঁটাই করে আলাদা করে দেয়া হয়েছে। এখন যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর উপর ঈমান আনে, সে এমন একটি মজবুত অবলম্বন আঁকড়ে ধরে, যা কখনো ছিন্ন হয় না। আর আল্লাহ সব কিছু জানেন ও শোনেন। যারা ঈমান আনে আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ও সহায়। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন। আর যারা কুফুরীর পথ অবলম্বন করে তাদের সাহায্যকারী ও সহায় হচ্ছে তাগুত। সে তাদেরকে আলোর মধ্য হতে অন্ধকারের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। এরা আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা থাকবে চিরকালের জন্য[৯]।

অন্যত্র আরো বলা হয়েছে :

{إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ۝ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلاً وَأَغْلالاً وَسَعِيراً ۝ إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً ۝ عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً}

আমি তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি। এরপর হয় সে শোকর গোযার হবে, না হয় সে কুফরের পথ অনুসরণকারী হবে। কাফেরদের জন্য শিকল বেড়ি এবং জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি। আর জান্নাতে নেককার লোকেরা পানপাত্র থেকে এমন শরাব পান করবে যাতে কর্পূর পানি সংমিশ্রিত থাকবে। এটি হবে একটি বহমান ঝর্ণা আল্লাহর বান্দারা যার পানির সাথে শরাব মিশিয়ে পান করবে এবং যেখানেই ইচ্ছা সহজেই তার শাখা-প্রশাখা বের করে নিবে[১০]।

সুরাতুল কাহাফে একথাটিকে এভাবে বলা হয়েছে :

{وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقاً}

(পরিষ্কার বলে দাও, এ হচ্ছে সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। এখন যে চায় মেনে নিক এবং যে চায় অস্বীকার করুক। আমি (অস্বীকারকারী) যালেমদের জন্য একটি আগুন তৈরী করে রেখেছি, যার শিখাগুলো তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলেছে। সেখানে তারা পানি চাইলে এমন পানি দিয়ে তাদেরকে আপ্যায়ন করা হবে, যা হবে তেলের তলানির মতো এবং যা তাদের চেহারা দগ্ধ করে দিবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং কি জঘন্য আবাস)[১১]।

উল্লেখিত আয়াতে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ হতে হক্ব বা সত্য চলে এসেছে। এটি খুবই স্পষ্ট ও পরিষ্কার। অতএব যার ইচ্ছা সে গ্রহণ করবে যার ইচ্ছা সে গ্রহণ করবে না। এখানে মানা না মানার বিষয়টি সম্পূর্ণ তার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে গ্রহণ ও বর্জনের চরম পরিণতিও বলে দেয়া হয়েছে। যেন কেউ এসম্পর্কে ফায়সালা নেয়ার আগে ভেবে দেখতে পারে। কোন্ পরিণতি সে গ্রহণ করবে তাও বিবেচনা করে দেখতে পারে। দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজটি ইসলামের স্বভাবের মধ্যে রয়েছে। তার অনুসারীদের কাজই হলো অন্যদের ইসলামের দা'ওয়ার দেয়া ইসলামের ছায়াতলে একত্রিত হওয়ার জন্য Presser Create করা নয়। কারণ যেখানে দা'ওয়াত ও তাবলীগের কথা বলা হয়েছে সেখানে জোর যবরদস্তি চলতে পারে না। ঝগড়া ফাসাদ, হিংসা বিদ্বেষ ও জোর যবরদস্তি কর্মকান্ড পরিচালনা করা ইসলাম ও মুসলমানদের স্বভাব বিরোধী। কারণ ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো আল্লাহ মানুষকে অপারগ হিসাবে সৃষ্টি করেন নি। বরং তাকে মুক্তচিন্তা ও বাকস্বাধীনতা দিয়ে ভাল-মন্দ বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা দিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও লা-পরওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে সবাইকে তাঁর আনুগত্য করতে বাধ্য করতে পারতেন। তাঁর অবাধ্য হওয়ার কারো কোনো সুযোগ থাকতো না। নাফরমান হওয়া বা অন্যকে উস্কে দেয়া তো দূর কী বাত, লেজগুটে তার সামনে মাথা নত করে বসে থাকতে হতো। কিন্তু তিনি তা করেন নি, ছেড়ে দিয়েছেন হিন্দুদের গো-মাতার মত মহাব্যস্ত সড়কের চৌরাহে। বিপরীতে দুর্ঘটনায় কবলিত তাদের জীবন তরীকে সঠিক পথে তুলে আনার পদ্ধতি বাতলিয়ে দেয়ার জন্য পাঠিয়েছেন অসংখ্য নাবী রাসূল। যিনি লাব্বাইক বলে নাবী রাসুলগণের দা'ওয়াতে সারা দিয়ে তাদের কাফেলায় যুক্ত হবেন তিনিই মূলত স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহার করতে পেরেছেন। যে স্বাধীনতা তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তি নিশ্চিত করে। অতএব স্বাধীনতার অপব্যবহার করলে দুনিয়া ও আখেরাতে পরাজিত হতেই হবে। একারণেই এখানে "জোর যবরদস্তির" পন্থা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরপরও কেউ যদি ইসলামের জন্য শক্তি প্রয়োগের রাস্তা অবলম্বন করে তাহলে সে অবশ্যই সীমা লঙ্ঘনকারী হবে। এসম্পর্কে কোরআন আরো বিস্তারিত বলতে গিয়ে বলেছে :

{وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون}

যদি তোমার রবের ইচ্ছা হতো যে, যমীনে সবাই তাঁর আনুগত্য করবে এবং মু'মেন হবে তাহলে সকল জগৎবাসী ঈমান নিয়ে আসতো। তবে তুমি কি মু'মিন হওয়ার জন্য লোকদের উপর যবরদস্তি করবে ? আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ ঈমান আনতে পারে না। আর আল্লাহর রীতি হচ্ছে যারা বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না তিনি তাদের উপর কুলষতা চাপিয়ে দেন[১২]।

অন্যত্র বলা হয়েছে : {وَمَا أَكْثَرُ النَّاس وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ} (তুমি যতই চাওনা কেন অধিকাংশ লোক তা মানবে না)[১৩]। মহান আল্লাহ এসম্পর্কে তাঁর নীতি আরো স্পষ্ট করে এভাবে বলেছেন :

{وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}

যদি এটাই আল্লাহর ইচ্ছা হতো তাহলে তিনি তোমাদের সবাইকে একই উম্মাতে পরিণত করতেন। কিন্তু তিনি যাকে চান তাকে গোমরাহীর মধ্যে ঠেলে দেন এবং যাকে চান তাকে সরল সঠিক পথ দেখান। আর অবশ্যই তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে[১৪]।

একথাটিকে সুরাতুশ শুরাতে আরো একটু ঘুরিয়ে বলা হয়েছে :

{وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ}

আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে এদের সবাইকে এক উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত করে দিতেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর রহমাতের মধ্যে শামিল করেন। যালেমদের না আছে কোনো অভিভাবক না আছে কোনো সাহায্যকারী[১৫]।

রাসুলুল্লাহ (সা:) ছিলেন ইসলামের প্রবক্তা ও সবচেয়ে বড় দা'য়ী ইলাল্লাহ। তাই তাঁর সবচেয়ে বড় কামনা ও বাসনা ছিলো পৃথিবীতে আল্লাহর যত বান্দাহ রয়েছে সবাই যেন ইসলামের ছায়াতলে একত্রিত হয়। তবে আল্লাহ এই পৃথিবীকে এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, এখানে কথা ও কাজ, মতাদর্শ ও মতবাদের মধ্যে মতৈক্য ও মতবিরোধ অবশ্যই থাকবে। এখানের জনপদের রীতি-নীতি ও জীবনযাপনের পদ্ধতিও হবে ভিন্ন। আর তাই রাসুলের এই নেক ইচ্ছা পূরণ হবে না একথাটি আল্লাহ তাঁকে কোরআনে বলে দিয়েছেন। আপনি সবার মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে সকল মতাদর্শের উর্ধ্বে উঠে সবাইকে আল্লাহর দ্বীন, ইসলামের পতাকা তলে সমবেত করতে পারবেন না। আপনার দায়িত্ব হলো সত্যের প্রচার করা হিদায়াত আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সীরাতে মুস্তাকীমের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে উদ্দেশ্যহীণভাবে চৌরাস্তায় ছেড়ে দেন। এখানে সে জীবনের শেষ বেলা পর্যন্ত লাগামহীনভাবে চড়ে চষে ঘুরে বেড়িয়ে মহা এক চরম ও কঠিন পরিণতির জন্য আল্লাহর শাহী দরবারে উপস্থিত হবে।

ইসলাম মানা না মানার বিষয়টি এমন এক যুক্তি সম্মত বিষয় যা মুক্তচিন্তার পতাকাবাহী কেউ এটিকে সহজে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না। ইসলামের ফিক্হ ও আইনের দৃষ্টিতে কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। এ সম্পর্কে বিখ্যাত ইসলামী আইনবিদ আল্লামা ইবনু কোদামাহ হাম্বলী বলেছেন

"ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো যিম্মি বা রাষ্ট্রের বিধর্মী প্রজাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা জায়েয নেই। এর পরও যদি কোথাও কাউকে ইসলাম কবুলে বাধ্য করা হয় এবং কেউ বাধ্য হয়ে ইসলাম কবুল করে তাহলে তার ইসলাম কবুল শারী'য়াতে গ্রহণ যোগ্য নয়। হ্যাঁ অপারগতা বা জরুরী অবস্থা কাটিয়ে উঠার পরও যদি সে ইসলামে অবিচল থাকে এবং নিজেকে মুসলমান হিসাবে পরিচয় দেয় তাহলেই কেবলমাত্র তাকে মুসলমান হিসাবে গণ্য করা হবে। এর আগেই যদি সে মৃত্যু বরণ করে তাহলে শারী'য়াতের দৃষ্টিতে সে অমুসলিম। জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণের পর যদি সে মুরতাদ হয়ে যায় বা পুর্বের ধর্মে ফিরে যায় তাহলে মুরতাদ হওয়ার শাস্তি হিসাবে তাকে হত্যা করা যাবে না। এমন কি ইসলামে ফিরে আসার জন্য তাকে চাপও দেয়া যাবে না। এব্যাপারে ইমাম আহমাদ, ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেঈ (র.) ঐকাত্ম পোষণ করেছেন"।[১৬]

শারী'য়াতের উল্লেখিত বক্তব্য জানার পর ইসলাম ও মুসলমানকে অপবাদ দেয়ার কোনো সুযোগ আছে বলে কোনো বিবেকবান ব্যক্তি মনে করতে পারে না। এর পরও আমরা বলবো ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাসে যদি কোথাও কেউ প্রমাণ করতে পারে যে, অমুক দেশে ও অমুক সমাজে অমুক ব্যক্তিকে মুসলমানরা জোরপুর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে, যদিও এমন তথ্য ইসলামের চরম শত্রুরাও দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এরপরও যদি কেউ কোনো দিন দিতে পারে তাহলে কি এটিকে সনদ হিসাবে ধরে নিতে হবে ?

ধর্মীয় অত্যাচার ও ইসলাম :

ইতিহাসের পাতা উল্টালে যে কেউ দেখতে পাবে যে, ইসলামের আগমনের পূর্বে একধর্ম অন্য ধর্মের অনুসারীদেরকে সহ্য করতে পারতো না। ব্রাহ্মণরা বুদ্ধিষ্টদের উপর বুদ্ধিষ্টরা ব্রাহ্মণদের উপর, ইয়াহুদীরা খ্রীস্টানদের উপর আর খ্রীস্টানরা ইয়াহুদীদের উপর, এমনকি একই ধর্মের মধ্যকার একগোত্র অন্য গোত্রের উপর যুলুম অত্যাচার তো নিত্যদিনের বিষয় ছিলো। ইতিহাসের ছাত্ররা এটি খুব ভাল করেই জানে। কারণ ইতিহাসের পাতায় এসব নির্যাতন ও নিপীড়নের অসংখ্য ঘটনা লিপিবদ্ধ রয়েছে। অনুরূপভাবে তাওহীদবাদীদের উপরও মুশরিকরা বহু অত্যাচার চালিয়েছে। প্রতিনিয়ত দা'য়ী ইলাল্লাহ তাদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। কাউকে তো কখনো উত্তপ্ত মরু বালিতে শুইয়ে রাখা হয়েছে আবার কাউকে আগুনে ফেলে দেয়া হয়েছে। করাত দিয়ে কারো শরীরকে দু' টুকরো করে ফেলা হয়েছে আবার কাউকে উত্তপ্ত তেলের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তার পরও ইসলামের চরম শত্রুরাও ইসলামপন্থীদের হাতে কেউ নির্যাতিত হয়েছে এমন উদাহরণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী যে, রাসুলুল্লাহ (সা:) ও তাঁর সাহাবীদের সে দিনের ধৈর্য্য মানব ভূখন্ডে যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে সেই বিপ্লব মানব সমাজে Religions persecution বা ধর্মীয় যন্ত্রনার কবর রচনা করেছে। যে বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর Universal Declaration of Human Rights নামে একটি আইন প্রণয়নে বাধ্য হয়েছে। উক্ত আইনের ১৮, ১৯ ও ২০ নং ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি ইচ্ছামত ধর্ম কর্ম পালন করতে পারবে। এখানে ধর্ম পরিবর্তনের স্বাধীনতার কথাও বলা হয়েছে। প্রকাশ্যে তার ধর্ম অনুসরণের স্বাধীনতার কথাও উক্ত আইনে মেনে নেয়া হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, অন্যের সামনে নিজ ধর্মের তাবলীগও করতে পারবে এবং শান্তিপূর্ণ প্রচার মাধ্যমও তার ধর্ম প্রচারের জন্য ব্যবহার করতে পারবে বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু আজ তথাকথিত আধুনিক চিন্তা চেতনার পতাকাবাহীরা এটিকে

Secularism নাম দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ Secularism এর অর্থ Non-interference হলেও ইসলাম ও মুসলমানদের বেলায় সম্পূর্ণ উল্টো অর্থাৎ Anti Islam হিসাবে এটি ব্যবহার হয়ে আসছে। তাই ইসলাম ও মুসলমানরা ছাড়া বাকী সবাই জাতি সংঘের উপরোক্ত ধারার আলোকে সর্বত্র শতভাগ সুবিধা ভোগ করে ইসলামকে বদনাম করছে। আমরা করলেই জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ, কট্টরপন্থী, পুরুষের মুখে দাঁড়ি ও মাথায় টুপি, নারীর গায়ে বোরকা ও মুখে হিজাব থাকলে হরকত ও করকত নাম দিয়ে মুসলমানদের হাতেই মুসলমানকে মারার ষোলআনা প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। মূলত তারা Intellectual Starvation বা বুদ্ধিভিত্তিক অনাহারে ভুগছে তাই তারা সত্য উপলব্ধী করতে পারছে না। আমরা এখানে তাদেরকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতে চাই দা'য়ী ইলাল্লাহ Disadvantage অবস্থায় Advantage এর অন্বেষণে থাকে। তাই রাসুলুল্লাহ (সা:):" اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله " (মু'মেনের অন্তর্দৃষ্টি হতে বেঁচে থাকো, কারণ সে আল্লাহর নূর দিয়ে দেখে)[১৭] বলে এদেরকে সতর্ক করেছেন। ।

নিন্দুকদের সমালোচনা ও বাস্তবতা :

আল্ কোরআনের আলোকে ইসলামের বক্তব্য জানার পর আসুন নিন্দুকদের উপরোক্ত সমালোচনার বাস্তবতা কতটুকু তা অমুসলিমদের বক্তব্য হতে জানার চেষ্টা করি। বিখ্যাত ঐতিহাসিক (**Thomas Carlyel** 1795-1881) দা'ওয়াতে ইসলামীর বশীতকরণের শক্তি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন

"এটি বহুবার বলা হয়েছে যে, মোহাম্মাদ তাঁর ধর্ম তলোয়ারের মাধ্যমে প্রচার করেছেন। অবশ্যই তলোয়ার ! তবে তিনি তলোয়ার কোত্থেকে আনবেন ? প্রত্যেক নতুন চিন্তাধারা অবশ্যই সংখ্যালঘুদের হয়ে থাকে। শুরুতে এটি শুধুমাত্র একজনের মন মস্তিষ্ক হতেই বের হয়। সারা-পৃথিবীতে তার অনুসারী শুধু সে নিজেই। সকল মানুষের বিপরীতে সে একাই। এমতাবস্থায় সে যদি একটি তলোয়ারের মাধ্যমে তার আক্বীদাহ বিশ্বাস প্রচার করার চেষ্টা চালায় তাহলে তার কোনো লাভ হবে না।"

এবার তার ভাষায় পড়ুন :

Much has been said of Mahomet's propagation his religion by the sword. The sword indeed; but where will you get your sword. Every new opinion, at its starting, is precisely in a minority of one. In one man's head alone, there it dwells as yet. One man alone of the whole world believes it; there is one man against all men. That he take a sword, and try to propagate with that, will do little for him.[18].

এখানে উল্লেখিত ঐতিহাসিক রাসুলের যুগের কথা বলেছেন এর অর্থ এই নয় যে, রাসুলের ইন্তেকালের পর তাঁর অনুসারীরা ঠিকই তলোয়ারের মাধ্যমে তাঁর রেখে যাওয়া মিশন পরিচালনা করেছেন, বিষয়টি কিন্তু এমন নয়। ইতিহাসের পাতা উল্টালে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহর রাসুলের ইন্তেকালের পর আরব জগতের বাইরের জাতি গোষ্ঠির সাথে যুদ্ধ বেঁধে গেল। খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে এশিয়া হতে শুরু হয়ে আফ্রিকা পর্যন্ত অনেক বড় বিস্তৃত অঞ্চলে ইসলামের ঝান্ডা পত্‌পত্ করে উড়তে লাগলো। তবে ঐ সব দেশের অধিবাসীদেরকেও তাদের বাপ দাদার ধর্ম পরিবর্তনের জন্য কোনো চাপ দেয়া হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ মিশরের ইতিহাস দেখুন, ইসলামের দ্বিতীয় খালীফা হযরত ওমার (রাঃ) এর যুগে এ দেশটি স্বাধীন হয়েছে। Encyclopedia Britannica এসম্পর্কে উল্লেখ করেছে যে, মুসলমানরা ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে খুব দ্রুতগতিতে মিশর স্বাধীন করেছে। কিন্তু তারা সেখানে খুব কঠোর ভাবে Religious tolerance বা ধর্মীয় সহিষ্ণুতা অনুসরণ করেছে। তারা মিশরীদেরকে ইসলাম গ্রহণে কখনো বাধ্য করে নাই। এমনকি রাষ্ট্রীয়ভাবে একাজে কাউকে উৎসাহিতও করা হয়নি। আরব শাসকরা খ্রীষ্টনদের গির্জা না ভাঙ্গার প্রতিজ্ঞাও করলেন। বিষয়টিকে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে :

There was no attempt to force, or even to persuade, the Egyptians to convert to Islam. The Arabs even pledged to preserve the Christian Churches.[19].

অনুরূপভাবে প্রফেসর ডি. ডব্লিউ আরল্যান্ডও একথাটি স্বীকারা করে লিখেছেন যে, মুসলিম বিজয়ীরা মিশরীদের সাথে পরিপূর্ণ ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বজায় রেখেছেন। গণহারে মিশরীদের ইসলাম গ্রহণে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের পক্ষ হতে চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে বলে যে দাবী করা হয় এর পক্ষে কোনো দলিল পওয়া যায় না। তার ভাষায় পড়ুন তিনি লিখেছেন :

There is no evidence of their widespread apostasy to Islam being due to persecution or unjust pressure on the part of there new rulers.[20]

তিনি আরো লিখেছেন যে : These conversions were not due to persecutions.[21] মিশরীরা রাজনৈতিক বা সামরিক কোনো চাপে পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেনি।

উপরোক্ত বক্তব্য পড়ার পর পাঠকদের মাঝে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, মুসলিম শাসকদের পক্ষ হতে ইসলাম গ্রহণের জন্য যেহেতু কোনো চাপ ছিলো না তাহলে কি কারণে মিশরীরা দলে দলে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিল? উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর মিশর সম্পর্কীয় গবেষক Sir Arthur Keith এভাবে দিয়েছেন যে, মিশরের খ্রীষ্টানদেরকে তলোয়ারের মাধ্যমে পরাজিত করা হয়নি বরং কোরআনের মাধ্যমে তাদের অন্তর জয় করা হয়েছে। তার ভাষায় : The Egyptians were conquered not by the sword, but by the Koran.[22].

ইসলাম বনাম অন্যান্য ধর্ম :

ইসলামের বিরুদ্ধে সমালোচকদের আরেকটি অভিযোগ হলো যে, ইসলাম অন্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের সাথে বিদ্বেষমূলক আচরণ করে। ইসলাম ভিন্নধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে এবং তাদের ধর্মীয় গুরুদের সম্মান করে না। আমরা বলবো এসব অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ ইসলাম তাওহীদ বা একত্ববাদে বিশ্বাস করে। পবিত্র কোরআনে "শিরক" ও "মুশরিক" দের সমালোচনা করা হয়েছে। তাই ইসলামে "শির্‌ক" ও "মুশরিক" কে কখনো সহ্য করা হয় না এবং হবেও না। তাদের দুর্বলতাকে উল্লেখ করে আল কোরআনে সমালোচনা করা হয়েছে বলেই মাক্কার মুশরিকদের সাথে ইসলামের ভয়াণক সংঘর্ষ হয়েছে। কিন্তু এখানেও ইসলাম তার অনুসারীদেরকে দু'টি আদেশ দিয়ে তাদের সাথে জীবন চলার পথ বাতলিয়ে দিয়েছে।

(ক) মুশরিকদের "মা'বুদ" বা তাদের দেব দেবতা যাদের তারা উপাসনা করে সেগুলোকে গাল মন্দ করা যাবে না। অথচ এসব দেব দেবতাকে তাদের নিজেদের বানানো বলে ইসলাম দাবী করে এবং সেগুলোকে মিথ্যা বলেও আখ্যায়িত করে। তারপরও সেগুলোকে গালমন্দ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ তাদের দেবতাকে গালি দিলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে আল্লাহকে গালি দিতে শুরু করবে। এটি ইসলামে খুবই নিন্দনীয় কাজ। মুসলমানদের আচরণে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা ক্ষেপে গিয়ে যেন আল্লাহকে গাল মন্দ করার সুযোগ না পায়। তাই পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

{ وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }

(হে ইমানদারগণ! এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকে তোমরা তাদেরকে গালি দিয়ো না। কেননা এরা শিরক থেকে আরো খানিকটা অগ্রসর হয়ে অজ্ঞতাবশত যেন আল্লাহকে গালি দিয়ে না বসে। আমি তো এভাবে প্রত্যেক জনগোষ্ঠির জন্য তাদের কার্যক্রমকে সুশোভন করে দিয়েছি। তারপর তাদের ফিরে আসতে হবে তাদের রবের দিকে। তখন তিনি তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদেরকে জানিয়ে দিবেন)[২৩]।

(খ) মুসলমানদেরকে দ্বিতীয় আদেশটি এমন এক সময় দেয়া হয়েছে যখন বিরোধী শিবির হতে ইসলাম ও মুসলমানদের গাল-মন্দ, অভিসাপ ও ভর্ৎসনাসহ সর্বত্র ঠাট্টা বিদ্রুপ চলছিলো। এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবে মুসলমানদের মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে বলে তাদেরকে আদেশ দেয়া হলো যে, ইসলাম বিরোধীদের প্রত্যুত্তরে মুসলমানরা অনুরূপ আচরণ অবলম্বন করতে পারবে না। উত্তর দিতে হলে উত্তম পন্থা ও পদ্ধতিতে দিতে হবে। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কঠোর ও বিশ্রী ভাষা ব্যবহার হলেও তোমাদের ভাষা হবে নির্মল ও মধু মিশ্রিত। কোনো প্রকারের বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে সীমা অতিক্রম করা যেমন যাবে না, তেমনিভাবে সভ্যতার চাদরও কখনো নিজেদের শরীর হতে ফেলে দেয়া যাবে না। উত্তম পন্থায় বিরোধী শিবিরের মন জয়ের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। একটু ভেবে দেখবেন কি, আমাদের এযুগেও আমাদের দেশেও মুখে দাড়ি, মাথায় টুপি, গায়ে পাঞ্জাবী পরিহিতদেরকে রাজাকার, মৌলবাদী, গোঁড়া ও কট্টরপন্থী, জঙ্গিবাদসহ আরো কত ধরণের প্রকাশ্যে গাল মন্দ করা হচ্ছে। এরপরও তাদের মনের ঝাল মিটেনা বলে তাই কুকুরের মুখে দাড়ি ও মাথায় টুপি লাগিয়ে পোস্টার ছাপিয়েও এদেশের ইসলামপন্থীদেরকে অপমান করা হচ্ছে। তবে আশ্চর্যজনক হলেও সত্য ইসলামপন্থীরা কখনো সভ্যতার চাদর ফেলে Intellectual Starvation দের মত গালমন্দ করা তো দূর কী বাত, কোনো প্রতিক্রিয়াও দেখায়নি। কারণ কুকুরে কামড় দিলে যে কুকুরকে কামড় দিতে হয় না, তার বাস্ত ব নমুনা এদেশের ইসলামপন্থীরা যুগ যুগ ধরে পেশ করে যাচ্ছেন। আল্ কোরআনের এই আয়াতকে তারা

নিজেদের দা'ওয়াতী কাজের পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন। দা'য়ীদের দা'ওয়াতী মিশনের স্টাইল সম্পর্কে একটু ভেবে দেখবেন কি ? আল কোরআন বলেছে :

{وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ}

(হে নাবী সৎ কাজ আর অসৎ কাজ সমান নয়। তুমি অসৎ কাজকে সেই নেকী দ্বারা নিবৃত্ত করো যা সবচেয়ে ভালো। তাহলে দেখবে যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিলো সে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গিয়েছে। ধৈর্যশীল ছাড়া এ গুণ আর কারো ভাগ্যে জোটে না। অতি ভাগ্যবান ছাড়া এমর্যাদা আর কেউ লাভ করতে পারে না)[২৪]

যে ধর্ম ভিন্নমতাদর্শীদের বাতেল মা'বুদ ও দেব-দেবতাকে গাল-মন্দ করতে নিষেধ করে এবং দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজকে নিজেদের Mission & Vision হিসাবে গ্রহণ করে নীতি নৈতিকতার এক বিশেষ গুণাবলী অবলম্বনের মাধ্যমে পরিচালনার শিক্ষা দেয় সেই ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ শুধু আশ্চর্যজনক নয়, বরং হাস্যকরও বটে। তাই আমরা বলবো অমুসলিমদের অনুভূতিতে আঘাত হানার কথা ইসলামের আঙ্গিনায় কল্পনাও করা যায় না। হ্যাঁ মুসলমান পরিচয়ে ইসলামকে নিয়ে হাসি তামাশা করা এবং ইসলামের শত্রুদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হলে তা প্রতিহত করা সবার ঈমানী দায়িত্ব। বিষয়টি আরো পরিষ্কার করার জন্য এখানে আমি আহলে কিতাবদের সাথে ইসলামের নীতি পাঠকদের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজন মনে করছি।

আহলে কিতাব ও ইসলাম:

আল্ কোরআন মুশরিকদের ব্যাপারে যেমন আলোচনা করেছে তেমনিভাবে আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহুদ ও নাসারাদের ব্যাপারেও সেখানে আলোচনা হয়েছে শুধু তা নয়, বরং তাদেরকে সরাসরি সম্বোধনও করা হয়েছে। কারণ তাদের সাথে ইসলামের মৌলিক আক্বীদার বেশ কিছু মিল রয়েছে। আল্লাহ, রাসুল ও আখেরাতে তারা বিশ্বাস করে এবং তাদের কাছে আসমানী গ্রন্থ ছিলো। যদিও ঐ সব আসমানী গ্রন্থে বহু ধরণ ও রকমের পরিবর্তন, বিকৃতি ও সম্পাদনা ছাড়াও তাদের ধর্মীয় গুরুরা নিজেদের ইচ্ছেমত যত্রতত্র অপব্যাখ্যা করে ফেলেছে। এব্যাপারে ইসলামের নীতি হলো পৃথিবীতে যত নাবী-রাসুল এসেছেন তাঁদের সবার উপর ঈমান রাখা অত্যাবশ্যক। কোনো একজনকেও অস্বীকার করা যাবে না। করলে ঈমান থাকবে না বলে কঠিন ভাবে সতর্ক করা হয়েছে। এসম্পর্কে আল্ কোরআনে সু-স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে :

{آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ}

(রাসূল তার রবের পক্ষ হতে তার উপর যে হেদায়াত নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে। আর যে সব লোক ঐ রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারাও ঐ হিদায়াতকে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছে। তারা সবাই আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাদেরকে, তাঁর কিতাবসমুহকে ও তাঁর রাসূলদেরকে মানে এবং তাদের বক্তব্য হচ্ছে "আমরা আল্লাহর রাসূলদের একজনকে আর একজন থেকে আলাদা করি না") [২৫]।

অন্যত্র আরো বলা হয়েছে :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً (١٥٠) أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً (١٥١) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُوْلَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ (١٥٢)

(যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের সাথে কুফরী করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে আমরা কাউকে মানবো ও কাউকে মানবো না আর কুফর ও ঈমানের মাঝখানে একটি পথ বের করতে চায়, তারা সবাই আসলে কট্টর কাফের। আর এহেন কাফেরদের জন্য আমি এমন শাস্তি তৈরী করে রেখেছি, যা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবে। বিপরীত পক্ষে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদেরকে মেনে নেয় এবং তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না, তাদেরকে আমি অবশ্যি পুরস্কার দান করবো)[২৬]।

এখানেই শেষ নয়, ইসলাম ধর্মে আল্লাহর সকল নাবী-রাসূলদের উপর ঈমান রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাই নাবী-রাসূলদের দা'ওয়াত ও তাবলীগ, প্রচার ও প্রসারে তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং এপথে নির্যাতন ও নিপীড়নসহ তাঁদের ত্যাগ ও কোরবানী, আল্লাহর বান্দাদের সাথে তাদের মমতা ও ভালবাসার কথাও বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। শত্রুদের পক্ষ হতে যেসব অপবাদ দেয়া হয়েছে এবং মিত্রদের আঙ্গিনায় তাদেরকে নিয়ে অতিরঞ্জনের যেসব ঘটনা ঘটেছে তার সঠিক সমাধান পেশ করে তাঁদের চরিত্রকে নিষ্কলুষ হিসাবে তুলে ধরা

হয়েছে। পরিশেষে তাদের তাকওয়া ও পরহেযগারীর সাক্ষ্য দিয়ে ঈমানদারদেরকে তাদের বাতলানো পথকে সঠিক মনে করে তার অনুসরণ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। আল্ কোরআনে বলা হয়েছে :

{أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ}

(হে মুহাম্মাদ ! তারাই আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত প্রাপ্ত ছিলো, তাদের পথে তুমি চল)[২৭]।

অনুরূপভাবে ইসলাম সকল আসমানী গ্রন্থকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করেছে শুধু তাই নয়, বরং ঐ সব কিতাবের উপর ঈমান আনাকে আক্বীদার অংশ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই অহী, রেসালাত ও আসমানী গ্রন্থসমুহকে যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীকার না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের সঠিক অনুসারী কেউ হতে পারবে না। এ সম্পর্কে কোরআনে পরিষ্কার বলা হয়েছে:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيدا }

(হে ঈমানদারগণ! ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি,আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর যে কিতাব নাযিল করেছেন তার প্রতি এবং পূর্বে তিনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাবর্গ, তাঁর কিতাবসমুহ, তাঁর রাসূলগণ ও পরকালের প্রতি কুফরী করলো সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূর চলে গেল)[২৮]।

আল্ কোরআনের বক্তব্য হলো পৃথিবীতে যত নাবী-রাসূল এসেছেন এবং যত কিতাব নাযিল হয়েছে সব কিছুরই তাওহীদের পয়গাম ছিলো। সকল নাবী-রাসূল তাওহীদের দা'ওয়াত দিয়ে শিরকের বিরোধীতা করেছেন। মূলত একারণেই ইসলাম আহলে কিতাবদেরকে "তাওহীদ" তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে একান্নভুক্ত বিষয়। অতএব আস আমরা সবাই মিলে এটিকে আঁকড়ে ধরি এবং তাওহীদের দাবী পূরণে যেন আমরা প্রস্তুত থাকি। আল কোরআন বলেছে:

{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}

(বলো হে আহলে কিতাব! এসো এমন একটি কথার দিকে, যা আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে একই ধরণের। তা হচ্ছে : আল্লাহ ছাড়া কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করবো না। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবো না। আর আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে নিজের রব হিসাবে গ্রহণ করবে না। যদি তারা এ দা'ওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে পরিষ্কার বলে দাও: তোমরা সাক্ষী থাকো আমরা অবশ্যি মুসলিম)[২৯]।

অতএব অতীতের সকল অহী ও রেসালাতের দায়িত্ব যেখানে শেষ সেখানে ইসলামের শুরু। তাই ইসলামকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। মানব জাতির হিদায়াত ও দিক নির্দেশনার শেষ সমাধানই হলো ইসলাম। যেহেতু কোরআন আহলে কিতাবদের আসমানী গ্রন্থ সমুহের পরিবর্তন ও বিকৃতিসাধনসহ অপব্যাখ্যা উল্লেখ করে হক্ব ও বাতেলকে পৃথক করে দেখিয়ে দিয়ে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের পরিষ্কার এবং অকৃত্রিম ধারণা পেশ করেছে। তাদের দুনিয়া প্রীতির যেমন সমালোচনা করা হয়েছে তেমনিভাবে তাদের নেককার ও তাক্বওয়াহ পরহেযগার লোকদের প্রশংসাও করা হয়েছে। সেহেতু এখন আর অন্য কোনো ধর্ম কর্মের পেছনে শান্তির অন্বেষায় দৌড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। এরপরও ঈমানদারদেরকে এসব বিষয়ে কথা বলার সময় উত্তম পন্থা অবলম্বনের হুকুম দিয়ে কোরআন বলেছে :

{ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ }

(উত্তম পদ্ধতি ছাড়া আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করো না। তবে তাদের মধ্যে যারা যালেম তাদেরকে বলো, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের প্রতি যা পাঠানো হয়েছে তার প্রতি এবং তোমাদের প্রতি যা পাঠানো হয়েছিলো তার প্রতিও, আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ একজনই এবং আমরা তাঁরই আদেশ পালনকারী)[৩০]

পরিশেষে ইসলাম ও মুসলামনদের সমালোচকদেরকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করতে চাই এর চেয়েও বেশী বিবেচক, চিন্তাশীল ও গম্ভীর এবং যুক্তিযুক্ত কোনো রীতিনীতি সম্পর্কে মানব সমাজ ও সভ্যতা কল্পনা করতে পারে ? এমন এক মহা সত্য ও বাস্তবতাকে সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে নিন্দুকরা স্বীকার করতে না পারলেও ইসলামের দা'ওয়াতী শক্তির সামনে সকল শক্তিই পরাজিত এটি একবাক্যে পৃথিবীর অসংখ্য মনীষীরা আজ

স্বীকার করে ইসলামের ছায়া তলে আশ্রয় নিচ্ছেন। আমার উপরোক্ত বক্তব্য প্রমাণের জন্য এখানে কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

ইসলামের ছায়ায় এক ঝাঁক অমুসলিম বুদ্ধিজীবী:

Garry Miller নামক একজন আমেরিকার খ্রীষ্টান সেখানকার একটি কলেজে বাইবেলের শিক্ষক ছিলেন। ১৯৭৮ সালে তার মনে কোরআন পড়ে দেখার আগ্রহ সৃষ্টি হলো যে, দেখি আল কোরআনে কি লেখা হয়েছে? তাই তিনি কোরআন ও বাইবেলকে তুলনামূলকভাবে অধ্যয়ন শুরু করলেন। পরিণাম যা দাঁড়ালো তা হলো, কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব তার কাছে দিন দিন পরিষ্কার হতে লাগলো এবং পরিশেষে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে ফেললেন। নাম পরিবর্তন করে আব্দুল আহাদ ওমর রাখলেন। বর্তমানে তিনি তার নও মুসলিম স্ত্রীর সাথে কানাডাতে রয়েছেন। আল কোরআন অধ্যয়ন করে তিনি এত বেশী প্রভাবিত হয়েছেন যে, নিজেকে Convert বা "ধর্ম পরিবর্তন কারী" পরিচয় দিতে তিনি নারায। এর পরিবর্তে নিজেকে তিনি Revert বা "ফিরে আসা" বলতে পছন্দ করেন। তার বক্তব্য হলো আমি ইসলাম কবুল করি নাই বরং আমি আমার জন্মগত ধর্মে ফিরে এসেছি। তিনি বলেছেন : I haven't converted to Islam but merely reverted to my birthright religion.[31]

তিনি যে কথাটি বলেছেন সেটিই কোরআন ও সুন্নাহর কথা। আল্ কোরাআনে এসম্পর্কে পরিষ্কার বলা হয়েছে :

{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ}

(নিজের চেহারা এ দ্বীনের দিকে স্থির নিবদ্ধ করে দাও। আল্লাহ মানুষকে যে প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন তার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও, আল্লাহর তৈরী সৃষ্টি কাঠামো পরিবর্তন করা যেতে পারে না। এটিই পুরোপুরি সঠিক ও যথার্থ দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না)[৩২]

এ কথাটিকে আল্লাহর রাসূল (সা:) এভাবে বলেছেন :

كل مولود يولد على الفطرة، فالأبوان يهودانه وينصرانه ويمجسانه

(প্রত্যেক নবজাতক প্রকৃতির উপর জন্ম নিয়েছে, তার মা-বাবা তাকে ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান ও অগ্নিপুজক বানায়)[৩৩]।

এ হিসাবে প্রত্যেক মানুষই জন্মসূত্রে মুসলমান। আল্লাহর কারখানায় সে মুসলিম ও মু'মিন সৃষ্টি হয়েই দুনিয়াতে আসে। এখানে এসে জাতি গোষ্ঠির কৃষ্টি কালচার ও পরিবেশের প্রভাব তার জীবন তরীকে বিপরীত ঘাটে নিয়ে ভিড়িয়ে দেয়। সেখানে গিয়ে সে কোথা থেকে এসেছে এবং এখানে কেন তার আগমন ঘটেছে সবই ভুলে যায়। তাই আমরা এখানে বলতে চাই দা'ওয়াতে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের কাজ অন্যকে জোরপূর্বক ইসলামে নিয়ে আসা নয়, বরং প্রকৃতি বিরোধী কৃত্রিম চাদরে যাদের শরীর ঢেকে আছে অত্যন্ত বিনিয়ের সাথে তা সরিয়ে নেয়াই দা'য়ী ইলাল্লাহর কাজ। আমরা যদি এটি করতে পারি তাহলে যে ব্যক্তি মানব সমাজে বাস করবে তাকেই মু'মিন বলা হবে। গত একশ বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। এমন সব লোক যারা ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজেদের গায়ের কৃত্রিম চাদর সরিয়ে নিয়ে ইসলামের ছায়ায় নিজেদের জীবন তরী ভিড়িয়েছেন তাদের সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে যাবে। এখানে এমন কিছু মনীষীর নাম ও তাদের ইসলাম গ্রহণের তারিখসহ পাঠকদের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজন মনে করছি।

1.	Prof. Haroon Mustafa Leon	England	1822
2.	Mohammad Alexander Russel	U.S.A.	1890
3.	Dr. Nishikanta Chattopadhya	Hyderabad	1904
4.	Lord Headly al-Farooq	England	1913
5.	Dr. William Burchell B. Pickard	England	1922
6.	Sir Abdullah Archibald Hamilton	England	1923
7.	Mohammad Leopold Asad	Austria	1926
8.	Mohammad Marmaduke Pickhall	England	1935
9.	Dr. Abdul Karim Germanus	Hungary	1940
10.	Dr. AliMohammad Mori	Japan	1947
11.	Dr. Ali Selman Benoist	France	1953
12.	Dr. R. L. Melleme	Holland	1955

13. Ibrahim Khalil Phillips	Egypt	1960
14. Prof. A.H.B. Hewett	U.S.A.	1966
15. Umar Bongo (President, Gabon)	Gabon	1973
16. Dr. Reger Garoudy	France	1982
17. Moosa Fondi	Tanzania	1986
18. Abdullah Adiar	Madras	1987

কামাল পাশার সেনা অফিসার ও ইসলাম:

কামাল আতা তুর্কের ইসমাত আনুনু (১৮৮৪-১৯৭৩) নামক একজন সেনা অফিসার ছিলো। কামাল পাশার মৃত্যুর (১০ নভেম্বর ১৯৩৮) পর সে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলো। কামাল পাশা তরস্কের উন্নয়নের জন্য তুর্কীদেরকে যে ছয় দফার স্বপ্ন দেখিয়ে ছিলো তার অন্যমত দফা ছিলো Secularism। সে যেমন তার পুরো সময় Secularism নিয়ে বেঁচে ছিলো ঠিক তেমনিভাবে তার অনুসারী ইসমাত আনুনুও এব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলো। ইসলাম, মুসলমান ও দা'ওয়াতে ইসলাম তার রাজত্বে একটি অকল্পনীয় বিষয় ছিলো। কিন্তু বাস্তবতা হলো অকল্পনীয় নির্যাতন ও নিপীড়নের পরও তুরস্কের মাটি হতে ইসলামের মুলোৎপাটন সম্ভব হয়নি। ইসলাম সেখানে আজও পুরো শক্তি সামর্থ নিয়ে আলো ছড়িয়ে দিয়ে তুর্কীদেরকে ইসলামের পতাকা তলে একত্রিত করে চলছে। পরিশেষে ইসমাত আনুনু তার শেষ নির্বাচনের সময় ইসলামের বিরুদ্ধে ঘোষিত তার সরকারে অনেক নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলো। কারণ এটি ছাড়া সে সাধারণ জনগণের সমর্থন আদায়ে সন্দিহান ছিলো। তার মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসলো তখন সে তার অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে বলেছে :

إنني لا أكاد أصدق ما أرى، لقد بذلنا كل ما نستطي لانتزاع الإسلام من نقوس الأتراك وغرس مبادئ الحضارة الغربية مكانه، فإذا بنا نفاجأ بما لم نكن نتوقعه، فقد غرسنا العلمانية فأثمرت الإسلام

(আমি যা দেখছি তা বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হচ্ছে। তুর্কিদের অন্তর হতে ইসলামের শিকড় তুলে ফেলে সেখানে পশ্চিমা সভ্যতা ও কৃষ্টি কালচারের বীজ বোপন করার আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য সেখানে পরিণাম আমাদের আগ্রহের সম্পূর্ণ বিপরীত হয়েছে। আমরা লাগিয়েছি Secularism এর চারা কিন্তু ফল ধরেছে ইসলামের)[৩৪]

ইসলামের শিকড় মানব প্রকৃতির অত্যন্ত গভীরে স্থান করে নিয়েছে। তাই ইসলামের খাদেম ও দা'য়ীরা কখনো শক্তি প্রয়োগের পথ অবলম্বন করতে পারে না। বরং তারা তাদের নিজেদের সকল শক্তি দা'ওয়াত ও তাবলীগের পেছনে ব্যায় করে। কারণ ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই *Violent Activism* অবলম্বন করে কখনো কেউ জয়ের মুখ দেখেনি। যার প্রমাণ ১৯৮৭-১৯৮৮ সালে পাঞ্জাবের শিখরা *Violent Activism* এর মাধ্যমে খালিস্তান নামে তাদের জন্য পৃথক একটি স্বাধীন ভুমি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল কিন্তু সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তারা শুধু পরাজিত হয়নি বর্তমান পাঞ্জাবের শিখদের অবস্থানের দিকে তাকালে মনে হয়, যেন কেউ আর এখন এমন স্বপ্ন দেখার ইচ্ছাও পোষণ করে না। অথচ অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধি ১৯৪৭ এর পুর্বে সাধারণ নাগরিকদের মাঝে বৃটিশ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টির জন্য *Non-Violent Activism* এর পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি *Public Agitation* এর মাধ্যমে *Presser Create* করে বৃটিশ সরকারকে চাপের মধ্যে রাখতে পেরেছেন এবং তিনি জয়ীও হয়েছেন। শেষ ও তৃতীয় পন্থাটি হলো *Political Activism* যা নির্বাচনের মাধ্যমে পরিবর্তন সম্ভব। এই যুদ্ধে কখনো সরকারী দলের পতন ঘটে আবার কখনো বিরোধী দলের উত্থান ঘটে। কিন্তু এগুলোর কোনটিকেই আমরা *Islamic Activism* বলতে পারছি না। কারণ কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে *Da'wah Activism* হলো সবোত্তম পন্থা। এই কাজের জন্য এখন বিশ্বব্যাপী বহু *Da'wah Center* স্থাপন হয়েছে। এই পথে কোন দরাদরি নেই, নেই মন কষাকষি। আনন্দঘন ও সৌহার্দ পরিবেশে এই কাজ চলে। এখানে অন্যকে "বাধ্য' বা "প্রভাবিত" করার পরিবর্তে তার মন জয়ের টার্গেট নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়। তার কাছে কিছু পাওয়ার আশায় নয়, বরং তাকে মুক্তির পথ দেখানোর জন্যই তার আঙ্গিনায় দা'য়ীদের আগমন ঘটে। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু, প্রতিপক্ষ ও স্বপক্ষ সৃষ্টির পরিবর্তে সহানুভুতিশীল, উপদেশ ও পরামর্শদাত এবং শুভাকাঙ্খি হিসেবে দা'য়ীর আবির্ভাব ঘটে। পরস্পরের সাথে বিষণ্নতা ও বিমুখতার পরিবর্তে প্রেম ও ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, আদর ও স্নেহের জন্ম হয় সমাজের আম তলা ও জাম তলাসহ কোটিপতিদের অট্টলিকায় ও হীন দরিদ্রদের কুঠিরে। পরিবেশ হয়ে উঠে সর্বত্র একটি কাঙ্খিত ও জান্নাতি পরিবেশ। অতএব সকল পরিবেশের চাবিকাঠি আমাদের হাতে। শুধু শুধু পরিবেশ নষ্ঠ হয়ে গেছে বলে চেচাঁমেচি করলে কোন

লাভ হবে না। তাই একজন পশ্চিমা মনীষী বলেছেন *You can meet friends every where but you cannot meet enemies everywhere – you have to make them*। কত চমৎকার ও মুল্যবান কথা। মানবীয় সমাজ ও চরিত্রের বৈশিষ্টই প্রত্যেক মানুষকে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ ও সর্বত্র স্বাধীনভাবে বিচরণ করার সুযোগ করে দেয়। মানব সমাজের এমন পরিবেশই হলো স্বাভাবিক, এর ব্যতিক্রম হওয়াটাই হলো অস্বাভাবিক। এমন কাঙ্খিত পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া বা হলেও তা হাত ছাড়া হওয়ার মূল কারণ হলো ধৈর্য। আমরা ধৈর্য ধারণ করতে পারিনা বলেই আমাদের সর্বত্র আজ বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। অথচ ধৈর্য্য হলো একটি বড় ইবাদত। যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে ততদিন তাকে ধৈর্য্য ধারণ করতে বলা হয়েছে। ধৈর্য্য ধারণ করতে পারলেই পবিত্র কোরআনের ঘোষিত: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (আল্লাহ ধৈর্য ধারণকারীদের সাথে আছেন)[৩৫]

এর যথার্থতা আমাদের সমাজে প্রমাণ হবে। ধৈর্য্য ধারণ করে মানুষ আখেরাতে উঁচু মর্যাদা লাভ করে জান্নাত পাবে শুধু তা নয়, এই দুনিয়াতেও ধৈর্য্য ধারণকারীরা উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌছেছে। যার জলন্ত প্রমাণ দেখতে হলে জাপানের দিকে তাকান সুর্য্যের চেয়েও পরিস্কার দেখতে পাবেন তাদের অবস্থান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার হাতে মার খাওয়া জাপান *Science & Technology* এর রাস্তা অবলম্বন করার কারণে কোথায় আজ তাদের অবস্থান ? বর্তমান বিশ্বের কেউ জাপানের সমকক্ষ হওয়া তো দূরের কথা স্বপ্নেও তাদের সমমান হওয়ার কথা ভাবতে পারে না। ১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার কাছে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিল আজকের জাপান। ১৯৪৫ সালে আমেরিকান সৈন্যরা জাপানে ঢুকে পড়ে এবং ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সেখানে বীরদর্পে অবস্থান করে। অতপর আমেরিকান সেনা জেনারেল *Douglas Mac Arthur* এর ইচ্ছা মত জাপানের সংবিধান রচনা করা হলো। ৩ নভেম্বর ১৯৪৬ সালে জাপানের সংসদে উক্ত সংবিধান পাশ করানো হলো। যেমন করা হয়েছে কারযাই ও আলাভীর মাধ্যমে আফগানিস্তান ও ইরাকে। এটি আমেরিকার অতি পুরাতন অভ্যাস। উক্ত সংবিধানে জবরদস্তি তাদেরকে দিয়ে বলানো হলো *Land, See and air forces, as well as other war potential, will never be maintained*। এমন সংবিধান রচনায় যে কোন দেশ ও জাতির অপমৃত্যু ঘটে যা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই অপমৃত্যুকে জাপানীরা মেনে নিয়ে যুদ্ধের রাস্তা বন্ধ পেয়ে *Science & Technology* এর উন্মুক্ত রাস্তায় যুদ্ধে বিধ্বস্ত ভাঙ্গা চুরা ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত শক্তি সামর্থ নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে জীবনের গাড়ী দৌড়াতে লাগলো। মাত্র ৪০ বছর পর পৃথিবীর *Super Power* দেরকে ডিঙ্গিয়ে উন্নতির চুড়ায় পৌছে গেল। আর বিশ্বমোড়ল আমেরিকা মাথায় হাত রেখে উপরের দিকে তাকিয়ে চুড়ান্ত সীমায় তাদের দৃষ্টি পৌছার আগে ঘাড়ে ব্যাথা শুরু হওয়ার কারণে দৃষ্টি নীচু করে ফেলতে আজ বাধ্য হচ্ছে। তাই তাদেরই ইতিহাসবিদদের একজন *Ezra F. Vogel - Japan As Number One* নামে বই লিখে তাদের উন্নতিকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন। উক্ত বইতে তিনি নির্দিধায় লিখে ফেলেছেন *Defeated in World War II (1945), Japan emerged from the ruins of war as one of the major economic power in the world*।[৩৬]

জাপানীরা বিশ্বকে শিখিয়ে দিল সংকটময় বর্তমানকে ধৈর্যের সাথে আলিঙ্গন করতে পারলে ভবিষ্যতের সুন্দরতম জীবন শুরু করা সম্ভব। অন্যের প্রভাবে নিজের অস্তিত্ব হারানোর পরিবর্তে তারা এখন পরিবর্তনের প্রভুত্বে পরিণত হলো। বহিরাগত আক্রমণে যেখানে অন্যান্য রাষ্ট্র ধ্বংস হতে বাধ্য হয়েছে সেখানে জাপান শক্তি লাভ করেছে। অতএব যারা বর্তমানকে অস্বীকার করবে তারা আগামী দিনের সুন্দর ভবিষ্যৎ হতে বঞ্চিত হবে। পরিশেষে মনীষীদের ভাষায় বলবো *Starve the problems, feed the opportunities*। সংকটের সময় আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সকল সুযোগকে কাজে লাগাতে পারলে আজকের চেয়ে আগামী কাল অবশ্যই ভাল হবে। এটি সে দিন সম্ভব যে দিন আমরা এক বাক্যে সবাই বলতে পারবো *I never lose, winning team is my team* সে দিন পৃথিবী জুড়ে সর্বত্র আমাদের জয়ের বিউগল বেজে উঠবে। P.K. Hitti এর ভাষায় পৃথিবীর মানুষ একবাক্যে বলে উঠবে "The religion of the Muslim had conquered where their arms had failed"[37](37) অর্থাৎ মুসলমানদের ধর্ম ইসলাম ঐখানেই জয়ী হয় যেখানে তাদের অস্ত্র পরাজিত হয়েছে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই সত্যটি উপলব্ধি করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

তথ্যসূত্র :

১ সুরাতুন নাহাল : ৯০
২ সুরাতুল আ'রাফ : ২৯
৩ সুরাতুল আনআ'ম : ১৫২
4 সুরাতুন্ নিসা : ১৩৫
5 সুরাতুন্ নিসা : ৫৮
6 সুরাতুল মায়েদাহ : ৮
7 সুরাতুল হাদীদ : ২৫
8 সুরাতুন্ নাহাল : ১২৫
9 সুরাতুল বাক্বারাহ : ২৫৬-২৫৭
10 সুরাতুদ দাহার : ৩-৬
11 সুরাতুল কাহাফ : ২৯
12 সুরাতু ইউনুছ : ৯৯-১০০
13 সুরাতু ইউসুফ: ১০৩
14 সুরাতুন নাহাল : ৯৩
15 সুরাতুশ শুরা : ৮
16 ইবনু কুদামাহ, আল্ মুগনী ৮/৪৪
17 (বুখারী ও মুসলিম)
18 Thomas Carlyle, ***The Hero As Prophet, P.2, London.***
19 ***Encyclopedia Britannica***, Vol. 6 p.487-488.
20 ***The Preaching of Islam. P. 104.***
21 ***The Preaching of Islam. P. 110.***
22 ***A new theory of Human Evolution,*** **London, 1950, P. 303**.
23 সুরাতুল আনআ'ম : ১০৮
24 সুরা হা-মীম আস্ সাজদাহ : ৩৪-৩৫
25 সুরাতুল বাক্বারাহ: ২৮৫
26 সুরাতুন নিসা : ১৫০-১৫২
27 সুরাতুল আন'আম-৯০
28 সুরাতুন নিসা : ১৩৬
29 সুরাতু আলে ইমরান : ৬৪
30 সুরাতুল আ'নকাবুত : ৪৬
31 Muslim Journal Chicago, June, 21, 1985.
32 সনুরাতুর রূম : ৩০
33 বোখারী ও মুসলিম
34 আল্ ওয়া'য়ুল ইসলামী, কুয়েত, যুল ক্বা'য়াদাহ ১৪০৮ হি. পৃষ্ঠা ২৭
35 সূরা বাকারাহ : ১৫৩
36 *Ezra F. Vogel - Japan As Number One*
37 P.K. Hitti. ***History of the Arabs*** P.488.

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 56-61)

দা'ওয়াতী কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ভূমিকা

মুহাম্মদ তরিকুল ইসলাম*

ভূমিকাঃ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি এ পৃথিবীতে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীর সবকিছু মানুষের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত রেখেছেন, তাঁর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল তার সৃষ্টিকুল এই মানবজাতির কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে, আর মানুষ একমাত্র আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে নিজেকে নিয়োজিত করবে। তার বিধানাবলীর অন্যতম একটি বিধান তথা ইবাদত হল মানবতাকে আল্লাহর পথে ডাকা। আর এই কাজের জন্য যুগে যুগে অনেক নবী-রাসূল প্রেরণ করেন। হযরত আদম (আ:) থেকে মুহাম্মদ (স:) পর্যন্ত সকলেই এ কথাটিই বলেছিলেন: (أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে নবীদের সবার প্রকৃতি ও মাধ্যম একরকম ছিলনা। পরিবেশ ও পরিস্থিতির আলোকে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে দাওয়াতের কাজ করেছিরেন। বিজ্ঞানের এ যুগে দুনিয়ায় বিভিন্ন উপকরণ যেভাবে মানুষকে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট করে রেখেছে, সেখান থেকে তাদেরকে অদৃশ্য ও অপেক্ষমান একটি জগতের পুরস্কারের কথা বলে দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনা সহজ কাজ নয়। তাই তথ্য প্রযুক্তির যুগে দাওয়াতের কাজ করতে হলে আধুনিক মিডিয়াগুলো ব্যবহার করতে হবে।

দাওয়াতের আভিধানিক অর্থঃ

পবিত্র কুরআনে দাওয়াহ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছেঃ

১. মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহর নিকট আবেদন অর্থে, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

(هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة)

অর্থাৎ সেখানেই যাকারিয়া তাঁর পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করলেন। বললেন, " ও আমার পালনকর্তা, তোমার নিকট থেকে আমাকে পূত-পবিত্র সন্তান দান কর। (সূরা আল-ইমরান: ৩৮)

২. মাটির মধ্য থেকে বের হওয়ার আহবান অর্থে যেমন আল্লাহ বলেনঃ "যখন তিনি মৃত্তিকা থেকে উঠার জন্য তোমাদের আহবান করবেন তখান তোমরা উঠে আসবে"। (সূরা .....)

৩. ইবাদত অর্থে যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي)

অর্থাৎ, আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পালন কর্তার ইবাদত করে। (সূরা আল-আনা'ম: ৫২)

৪. আল্লাহর দিকে ডাকা অর্থে, আল্লাহ বলেনঃ

(ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين)

অর্থাৎ, আর সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা অধিক ভাল কথা আর কার হতে পারে ? যে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং বলে আমি মুসলমান। (সূরা হা-মীম আস্‌সিজদাহ–৩৩)

এই ভাবে পবিত্র কুরআনে বিভিন্নভাবে দা'ওয়াহ শব্দটি ৭৬ বার ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন: চাওয়া, বিপদ থেকে মুক্তির প্রার্থনা, ইবাদত, আনুগত্য, কল্যাণ প্রত্যাশা, সাহায্য ইত্যাদি।

দা'ওয়াতের পারিভাষিক অর্থঃ

১. পারিভাষিক অর্থে আরবী দা'ওয়াহ শব্দের অর্থ হচ্ছে- কাউকে কোন কিছুর দিকে আহবান করা। পরিভাষায় (আরবীতে) দা'ওয়াহ হচ্ছে

---

* ৬ষ্ঠ সেমিষ্টার, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

(تبليغ الإسلام للناس وتعليمه إياه وتطبيقه في واقع الحياة.)

অর্থাৎ মানুষের কাছে ইসলামকে পৌঁছে দেয়া, ইসলামকে তাদের মাঝে শিক্ষা দেওয়া ও বাস্তব জীবনে ইসলামকে বাস্তবায়নের নামই ইসলামী দা'ওয়াহ।[১]

আলেমদের মতে দা'ওয়াতঃ সামর্থ অনুযায়ী দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের দিকে সাধারণ মানুষকে জ্ঞানীদের পক্ষ থেকে আহবান করা।

– আল্লাহ ও তার রাসূল প্রণীত জীবন ব্যবস্থাকে পরির্পূণভাবে বাস্তবায়নের জন্য আহবান করা।

– ইসলামী আন্দোলন ও তার বাস্তবায়ন।

দাওয়াতের গুরুত্বঃ

ইসলামে দা'ওয়াহ এর গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নিম্নে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হলোঃ

১. দা'ওয়াত আল্লাহর মহত্ব বর্ণনার মাধ্যম, আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ (يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر)

অর্থাৎ, হে আবৃত শয্যা গ্রহণকারী, ওঠ, সাবধান কর, আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। (সূরা আল মুদ্দাসসির: ১-৩)

২. দাওয়াতের ভাষা আম্বিয়া-এ-কেরামের ভাষা, কুরআনে কারীমে এসেছেঃ

(وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم)

অর্থাৎ, আমি সব পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করে প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিস্কার বোঝাতে পারে। (সূরা ইব্রাহিম : ৪)

৩. দা'ওয়াত মুসলমানদের পরিচয়, আল্লাহ বলেনঃ

(ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين)

অর্থাৎ, আর সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা অধিক ভাল কথা আর কার হতে পারে ? যে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং বলে আমি মুসলমান। (সূরা হা-মীম আস্‌সিজদাহ–৩৩)

৪. উম্মতের মধ্যে দা'ওয়াতের দল থাকা আবশ্যক, আল কুরআনে এসেছেঃ

(ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون)

অর্থাৎ তোমদের মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যই থাকতে হবে, যারা মানব জাতিকে কল্যাণের পথে আহবান জানাবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজের বাধা দেবে, তারাই সফলকাম। (সূরা আল ইমরান–১০৪)

৫. দা'ওয়াত মুসলিম জাতি সত্তার প্রতীক, আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেনঃ

(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)

অর্থাৎ, তোমাদেরকে উত্তম জাতি হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমাদের কাজ হল, মানুষদেরকে সৎপথে আহবান করবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। (সূরা আলে ইমরান-১১০)

৬. আল্লাহ দা'ওয়াতের এ কাজকে ঈমানের বৈশিষ্ট্য এবং নামাজ মত ইবাদতের পাশাপাশি এর উপরও গুরুত্বারোপ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة).

অর্থাৎ, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের মহায়ক তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত দেয়। (সূরা আত্ তাওবাহ-৭১)

৭. যারা দা'ওয়াতী কাজ করে আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন, পবিত্র কুরআনে এসেছে,

(يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك هم الصالحون).

অর্থাৎ, যারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং ভালো কাজের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে তারাই সৎকর্মশীল। (সূরা আল-ইমরান–১১৪)

কুরআনের মত হাদীসের ও দা'ওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীমঃ

নিম্নে বিশদ আলোচনা উল্লেখ করছিঃ

১. একটি আয়াত জানা থাকলেও অন্যকে জানান, এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছেঃ

(عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية)

অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স:) বলেছেন, আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত জানলেও অপরের কাছে পৌঁছে দাও।[২]

২. দ্বীন তথা দা'ওয়াতকে সহজ করতে বলা হয়েছে, রাসূল (স:) বলেন

(عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا)

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (স:) বলেছেন, তোমরা (দ্বীনের দাওয়াত) সহজ করো, কঠিন করো না। সুসংবাদ দাও, বিতশ্রদ্ধ করো না[৩]।

৩। অনাগতদের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব, যেমন হাদীসে এসেছেঃ

(قال النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب)

অর্থাৎ, মহানবী (স:) বলেছেন, আজকে যারা উপস্থিত তারা অনুপস্থিতদের কাছে (আমারা বাণী) পৌঁছে দাও।[৪]

এভাবে ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য রাসূল (স:) সমকালীন সময়ের সকল প্রকার মিডিয়া ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন।

রাসূল (স:) এর যুগে দা'ওয়াত পৌঁছানোর মাধ্যমঃ

রাসূল (স:) এর যুগে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়নি। তবে মানুষের নিকট সংবাদ পৌঁছানোর বিভিন্ন মাধ্যম ছিল, রাসূল (স:) সে মাধ্যমগুলো গ্রহণ করে মানুষের নিকট পৌঁছাবার ব্যবস্থা করেন, নিম্নে তা উল্লেখ করা হলঃ

প্রথমত ঃ গোপন দাওয়াতঃ

ওহী প্রাপ্ত হয়ে রাসূল (স:) ব্যক্তিগত ভাবে গোপনে দা'ওয়াতের কাজ শুরু করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রথমে তার স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা:) কে, তার চাচাত ভাই হযরত আলী (রা) কে ও স্বীয় গোলাম যায়েদ বিন হারেসা (রা:) কে দা'ওয়াত দেন।

গোপনে দা'ওয়াত গ্রহণকারী পুরুষের সংখ্যা ছিল ৩১জন এবং নারীর সংখ্যা ১২ জন।

দ্বিতীয়ত ঃ প্রকাশ্য দাওয়াতঃ

আল্লাহ বলেন (وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون) অর্থাৎ আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন। এবং আপনার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হোন। যদি তারা আপনার অবাধ্যতা করে, তবে বলে দিন, তোমরা যা কর, তা থেকে আমি মুক্ত। (সূরা আশ-শোআরা ২১৪-২১৬)

এখানে চারটি বিষয়ের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে,

১. নিজের আত্মীয়স্বজনকে প্রথমে দা'ওয়াত দেয়া
২. যারা দা'ওয়াত গ্রহণ করে তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করা
৩. যারা দা'ওয়াত গ্রহণ করে না তাদের সাথে সম্পর্ক না রাখার ঘোষণা
৪. যত বিরোধ আসুক না কেন দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যাওয়া

প্রকাশ্য দাওয়াতের ক্ষেত্রে তখনকার মিডিয়াগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহারঃ

১. ৪০ জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে খাওয়ার দা'ওয়াত দেয়া এবং খাওয়া শেষে ইসলামের দা'ওয়াত দেয়া।
২. সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে জাতির প্রতি আহবান
৩. ক্ষুদ্র দলের সাথে আলোচনা
৪. কোন কোন সময় এক বা দু'ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে দা'ওয়াত দেয়া
৫. সভা-সমাবেশ
৬. হজ্বের মৌসুমে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য দা'ওয়াত
৭. বিতর্ক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দা'ওয়াত দেয়া
৮. বহিঃর্বিশ্বে চিঠির মাধ্যমে দা'ওয়াত পৌঁছানো ছিল সবচেয়ে বড় মিডিয়া

৯. কোন কোন সাহাবীকে অন্য জাতির ভাষা শিক্ষা দিয়ে তাকে তাদের নিকট দা'ওয়াতের জন্য প্রেরণ করা।
১০. সম্রাটের পদমর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে চিঠি লিখা হত।
১১. বিভিন্ন চিত্র ও রেখার মাধ্যমে মানুষের অন্তরকে আকৃষ্ট করতেন।

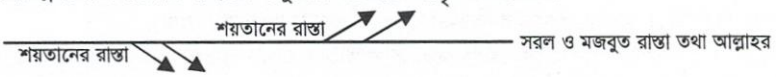

ক) মানুষ সৃষ্টির রহস্য বুঝাবার জন্য কতবার আমরা কুরআনের কথা বলবো তার চেয়ে অধিক সহজ হবে চিত্রের মাধ্যমে বুঝানো।

আল্লাহ বলেন, (فلينظر الإنسان مم خلق، خلق من ماء دافق)

অর্থাৎ মানুষের দেখা উচিত কি বস্তু থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে স্খলিত পানি থেকে। (সূরা ত্বারিক ৫-৬)

(وإنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى) অর্থাৎঃ নিশ্চয়ই তিনি স্খলিত এক বিন্দু বীর্য থেকে পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আন্‌নাজম : ৪৫-৪৬)

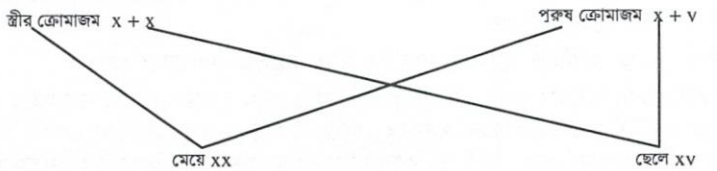

সন্তান যদি মায়ের কাছ থেকে x এবং পিতার কাছ থেকে x ক্রোমসোম নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তাহলে সন্তান হবে xx অর্থাৎ মেয়ে, আর যদি মায়ের কাছ থেকে x ক্রোমসোম এবং পিতার কাছ থেকে y ক্রোমসোম প্রাপ্ত হয় তাহলে সন্তান হবে xy ছেলে।

এভাবে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্য রাসূল (স:) সমকালীন সময়ের সকল প্রকার মিডিয়া ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। [৫]

বর্তমান যুগে দা'ওয়াত পৌছানোর মাধ্যমঃ

রাসূল (স:) এর যুগে দা'ওয়াতের জন্য যে সকল মাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে বর্তমানেও প্রথমত তা ব্যবহার করা হয় তবে তার পাশাপাশি বর্তমান যে সকল মাধ্যম রয়েছে তারও সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে। যার কতিপয় নিম্নে আলোচিত হলোঃ

বর্তমান যুগকে প্রযুক্তির যুগ তথা মিডিয়ার যুগ বলা হয়ে থাকে। যাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

প্রথমত: প্রিন্ট মিডিয়া

দ্বিতীয়ত: ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া [৬]

প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে দাওয়াতী কাজঃ

১. সংবাদ পত্রঃ সংবাদ পত্রের মাধ্যমে বর্তমান যুগের সাথে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর মিল রেখে বিভিন্ন রচনা প্রকাশ করা যা ইসলামী আক্বীদা বিশ্বাসে গঠিত হবে। দ্বীন প্রচারের জন্য এটি একটি বিরাট অস্ত্র।
২. পত্রিকায় ছবির ব্যবহারঃ পত্রিকায় যেকোন সংবাদের সাথে ছবি ব্যবহার করলে মানুষ সহজে ঘটনাটি অনুধাবন করতে পারে এবং অনুভূতিতে বিষয়টি স্থায়ী হয়ে যায়, একটি ছবি এক হাজার কথার চেয়েও বেশী মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে।
৩. সাপ্তাহিক ও মাসিক ম্যাগাজিনঃ সাপ্তাহিক ও মাসিক ম্যাগাজিনের মাধ্যমে বর্তমান মুসলমানদের দূরাবস্থা কেন? তার থেকে প্রতিকার কিভাবে সম্ভব ইত্যাদি বিষয় গুরুত্ব সহকারে লেখা যেতে পারে।
৪. জার্নালঃ জার্নালে ইসলাম সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে।
৫. সাহিত্যঃ সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় লেখা যেতে পারে। কেননা একটি দেশের জ্ঞানভান্ডার হল সাহিত্যিক সমাজ।
৬. কবিতাঃ রাসূল (স:) এর যুগের মত বর্তমানেও কবিতার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসার করা যায়।

৭. স্বীকারঃ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলো স্টীকার ছাপিয়ে প্রচার করা যেতে পারে।
৮. পোষ্টারিংঃ ইসলামের বিভিন্ন দিবস তথা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত পোষ্টার ছাপিয়ে দাওয়াতী কাজ করা যায়।
৯. সাধারণ জ্ঞানের আসরঃ আমরা ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন ছাপিয়ে বিনা মূল্যে বিতরণ বড় অনুষ্ঠানের পরবর্তীতে মাধ্যমে পুরস্কার বিতরণ করে দা'ওয়াতী কাজ করা যায়।
১০. রচনা প্রতিযোগিতাঃ বিভিন্ন উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের থেকে বিভিন্ন ধরণের রচনা নেয়া যেতে পারে। যার মাধ্যমে ব্যাপক দাওয়াতী কাজ করা যায়। [৭]

ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে দা'ওয়াতী কাজঃ

বর্তমান মুসলমানদের হাতে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার কোন উল্লেখযোগ্য কর্তৃত্ব নেই, তবুও আমরা যেভাবে এটিকে ইসলামী দাওয়াতী কাজে ব্যবহার করতে পারি, তা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

১. **টেলিফোনঃ** আধুনিকতার এই যুগে ঘরে বসে টেলিফোনের মাধ্যমে অন্যের সাথে কুশল বিনিময় করে তাকে ইসলাম সম্পর্কে সহজে বুঝানো যায়।

২. **মোবাইলঃ** টেলিফোন এর চাইতে সহজ ভাবে মোবাইল দিয়ে যে কোন অবস্থায় যে কোন জায়গা হতে অন্যকে ইসলাম সম্পর্কে বুঝানো যায়। আরও সুন্দর বিষয় হল আগেকার দিনের চিঠির পরিবর্তে মোবাইলে মেসেজ পাঠিয়েও দাওয়াতী কাজ করা যায়।

৩. **রেডিওঃ** রেডিওর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ইসলাম সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

৪. **টেলিভিশনঃ** টেলিভিশন মানুষকে বেশী ব্যস্ত ও আকর্ষণ করে রাখে। কেননা তাতে এক সাথে শুনা ও দেখা যায় এবং অতি দ্রুত পৃথিবীর যেকোন ঘটনা মানুষের সামনে উপস্থাপন করা যায়। যা রেডিও সংবাদ পত্রের মাধ্যমে সম্ভব নয়। টেলিভিশনের ভাল মন্দ নির্ভর করে পরিচালকের ওপর। টিভিতে শিক্ষণীয় অনুষ্ঠান দেখানো যায়, হজ্জের অনুষ্ঠান দেখে সমগ্র বিশ্বের মুসলমান এক আক্বীদা ও দ্বীনে বিশ্বাসী করে তুলে। টিভিতে খবর পড়ার সময় নারীদের ক্ষেত্রে হিজাব পরতে পারে। ইসলামিক বিভিন্ন বিষয়ে টকশো হতে পারে। এই ভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কিত কার্যাবলী ইসলাম সম্মতভাবে দেখানো যেতে পারে।

৫. **সিনেমাঃ** সিনেমার পর্দায় আল্লাহর সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে ছবি, মানুষের হৃদপিন্ডের ছবি, গ্রহ-নক্ষত্রের ছবি, সমুদ্রের নিচে প্রবালের ছবি ইত্যাদি দেখানো। যার ফলে মানুষ আল্লাহর তাওহীদের উপর বিশ্বাস সুদৃঢ় হবে।

সিনেমা যায়েজ হওয়ার কতিপয় শর্তাবলী:

ক) অশ্লীলতা মুক্ত হতে হবে।
খ) দ্বীন ও বৈষয়িক দায়িত্ব পালনের প্রতি যেন উপেক্ষা প্রদর্শিত না হয়।
গ) সিনেমা দর্শকগণ সর্ব প্রকার গায়েরে মোহরেম নারীর সাথে সংমিশ্রণ পরিহার করে চলবে।

৬. **অভিনয়ঃ** অভিনয় শিল্প প্রথমে গ্রীক সমাজে প্রচলিত হয়। অভিনয় শিল্পে আলেমগণ ভিন্ন-ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

ক) পূর্ব যুগের আলেমগণ অভিনয়কে নিষেধ করেছেন।
খ) কোন কোন মুহাদ্দিস চূড়ান্তভাবে হারাম বলেছেন। কেননা এখানে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয়।
গ) একদল উহাকে শর্ত সাপেক্ষে জায়েজ বলেছেন। যেমনঃ আম্বিয়া ও সাহাবীদের ছবি সেজে অভিনয় করা যাবে না।
ঘ) কেউ কেউ মাকরূহ বলেছেন।
ঙ) অভিনয় কালে ইসলামী আক্বীদার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।
চ) অমুসলমানদের কোন প্রতীক বা সঙ্কেত ব্যবহার না করা।
ছ) এটি দা'ওয়াতী মূলক তথা কল্যাণ মূলক হতে হবে।

এসব শর্ত পূরণ করে আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দানে মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য অভিনয়কে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭. **বিজ্ঞাপনঃ** বিজ্ঞাপন দেয়া হয় কোন জিনিসের চাহিদা বাড়ার জন্য সে ক্ষেত্রে নারীকে পণ্যের মত ব্যবহার না করে ইসলাম সম্মত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দা'ওয়াতী কর্মকান্ড পরিচালনা করা।

৮. **কম্পিউটারঃ** কম্পিউটার দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি উপাদান। যার মাধ্যমে ইসলামিক অনেকগুলো বিষয় সংরক্ষণ করা যায়। আর অতি সহজে তা থেকে আমরা আমাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারি।

৯. ইন্টারনেটঃ ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা ইসলামকে অপরিচিত লোকের কাছেও পৌঁছে দিতে পারি। এমন কি ই-মেইল এর মাধ্যমে এক সাথে অনেকের কাছে মেসেজ দেয়া যেতে পারে। উল্লেখ, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি পৃথিবীকে একটি গ্রামে পরিণত করে দিয়েছে।

১০. অডিও সিডিঃ অডিও সিডির মাধ্যমে ইসলামের অনেকগুলো বিষয় এক সাথে সংরক্ষণ করা ও প্রচার করা যায়।

১১. ভিসিডিঃ ভিসিডির মাধ্যমেও অন্যকে দা'ওয়াতী কাজ করা যায়, যা দ্বারা একসাথে শুনা, ও দেখা যায়।

তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে ইসলামী দা'ওয়াত সম্প্রসারণের মৌলিক বৈশিষ্ট্যঃ

১. তথ্য সংগ্রহ ও প্রচারের ক্ষেত্রে সত্যবাদিতা, আমানতদারীতা, দায়িত্বজ্ঞান ও ন্যায় বিচারের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।
২. বস্তুবাদী চিন্তা চেতনা ও ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিত্যাগ করতে হবে।
৩. সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় কুপ্রবৃত্তির কামনার অনুসারী হওয়া যাবে না।
৪. তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহের সময় যাচাই বাছাই করবে হবে।

ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারে আমাদের করণীয়ঃ

১. নিজস্ব তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা।
২. বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা তৈরী করা।
৩. নিজস্ব ঐতিহ্য ও আদর্শ নিয়ে নতুন টিভি স্টেশন গড়ে তোলা।
৪. ধনী দেশগুলো গরিব দেশের তথ্য প্রযুক্তি গঠনে সহায়তা করা।
৫. সব ইসলামী সংস্থা গুলোকে ইন্টারনেটের অধীনে নিয়ে আসা।
৬. মুসলিম দেশের জন্য একটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা।
৭. বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রচারের একটি কেন্দ্রীয় টিভি স্টেশন গড়ে তোলা।
৮. মুসলিম দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগে মুসলিমদেরকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা দিয়ে ইসলামী দা'ওয়াতের পথে উহা ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেয়া।
৯. সংবাদপত্র, টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও অন্যান্য মিডিয়ায় বিজ্ঞআলেমদের মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহের সঠিক বাণী তুলে ধরা।
১০. মুসলমানদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ই-মেইল ও ইন্টারনেট ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
১১. ইসলামী আদর্শ ও পবিত্র কুরআনের কাহিনী ভিত্তিক ছবি তৈরী করে তা প্রচার করা।
১২. শিশুদের উপযোগী অনুষ্ঠানমালা তৈরী করে তাদেরকে ইসলামী আক্বীদার প্রতি আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা করা।
১৩. ও.আই.সি. কে শক্তিশালী করা।
১৪. মুসলিম উম্মাহকে অন্যের দেয়া তথ্যের উপর নির্ভর না করা। নিজস্ব শক্তিশালী ও মানসম্পন্ন মিডিয়া নেটওয়ার্ক গঠন করা। [৮]

উপসংহারঃ

অবশেষে আমরা বলতে পারি যে, আধুনিকতার এই যুগে জনশক্তির একটি বিরাট অংশকে প্রশিক্ষণ দিয়ে মিডিয়ায় ব্যবহারের উপযোগী করে ইসলামী আক্বীদা ও আদর্শ ভিত্তিক সংস্কৃতি ও সাহিত্য তৈরীর মাধ্যমে যদি আমরা বিশ্বব্যাপী দা'ওয়াতী কাজের আঞ্জাম দিতে পারি তবেই মুসলিম উম্মাহর হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। আল্লাহ আমাদের এ মহান কাজে সর্বাত্মকভাবে অংশগ্রহণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

তথ্যসূত্রঃ

---

১ ড. আবুল ফাতহ আল বায়ানূনী, আল মাদখালু ইলা ইলমিদ দাওয়াদ (বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০১) পৃ. ১৬
২ সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল আহাদিসিল আম্বিয়া, হাদীস নং ৩২০২
৩ সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং ৬৭
৪ সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং-১০১
৫. প্রফেসর ড. আবুল কামাল পাটওয়ারী, প্রাগুক্ত, অক্টোবর ০৬, পৃঃ ১০-১১
৬. ডা. জাকির নায়েক, মিডিয়া এন্ড ইসলাম, (ঢাকাঃ পিস পাবলিকেশন, ২০০৯) পৃঃ ১৭
৭. কর্মপদ্ধতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির, প্রকাশকাল, ২০০৯, পৃঃ ৮
৮. প্রফেসর ড. আবুল কালাম পাঠওয়ারী, প্রাগুক্ত, ডিসেম্বর ০৬, পৃঃ ১২-১৫

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 62-74)

ইসলামী বীমার শার'ঈ ভিত্তি

বি. এম. মফিজুর রহমান আল্-আযহারী*

ভূমিকা

কয়েকশত বছরের উপনিবেশবাদী শাসনের দাসত্ববৃত্তি করে মুসলিম উম্মাহ কিছুটা হলেও তাঁর স্বকীয়তা ভুলে গিয়েছিল। স্বল্প সংখ্যক যারা ইসলামের সামগ্রীক জীবন ব্যবস্থা বিশেষ করে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পক্ষে জীবনপণ আন্দোলন-সংগ্রাম করছিলেন, তারাও সংকর প্রজাতির বুদ্ধিজীবী, অর্থনীতিবিদ আর সমাজবিজ্ঞানীদের বাগাড়ম্বরতা ও তাদের বিদেশী প্রভুদের অপপ্রচারের কারণে বার বার হয়েছিলেন বাধাগ্রস্ত। অবশেষে, আল্লাহ তা'আলা ঐ সব নিষ্ঠাবান মুসলিম গবেষকদেরকে ইসলামী অর্থব্যবস্থার আধুনিক রূপরেখা নির্ণয়ে তাওফীক দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের বিজয় যাত্রার সূচনা করে দিলেন। ব্যাংকিং সেক্টরে ইসলামী ব্যাংক এর মহাসাফল্যের পথ ধরে শুরু হল সুদী বীমা ব্যবস্থার অভিশাপ থেকে মানবতাকে মুক্তি দেয়ার সংগ্রাম। তাও আজ সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। সুদী বীমাব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে গোটা বিশ্বের ভাগ্যবঞ্চিত মানুষের জন্য ইসলামী বীমার চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই। এটি এখন আর শুধু তথ্য নয়। তথ্যের সীমা ছাড়িয়ে প্রয়োগিক সত্যের রূপ ধারণ করেছে। সেই সত্য এখন মুসলিম মনের গভীর প্রশান্তি ও আত্মবিশ্বাসের স্তরে উপনীত হয়েছে। কারণ বিশ্বকে এগিয়ে নেয়ার জন্য, মানবতাকে প্রকৃত সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার ছোঁয়া দেয়ার জন্য জীবনব্যবস্থা হিসেবে যে শক্তি, যোগ্যতা ও উপযোগিতা প্রয়োজন তা একমাত্র স্রষ্টা প্রদত্ত ইসলামেই আছে।

বীমার ইসলামায়ন বিংশ শতাব্দির এক মহা সৃষ্টি, মহা বিপ্লব। কিন্তু এখনো এর অনেক দিক রয়েছে যেগুলো নিয়ে গবেষকদের আলোচনা-পর্যালোচনার তীব্র প্রয়োজন রয়েছে। ইসলামের শরীয়ত এত মহান যে এর গভীরে অবগাহন করলে কাউকেই পাথেয় সংগ্রহ করতে গিয়ে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয় না। ইসলামী বীমা ব্যবস্থার শার'ঈ ভিত্তি এ পর্যায়েরই একটি বিষয়। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা তিনটি পয়েন্টের অবতারণা করে এ বিষয়টির উপর সবিস্তারে আলোকপাত করব। সেগুলো হচ্ছে:

এক. ইসলামী বীমার আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ; দুই. ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে পারস্পরিক সহযোগিতাভিত্তিক বীমা; তিন. ইসলামী বীমা ব্যবস্থার শার'ঈ ভিত্তি।

নিম্নে এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

১. ইসলামী বীমার সংজ্ঞা:

ইসলামী বীমা ব্যবস্থার জন্য তিনটি পরিভাষার বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

এক. ইসলামী বীমা (التأمين الإسلامي) দুই. তাকাফুল বীমা (التأمين التكافلي) তিন. তা'আউন বীমা (التأمين التعاوني)।

শব্দগত পার্থক্য থাকলেও মর্মগতভাবে এগুলো এক ও সমার্থবোধক। এ পর্যায়ে আমরা প্রথমে এগুলোর আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ তুলে ধরব।

প্রথমত: আভিধানিক অর্থ:

ক. তা'মীন শব্দের শাব্দিক অর্থ (التأمين لغة) : এটি باب تفعيل এর ক্রিয়ামূল বা মাছদার। এর অর্থ হচ্ছে: নিরাপত্তা নিশ্চিত/বিধান করা (هو تحقيق الأمن والاطمئنان)। বাংলায় এর পারিভাষিক অনুবাদ হচ্ছে বীমা।

খ. التكافل **(তাকাফুল) এর শাব্দিক অর্থ:**

তাকাফুল শব্দটি 'কাফাল' থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এটি باب تفاعل এর মাছদার। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে: تضامن অর্থাৎ পরস্পরের জামিন হওয়া; যৌথভাবে দায়বদ্ধ হওয়া; সংহত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি[১]।

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ, (CENURC), IIUC.

গ. التعاون (তা'আউন) এর আভিধানিক অর্থ: এটিও বারে تفاعل এর মাছদার। এর অর্থ: পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা করা।

দ্বিতীয়ত: পারিভাষিক অর্থ:

আলামা ইউসূফ বিন আব্দুলাহ আস-সুবাইলী এ প্রসঙ্গে বলেন: "ইসলামী তাকাফুল বীমা হচ্ছে, এমন একটি যৌথ চুক্তি, যা কিছু বিপত্তির দরুন সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি বা লোকসান কাটিয়ে উঠার নিমিত্তে সমজাতীয় ঝুঁকির আশংকাকারী একদল লোক নিজেদের মধ্যে নিষ্পন্ন করে থাকেন। এর পদ্ধতি হচ্ছে: অংশগ্রহণকারী দলের সকল সদস্য চাঁদা প্রদান করে একটি স্বতন্ত্র আর্থিক দায়-দায়িত্ব সম্পন্ন বীমা/ক্ষতিপূরণ তহবিল গড়ে তোলেন। অতঃপর দলের কেউ যদি তাকাফুল সনদে বর্ণিত কোন ক্ষতির সম্মুখীন হন, তাহলে উক্ত ক্ষতিপূরণ তহবিল থেকে তার ক্ষতিপূরণ বা তাকে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়। এই তহবিল পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে বীমা সনদধারীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গঠিত একটি সংস্থা কিংবা স্বতন্ত্র কোন কোম্পানী এবং বীমা কার্যক্রম পরিচালনার বিপরীতে পারিশ্রমিক/বিনিময় গ্রহণ করে। তদ্রূপ সে তহবিলের পুঁজি বিনিয়োগ করেও ওয়াকিল বা মুদারিব হিসেবে লাভের নির্ধারিত অংশ বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করে থাকে"[2]।

২. ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে সমবায় বা পারস্পরিক সহযোগিতাভিত্তিক বীমা

২.১ গবেষক ও বিভিন্ন ফিকহ কাউন্সিল, সংস্থা ও একাডেমির অভিমত এবং সিদ্ধান্ত:

এ প্রসঙ্গে ড. আলী মহী উদ্দীন আল্-কুররা দাগী বলেন: "সমকালীন শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ ও (আন্তর্জাতিক মানসম্মন্ন, স্বীকৃত) ফিকহী সংস্থা, একাডেমী ও গবেষণা কেন্দ্রগুলো নীতিগতভাবে সুদ ও অন্যান্য শরীয়ত নিষিদ্ধ পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনা না করার শর্তে সমবায় বা সহযোগিতাভিত্তিক বীমা ব্যবস্থার শরীয়তসিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছে[3]"।

২.২ সমবায় বীমা শরীয়ত অনুমোদিত হওয়ার প্রমাণাদি

এক. ইসলামের আলোকে তাকাফুল বীমা ব্যবস্থার মূল ধারণা বিশেষণ: النظرة الأساسية في التأمين

এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, সমবায়, তা'আউন বা তাকাফুল বীমার ধারণা মূলত: তিনটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। সেগুলো হচ্ছে:

ক. নিরাপত্তা বা নিশ্চয়তা লাভের আকাংখা (طلب الأمن)

খ. ঝুঁকি ও বিপর্যয় এড়াতে সামষ্টিক সাহায্য-সহযোগিতা ও পারস্পরিক দায়বদ্ধতা (التعاون على رده المخاطر)

গ. আগাম সতর্কতা (الاحتياط للمستقبل)

এই তিনটি উপাদানই কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা সুপ্রমাণিত। বরং এই তিনটি মৌলিক বিষয় ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় যেভাবে গুরুত্ব পেয়েছে, পৃথিবীর কোন ধর্ম, সভ্যতা ও আইন-বিজ্ঞানে তার নজীর পাওয়া সম্ভব নয়।

নিম্নে এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত প্রমাণাদি তুলে ধরা হলো:

প্রথমত: নিরাপত্তা বা নিশ্চয়তা লাভের আকাংখা বিষয়ক প্রমাণাদি:

১. নিরাপত্তা মানুষের একটি স্বভাবজাত দাবী। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তাঁর নিরাপত্তারূপী নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইরশাদ করছেন: "যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি থেকে দিয়েছেন নিরাপত্তা" – (সূরা কুরাইশ:৪)।

২. হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর প্রার্থনা পবিত্র মক্কা নগরীর জন্য। "যখন ইব্রাহীম বললেন, হে প্রতিপালক, এ শহরকে শান্তিময় করে দিন" –(আল্-বাকারাহ: ১২৬। ইব্রাহীম, আয়াত: ৩৫)।

৩. মহানবী (স.) ও বিভিন্ন হাদীসের মধ্যে নিরাপত্তা বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। "যে ব্যক্তি সুস্থ দেহ ও মন নিয়ে নিরাপদে আপন আবাসনে রাত্রি যাপন করতে পারে, তার কাছে দিনের প্রয়োজন মেটানোর মত খাদ্য-পানীয় রয়েছে, পুরো দুনিয়া যেন তার কাছে ধরা দিয়েছে"[4]।

দ্বিতীয়ত: ঝুঁকি ও বিপর্যয় এড়াতে সামষ্টিক সাহায্য-সহযোগিতা ও পারস্পরিক দায়বদ্ধতা

ইসলামী বীমার উদ্দেশ্য হচ্ছে: বাস্তবতার নিরিখে ব্যষ্টির বোঝা অপসারণে সামষ্টিক অংশগ্রহণ। অল্পসংখ্যকের আর্থিক ক্ষতি অনেকের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিতরণ করা। তাই এর সাথে শরীয়তের কোন দ্বন্দ্বতো থাকতেই

পারে না: বরং তা শরীয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের একটি উপাদান হিসেবে পরিগণিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ পর্যায়ে কুরআন-সুন্নাহ থেকে এই মূল উপাদানের সমর্থনে প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হবে।

প্রথমত: আল্-কুরআনুল কারীম থেকে দলীল:

ইরশাদ হয়েছে: "সৎকর্ম ও খোদাভীতি একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না"(আল-মায়িদাহ:২)। এ নির্দেশ যেহেতু সাধারণ ভাবধারাসম্পন্ন ও ব্যাপকার্থবোধক, তাই বিপদাপন্ন ব্যক্তির প্রতি বীমার অনুদান-তহবিল থেকে প্রদত্ত আর্থিক সাহায্যও এই নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই যুক্তিসংগত।

দ্বিতীয়ত: সুন্নাহ থেকে দলীল:

ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবকাঠামো ও রূপরেখা সাম্প্রতিককালের হলেও এর মূল প্রেরণা পারস্পরিক সহযোগিতা, বিপন্নদের সহায়তা, উত্তরাধিকারীদের আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের বিষয়টি মুসলমানদের কাছে নতুন কোন ব্যাপার নয়। বিশ্বের সর্বপ্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক বিশ্বনবী (স.) এ সবের দিশা দিয়ে গেছেন আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে। তিনি ঘোষণা করেছেন:

১. "যে মুসলমান ব্যক্তি ঋণ রেখে মৃতবরণ করেছে, তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার উপর এবং তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে তার ওয়ারিসগণ[৫]"। অন্য বর্ণনায় এসেছে: "যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে গেল তা তার পরিবারের সদস্যদের জন্যই। আর যে ব্যক্তি কাউকে নিঃসম্বল রেখে গেল তার দায়িত্ব আমার উপর[৬]"।

২. আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন, "আশ'আরী গোত্রের লোকেরা যখন জিহাদে গিয়ে অভাবগ্রস্থ হয়ে পড়ে বা মদীনাতেই তাদের পরিবার পরিজনদের খাবার কম হয়ে যায়, তখন তারা তাদের যা কিছু সম্বল থাকে থাকে, তা একটা কাপড়ে করে। তারপর একটা পাত্র দিয়ে মেপে তা নিজেদের সমানভাবে ভাগ করে নেয়। কাজেই তারা আমার ও আমি তাদের"

এই হাদীসটি الدلالة وجه প্রখ্যাত ফকীহ নাসির আব্দুল হামীদ বলেন: এ হাদীসটি এমন সব লোকের মধ্যে পারস্পরিক দায়বদ্ধতা, সাহায্য-সহযোগিতার জীবন্ত নমুনা, যাদের আর্থিক সঙ্গতি সমপর্যায়ের নয়। কারো সঙ্গতি অধিক, কারো কম, কারে আবার কোন সঙ্গতিই নেই। এর দ্বারা একটি শারঈ নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মূল কথা হলো: পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতামূলক কর্মকান্ডে এমন কিছু বিষয় ছাড় দেয়া হয়, যা বিনিময় ভিত্তিক আর্থিক লেনদেনের মধ্যে দেয়ার প্রশ্নই আসে না। যেমনটি আমরা এখানে লক্ষ্য করলাম। কেউ তাদের মধ্যে বেশি অর্থ দিয়েছে, কেউ আবার কম দিয়েছে। প্রত্যেকেই তার সামর্থ্যানুযায়ী দিয়েছে। কিন্তু নেয়ার সময় সবাই কিন্তু সমানই নিয়েছে। যার অর্থ দাঁড়ায়: যে কম দিয়েছে, সে যা দিয়েছে তার তুলনায় বেশি নিয়েছে। এতদসত্বেও এখানে প্রতারণা, অস্পষ্টতা, সুদ বা জুয়ার কোন অর্থ প্রযোজ্য হয়নি। কারণ পুণ্যসাধন ও পারস্পরিক সহযোগিতাই ছিল এর একমাত্র উদ্দেশ্য[7]।

৩. ইসলামী জীবনবীমা এতিমদের ভবিষ্যতের বস্তুগত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। মহানবী (স.) এতীমদের তত্ত্বাবধায়নের ব্যাপারে বলছেন: "আমি ও এতিমের তত্ত্বাবধান ও সাহায্যকারী ব্যক্তি এভাবে, শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল একত্রে করে, বেহেশতে যাবো[৮]।

৪. "পারস্পরিক ভালোবাসা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ক্ষেত্রে মু'মিনদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি অভিন্ন দেহের মত। যার একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হলে বাকী অঙ্গগুলো তার সাথে অনিদ্রা ও কষ্ট ভাগাভাগি করে নেয়"[৯]।

মোটকথা, বীমা ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের মাধ্যমে বীমা গ্রহীতাদের সামান্য আর্থিক ত্যাগের বিনিময়ে সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আর্থিক ক্ষতির প্রতিবিধান সম্ভব। এতে সামাজিক স্বার্থ অক্ষুন্ন থাকবে, ব্যক্তি ও পরিবার লাভবান হবে। সর্বোপরি এর মাধ্যমে মানবিক সহযোগিতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। ইসলাম পুরো মানব সমাজকে একই পরিবারভুক্ত মনে করে।

তৃতীয়ত: আগাম সতর্কতা ও উপায়-উপকরণ অবলম্বন (الاتخاذ بالأسباب والاحتياط للمستقبل)

সম্ভাব্য আকস্মিক বিপদাপদ মোকাবিলা তথা জীবনের সামগ্রীক দায়-দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পূর্ব প্রস্তুতি ও আগাম সতর্কতা গ্রহণের নিমিত্তে যথাসম্ভব উপায়-উপকরণ অবলম্বন এবং কর্ম-কৌশল নির্ধারণ ইসলামী শরীয়তের একটি স্বীকৃত সত্য। ইসলাম মানুষকে ধ্বংস, বিপর্যয়, আপদ-বিপদ ও সম্ভাব্য যে কোন অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সর্বপ্রকার সতর্কতা, সাবধানতা ও আত্মরক্ষার যাবতীয় উপায় অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছে। শরীয়তের সাধারণ নীতিমালা এবং কুরআন-সুন্নাহর অসংখ্য বক্তব্যের আলোকে তা প্রমাণিত। আলাহ্ সুবহানাহু

অতা'আলা কাজকে কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। কর্মসাধনে উপায় অবলম্বন তথা কার্যকারণের এই পদ্ধতিকেই তাঁর সৃষ্টিলোক পরিচালনার নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং সমস্ত কার্যকারণের কার্যকরতা বা ক্রিয়াশীলতা নিজের ক্ষমতাধীন করে রেখেছেন فهو مسبب الأسباب। তাই مسبب এর নির্দেশনা অনুযায়ী আসবাব গ্রহণ করে তাঁরই প্রতি নির্ভরতা নিয়ে জীবন ধারনের প্রচেষ্টাই হলো মু'মিন জীবনের কর্মপদ্ধতি। নিম্নে এ মর্মে কুরআন ও সুন্নাহর প্রমানাদি তুলে ধরা হল।

প্রথমত: পবিত্র কুরআনুল কারীম:

১. "হে ঈমানদারগণ! সতর্কতা অবলম্বন কর; অতঃপর (শত্রুদের মুকাবিলা করার জন্য) হয় দলে দলে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হও অথবা একসাথে অগ্রসর হও"- (নিসা:৭১)।

২. "তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত রাখবে। এর দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আলাহ্‌র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে"- (আনফাল:৬০)।

৩."তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎ কাজ কর, আলাহ সৎকর্মপরায়ণ লোককে ভালোবাসেন" (আল্-বাকারাহ:১৯৫)।

৪. শত্রুদের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার আগাম সতর্কতা ও পদক্ষেপ হিসেবে কুরআনুল কারীমে صلاة الخوف প্রবর্তন করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য: আল-বাকারাহ:১০২)।

যুক্তিপ্রতিপাদন (وجه الدلالة من هذه الآيات الكريمة) : এসব আয়াতে সম্ভাব্য আক্রমণ ও ক্ষয়-ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা কল্পে যে সতর্কতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা জীবনের যে কোন ঝুঁকি ও দুর্ঘটনার ব্যাপারে প্রযোজ্য হতে পারে। তাকাফুল বীমা তেমনি একটা সতর্কতা।

৫. "তারা যেন ভয় করে যে, অসহায় সন্তান পেছনে ছেড়ে গেলে তারাও তাদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হত। সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে" (নিসা: ৯)।

এই আয়াতের পরোক্ষ ভাবার্থ হলো: মাতা-পিতার উচিত সন্তানদের ভবিষ্যত অর্থনৈতিক অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করা এবং তাদের একটি সুন্দর ভবিষ্যত উপহার দেয়ার জন্যে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। আর বীমা সেই রকমই একটা চেষ্টা মাত্র।

৬. সমস্ত নবী-রাসূলের কর্মপদ্ধতির মধ্যেও পূর্ব প্রতিরক্ষামূলক সতর্কতা অবলম্বনের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। যেমন:

ক. পবিত্র কুরআনুল কারীমে সূরা ইউসূফের মধ্যে হযরত ইউসূফ (আ.) সাত বছরের দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করার জন্য প্রাচুর্য ও উর্বরতার সাত বছরে আগাম পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিমূলক যে সঞ্চয় নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তা উল্লেখপূর্বক আমাদেরকেও ইউসূফী কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করার প্রতি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ (سورة يوسف:٤٧)

"ইউসূফ বলল, 'তোমরা সাত বছর একাদিক্রমে চাষ করবে, অতঃপর তোমরা যে শস্য কর্তন করবে তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করবে, তা ব্যতীত সমস্ত শীষসমেত রেখে দেবে"।

খ. মহাপ্লাবনের ধ্বংসাত্মক থাবা থেকে আত্মরক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ নূহ (আ.) কে আল্লাহ তা'আলাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন: "তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর" (নূহ: ৩৭)।

দ্বিতীয়ত: পবিত্র সুন্নাহ : ১. ভবিষ্যত বংশধরদের অনিশ্চয়তার মধ্যে না রেখে গিয়ে পরিবার প্রধানের অবর্তমানে পোষ্যদের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের প্রচেষ্টা, মহানবীর নির্দেশনা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত: "আমি মক্কায় অসুস্থ ছিলাম। রাসূল (স.) আমাকে দেখতে আসলেন। বললেন: আলাহ আফরা পুত্রকে রহম করুন। আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার সমুদয় সম্পদ অছিয়্যাত করব? তিনি বললেন, না। বললাম: তাহলে অর্ধেক? বললে, না। বললাম: তাহলে একতৃতীয়াংশ। বললেন: একতৃতীয়াংশ (ঠিক আছে)। তবে তাও বেশি হয়ে যায়। মনে রেখ, তোমার সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল ও মুখাপেক্ষীহীন করে রেখে যাওয়া অনেক বেশী উত্তম তাদের নিঃস্ব ও পরমুখাপেক্ষী অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে। এতে তারা দ্বারে দ্বারে ঘুরে ভিক্ষার হস্ত প্রসারিত করবে"[10]।

২. সম্ভাব্য যে কোন অঘটন-দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে থাকর জন্য রাসূলের আরেকটি নির্দেশনা হলো: "(রাত্রিতে নিদ্রায় যাবার আগে) তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও। তোমাদের পাত্রগুলোকে ঢেকে রাখ। পানির মশকগুলো মুখ বেঁধে নাও (অর্থাৎ পানপাত্রের মুখ ঢেকে নাও)। আর বাতিগুলো নিভিয়ে দাও"। (মুসলিম,তিরমিযী)।

৩. মূলত: তাকাফুল বীমা একটি আগাম সতর্কতা ও বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বনের চেষ্টা মাত্র। যা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের পরিপুরক উপাদান এবং ঈমানের অনিবার্য দাবী। পক্ষান্তরে, কোন প্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টা, উপায়-উপকরণ এবং বস্তুগত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ না করে শুধুমাত্র তাওয়াক্কুলের দোহাই দেয়া ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কুরআনের শিক্ষা, রাসূলের বাস্তব আদর্শ, সাহাবা, তাবেয়ীন ও সালাফদের কর্মধারার মধ্যে এর উত্তম দৃষ্টান্ত রয়েছে।

ক. হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি উটের পিঠে চড়ে রাসূলের কাছে আসল। তারপর বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি উটটি ছড়ে দিয়ে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবো, না রশি দিয়ে বেঁধে রেখে তারপর তাওয়াক্কুল করব? জবাবে রাসূল (স.) বললেন: আগে উটটি রশি দিয়ে বাঁধ ও সেই সাথে তাওয়াক্কুল কর[১১]"।

খ. হযরত ওমর (রা.) রাসূল (স.) থেকে বর্ণনা করেন: "তোমরা যদি আলাহর উপর যথার্থ ভাবে তাওয়াক্কুল বা ভরসা রাখ, তা হলে তোমাদেরকে তিনি তেমনিভাবে রিযিক দেবেন, যেমনিভাবে রিযিক দেন পাখ-পাখালীদের। ওরা সকাল বেলা খালি পেটে বের হয়ে আসে আর সন্ধ্যা বেলায় পেট ভরে নীড়ে ফিরে যায়"[12]। হযরত সাহল বিন আব্দুলাহ বলেন: এই হাদীস দ্বারা মূলত কর্ম সাধনে বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করে আলাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে বলা হয়েছে। কারণ হাদীসে খালি পেট বের হওয়া আর পেট ভরে ফিরে আসার কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, তারা রিজিকের অন্বেষণায় বের হয় এবং চেষ্টা সাধনা করে। নীড়ের মধ্যে বসে বসে তাওয়াক্কুল করে না।

দুই. তাকাফুল বীমার বৈধতার অন্যান্য দলীল: أدلة أخرى على جواز التأمين التكافلي الإسلامي

১. আল্-ফিকহুল ইসলামীতে বর্ণিত বীমার সমজাতীয় পূর্ব প্রচলিত চুক্তি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা:

বীমা-ব্যবস্থার এ আধুনিক সংস্করণের পূর্বে ইসলামের বিভিন্ন যুগে, বিশেষ করে রাসূল (স.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়কালে, এমনকি ইসলামপূর্ব যুগেও এ রকম কিছু আর্থ-সামাজিক বিধি-বিধান লক্ষ্য করা যায়, যেগুলো বীমার আধুনিক রূপরেখার সাথে একেবারেই সামঞ্জস্যশীল। তাই ইসলামী শরীয়ার আল্-ক্বিয়াস পদ্ধতি অনুসরণ করেও বীমার বৈধতা প্রমাণ করা সম্ভব। বীমা পদ্ধতিকেই সরাসরি ঐ সব পদ্ধতির কোন একটির অন্তর্ভুক্ত করে নেয়ার কথাও অনেকে বলেছেন। যেমন:

ক. القسامة **(আল্-কাসামাহ):** "(কোন জনপদে যদি কেউ নিহত হয় আর তার হত্যাকারীকে শনাক্ত করা না যায়, তাহলে) সে জনপদের পঞ্চাশজন ব্যক্তি, যাদেরকে নির্বাচন করবে নিহত ব্যক্তির অভিবাবক, এ মর্মে পৃথক পৃথকভাবে শপথ করবে যে, আল্লাহর কসম! আমি হত্যা করিনি। কে হত্যা করেছে তাও জানি না। অতঃপর তারা সামষ্টিকভাবে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে রক্তপন পরিশোধ করবে[১৩]।

খ. ضمان خطر الطريق **: (পথের ঝুঁকির জিম্মাদারী) :** এ হিসেবে কেউ যদি কাউকে বলে: (এটি নিরাপদ পথ)। তুমি এই পথে যাও। কেউ যদি তোমার মালামাল ছিনিয়ে নেয়, তাহলে আমি তার জিম্মাদার। আমি তোমাকে এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিচ্ছি। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যক্তির কোন ক্ষতি সংগঠিত হলে তার জন্য সে দায়ী থাকবে। এখানে مضمون عنه অজ্ঞাত থাকা সত্বেও এ ধরনের চুক্তি বৈধ[14]।

গ. এছাড়াও আরো ফিকহ শাস্ত্রে বীমার সমজাতীয় নানা চুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন: نظام العاقلة، عقد الهبة بالعوض ,الموالاة، عقد النهد او المناهدة، الوقف ইত্যাদি। এ সব عقود নিয়ে আমরা অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। ইনশাআলাহ।

৩. শরীয়তের সাধারণ নীতিমালা । যেমন:

ক. الأصل في الأشياء الإباحة **(মু'আমালাতের ক্ষেত্রে মৌলিক অবস্থা হলো বৈধতা):**

এ প্রসঙ্গে শায়খ আলী আল-খাফীফ বলেন[১৫]: এটি একটি অভিনব আর্থিক লেনদেন। এর পক্ষে বা বিপক্ষে শরীয়তের কোন সরাসরি বক্তব্য (نص) নেই। এ ধরনের যে কোন বিষয়ে মৌলিক অবস্থা হলো বৈধতা।

খ. الحاجة تنزل منزل الضرورة عامة أو خاصة، الضرورة تبيح المحظورات

"প্রয়োজনের তাগীদে বীমা আজ একটি অনিবার্য ও অপরিহার্য দাবী হয়ে উঠেছে। তাই বীমাকে ফিকহের উপরিল্লিখিত নীতিদ্বয়ের গন্ডিভুত করায় কোন দ্বিধা থাকতে পারে না।

৪. প্রাচীন ফিকহী গ্রন্থে ইসলামী বীমার স্পষ্ট ধারণা:

ইমাম ক্বারাফী তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ الفروق এর মধ্যে "الفرق بين قاعدة ما يضمن بالطرح من السفن وقاعدة ما لا يضمن" শীর্ষক শিরোনামের আওতায় ইমাম মালিক থেকে একটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন, যার সাথে আধুনিক ইসলামী বীমাব্যবস্থার ধারণাগত প্রচন্ড মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বলেন: "অতিরিক্ত বোঝাই করার কারণে নৌকা থেকে যাদের পণ্য ফেলে দেয়া হয়, তাদেরকে বাকীদের পণ্যে অংশীদার করে নিতে হবে। এবং যা কিছু নৌকায় আছে, আর যা কিছু ফেলে দেয়া হয়েছে, সবকিছুতেই সকলের সম্মিলিত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে যে দিন তারা ক্রয় করেছে, সেদিনের ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে, যদি একই জায়গা থেকে তা ক্রয় করে থাকে। তাই এর বর্ধন-হ্রাস সবকিছুতেই তারা অংশীদার। এতে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব করা চলবে না। কারণ তারা নিজেদের পণ্য নিক্ষেপ করে বাকীদের পণ্য রক্ষা করেছে। অতএব, ন্যায়বিচারের দাবী হচ্ছে, তারা একাই শুধু ক্ষতি বহন করবে না। কারণ এখানেই সবাই সমান। কারো অধিকার কারো চেয়ে বেশি নয়। সকলের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই ঐ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল[১৬]"।

উল্লেখ্য[১৭] যে, গবেষকদের একটি অতি নগণ্য সংখ্যা (التأمين التعاوني) কে হারাম বলে অভিমত করেছেন। প্রাকৃতিক রূপ-রস-গন্ধভরা পুষ্প-বাগিচা বঞ্চিত অনুর্বর চৌচির ভূমির অধিবাসীরা যেমন কৃত্রিম পুষ্পের নিরস সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়, আলোচ্য বীমা কে তারা ঐ ধরনের নকল ফুলের সাথে উপমা দিয়েছেন। যাদের শীর্ষে রয়েছেন: ড. ঈসা আব্দুহ। প্রাক্তন শায়খুল আযহার, ড. যাদুল হক্ক আলী যাদুল হক্ক।

যে সব সন্দেহের উপর এই অভিমতটি প্রতিষ্ঠিত, এ পর্যায়ে তা তুলে ধরব এবং পর্যালোচনা করব।

এক. আসলেই কি ইসলামী সমাজে এই অভিনব চুক্তি গ্রহণ করার এমন কোন চরম প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, যা পূরণ করার ক্ষমতা ইসলামী শরীয়তে নেই? এই বীমা কি যাকাত, সাদাকাত এবং ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালে উপর অর্পিত আর্থিক দায়-দায়িত্বভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিকল্প কিছু[১৮]?

পর্যালোচনা ও খন্ডন:

এ আপত্তির পর্যালোচনা করতে গিয়ে আলাম মুহাম্মাদ বিলতাগী বলেন:

বীমা ব্যবস্থা যাকাত, সাদাকাত এবং ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালে উপর অর্পিত আর্থিক দায়-দায়িত্বভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিকল্প কিছু নয়। বরং এটি ইসলামের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থারই একটি অংশ। যা সময়ের পরিবর্তনে আজ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার এটি অনিবার্য দাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এ নীতিতো শরীয়তে স্বীকৃত হয়েছে: أن مصالح الناس تتجدد ولا تنتهي জনকল্যাণের বিষয়টি পরিবর্তনশীল এবং এর কোন চূড়ান্ত সীমারেখা নির্ধারন করা যায় না"[19]।

দুই. বীমা ব্যবস্থা মানুষের জীবনকে নিশ্চিত করে। এটা ইসলাম বিরোধী কথা। কারণ আল্লাহ ছাড়া কেউ কারো জীবন নিশ্চিত করতে পারে না।

পর্যালোচনা: বীমার উদ্দেশ্য কারো বেঁচে থাকাকে নিশ্চিত করা নয়। কারণ প্রাণী মাত্রই মরণশীল। কেউ কারো জীবন নিশ্চিত করতে পারে না। বীমা হচ্ছে মূলত অর্থনৈতিক ঝুঁকি থেকে সুরক্ষার একটি উদ্যোগ মাত্র। এর মাধ্যমে এতিম, অসহায় তথা ঝুঁকিগ্রস্তদেরকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়[২০]।

তিন. বীমার মধ্যে রিবা আল্-ফাদল এবং রিবা আল-নাসিয়ার উপাদান থাকে। কারণ, বীমাকারী যদি বীমাগ্রহীতাকে কিংবা তার বেনিফিসিয়ারী (দের) কর্তৃক দেয় প্রিমিয়ামের চেয়ে বেশি ফেরত দেয়, তবে তা হবে রিবা আল্-ফাদল। আবার যদি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বীমাগ্রহীতাকে সুবিধা দেয়, তবে তা হবে রিবা আল্-নাসিয়াহ। উভয় পরিস্থিতিতে জীবনবীমা অবৈধ হয়ে পড়ে।

চার. এতে বাজী বা জুয়ার উপাদান আছে।

পাঁচ. এতে গরারের (অনিশ্চয়তার) উপাদান আছে। কারণ বীমাগ্রহীতা আদৌ ক্ষতিপূরণ পাবে কিনা, পেলে কখন ও কি পরিমাণ পাবে? এই বিষয়গুলো তার কাছে চুক্তি সম্পাদনের সময় স্পষ্ট থাকে না, কারণ এগুলো নির্ভরশীল বীমাকৃত বিপদ-বিপত্তির সাথে। আর তা আদৌ ঘটবে কিনা, ঘটলেও কখন ঘটবে, তাতো কারো জানা থাকে না। এমনকি বীমাকারী কোম্পানীও তা জানে না।

ছয়. বীমা আল-মীরাস ও অছিয়্যাত নীতি পরিপন্থী ।

শেষোক্ত সন্দেহগুলো খন্ডনে আমরা বলতে পারি: মূলত: এখানে যে আপত্তিগুলো করা হয়েছে, তা প্রচলিত বীমা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় । মূলত: এদুটো ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব থেকেই এ গুলোর উদ্ভব ঘটেছে । তাই আমরা নিচে এতদসংক্রান্ত পার্থক্যগুলো তুলে ধরলাম ।

প্রচলিত বীমা ও ইসলামী বীমা ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য:

প্রচলিত বীমা	ইসলামী বীমা
প্রচলিত বীমা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠিত عقدو المعاوضات এর ভিত্তির উপর । এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে, ব্যবসা ও সর্বোচ্চ আর্থিক মুনাফা অর্জন । বীমাগ্রহীতাদের দেয় অর্থ এবং কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ এ দুয়ের মধ্যে যে পার্থক্য থাকে, তাই হচ্ছে তার লাভ ।	ইসলামী বীমা একটি তাবাররু' চুক্তি । এর উদ্দেশ্য হচ্ছে : পারস্পরিক সহযোগিতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা ।
প্রচলিত বীমা ব্যবস্থায় চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে ক্রেতা-বিক্রেতার । গ্রাহকের কাছে বীমা পলিসি বিক্রি করার মাধ্যমে বীমাকারী চায় সর্বোচ্চ পরিমাণে লাভ করতে ।	কিন্তু তাকাফুল বীমার ক্ষেত্রে কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে অংশগ্রহণকারীদের তহবিলের জিম্মাদার বা ব্যবস্থাপক । ব্যবস্থাপক বা জিম্মাদার হিসেবে প্রতিষ্ঠান পারিশ্রমিক পাবে যা অংশগ্রহণকারীদের তাকাফুল/মুদারাবা তহবিলের লভ্যাংশ হিসেবে প্রদান করা হয় ।
প্রচলিত বীমা ব্যবস্থায় হালাল-হারামের কোন ধারণা নেই । এটি পরিচালিত পুঁজিবাদী তথা পশ্চিমা ইয়াহুদী-খ্রীষ্টান কর্তৃক প্রবর্তিত নীতিমালার ভিত্তিতে ।	*তাকাফুল বীমা যাবতীয় কার্যক্রম যেমন, বিনিয়োগ, বণ্টন, পরিচালনা,রব্যবস্থাপনা ইত্যাদি পরিচালিত হয় ইসলামী শরীয়াহর নীতি অনুযায়ী ।
কোন শরীয়াহ কাউন্সিল নেই	তাকাফুল কার্যক্রমের সকল বিষয় তত্ত্বাবধানের জন্য শরীয়াহ বিশেষজ্ঞদের একটি কাউন্সিল থাকে । শরীয়াহ নীতিমালা অনুযায়ী তাকাফুল কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য এটা প্রয়োজন ।
ববীমাকারী প্রতিষ্ঠান ও বীমাগ্রহীতা সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও স্বতন্ত্র ।	অংশীদার নিজেই বীমাকারী ও বীমাগ্রহীতা ।
প্রচলিত বীমা ব্যবস্থর মধ্যে ঘরার (অনিশ্চয়তা/ অস্পষ্টতা) রয়েছে। কারণ বীমাগ্রহীতা প্রিমিয়ামের মাধ্যমে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করে, কখনো সে এর চেয়ে অনেক গুণ বেশি ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকে, কখনো বা আবার কোন ক্ষতিপূরণই পায়না। কারণ পুরো বিষয়টা নির্ভরশীল হচ্ছে পলিসিতে উল্লিখিত দুর্ঘটনা । তা ঘটতেও পারে, আবার নাও পারে । এটি একটি নিছক সম্ভাবনা । আর যে কোন عقد معاوضة এর মধ্যে এধরনের غرر হাদীস দ্বারা নিষিদ্ধ ।	দুর্ঘটনা এমন একটি সম্ভাব্য বিষয়, যা আলাহ ছাড়া কেই জানেন না । তাই এটিকে ঘরার বলা যায় । তবে ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় ঘরারের বিষয়টি ধর্তব্য নয় । কারণ এটি একটি তাবাররু' চুক্তি । এ চুক্তি অনুযায়ী অংশীদারগণ তাবাররু' ফান্ডে চাঁদা প্রদান করে থাকে । এবং দুর্ঘটনায় পতিত হলে সে চাঁদা থেকে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করেন ।
প্রচলিত বীমা ব্যবসায়ে সৃষ্ট তহবিল বীমা কোম্পানীর মালিকানায় থাকে	অংশগ্রহণকারীদেরঅর্থে সৃষ্ট তহবিলে অংশগ্রহণকারীদের (পলিসি হোল্ডারদের) মালিকানা থাকে ।
বিনিয়োগ তহবিল আর তাবাররু তহবিল নামে কোন আলাদা ফান্ডের ব্যবস্থা নেই ।	তাকাফুলের হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ: এতে ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য সৃষ্ট তহবিল এবং বিনিয়োগ তহবিলের (মুদারাবাহ অংশ) হিসাব আলাদাভাবে রাখা হয় । বিনিয়োগ তহবিল থেকে অর্জিত লাভ

	অংশগ্রহণকারীগন এবং তাকাফুল পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাগাভাগি করা হয়।
প্রচলিত সুদী বীমাব্যবস্থায় বীমাপলিসিকারী যাকে নমিনী মনোয়ন করেন, তিনি তার মৃত্যুর পর বীমাকৃত সকল সম্পদের মালিক হবেন।	ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় নমিনী একজন জিম্মাদার মাত্র। তিনি তাকাফুল স্কীমের প্রদেয় অর্থ গ্রহণ করে ইসলামের মীরাস পদ্ধতি অনুসরণ করে তা ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করে দেবেন।
একচেটিয়াত্ব ও মজুদদারিতা সৃষ্টি করে। কারণ এখানে কোম্পানী হচ্ছে মূলত বীমাকারী। যার মুষ্টিমেয় কিছু লোকের দ্বারা পরিচালিত হয়। যারা বিশাল জনগোষ্ঠীর দেয় সম্পদ এবং উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে স্বেচ্ছাচারিতা করতে পারে।	একচেটিয়াত্ব বা মজুদদারীর কোন সুযোগ নেই। কারণ বীমাগ্রহীতাদের সমষ্টিই হচ্ছে এখানে বীমাকারী।
প্রচলিত বীমা ব্যবস্থার মধ্যে সুদের উপাদান রয়েছে	সুদের কোন উপাদান নেই।

৩. ইসলামী বীমা ব্যবস্থার শারঈ ভিত্তি الأسس الشرعية للتأمين الإسلامي

ইসলামী বীমা ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এর কার্যক্রম পূর্ব প্রচলিত, ইসলামে স্বীকৃত মোট চার ধরনের চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত[২১]।

এক. عقد تبرع তাবাররু চুক্তি (বীমাগ্রহীতা ও বীমায় সংগৃহীত অর্থের মধ্যকার সম্পর্ক) :

যে চুক্তির মাধ্যমে বীমায় অংশগ্রহণকারী ও বীমা তহবীলের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়, সেটি হচ্ছে মূলত তাবাররু চুক্তি। মূলতঃ তাবাররু'-ই হচ্ছে ইসলামী বীমার মূল বুনিয়াদ। এ কথার ব্যাখ্যা হচ্ছেঃ ইসলামের দৃষ্টিতে মালিকানা চুক্তি عقود التمليك দু' প্রকারঃ এক. বিনিময়ভিত্তিক চুক্তি عقود المعاوضات (Reciprocal Contract)। দুই. অনুদান চুক্তি عقود التبرعات (Donation Contract)। বিনিময় চুক্তি হচ্ছেঃ "যে চুক্তিতে সংশিষ্ট প্রত্যেক পক্ষ অপর পক্ষকে যা প্রদান করে তার বিপরীতে বিনিময় গ্রহণ করে থাকে"[২২]। যেমনঃ সব ধরনের ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, মুদারাবাহ, মুসাকাহ ইত্যাদি জাতীয় চুক্তি। আর অনুদান চুক্তি হচ্ছেঃ "যে চুক্তি অনুযায়ী এক পক্ষ কর্তৃক অন্য পক্ষকে কোন প্রকার বিনিময় ব্যতীত, শুধু দানের নিয়্যাতে কোন সম্পদ বা অধিকারের মালিকানা বা সত্ত্ব সম্প্রদান করা হয়, তাই তাবাররু' চুক্তি"। যেমনঃ হিবা, অছীয়্যাহ, সাদাকাহ, ই'আরাহ চুক্তি ইত্যাদি। বিনিময় চুক্তি বা عقد المعاوضة বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য যে সব শরীয়ত পরিপন্থী বিষয় থেকে মুক্ত থাকার শর্তারোপ করা হয়, তন্মধ্যে রয়েছেঃ

ক. সর্ব প্রকার সুদী কর্মকান্ড। খ. আল্-গরার (الغرر: جهالة العاقبة) তথা অস্বচ্ছতা, অস্পষ্টতা, প্রতারণা। গ. জুয়া অর্থাৎ অনাহুত ঝুঁকি।

প্রচলিত বীমা ব্যবস্থা عقد معاوضة বা বিনিময় চুক্তি হওয়া সত্বেও তাতে এসব নিষিদ্ধ বিষয়ের উপস্থিতি রয়েছে, তাই মুসিলম মনিষীগণ ইহাকে অবৈধ বা হারাম হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

প্রচলিত বীমা বিনিময় চুক্তি (عقد معاوضة) হওয়ার অর্থঃ এতে বীমা কোম্পানী ও বীমা পলিসি হোল্ডারদের মধ্যে বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেক পক্ষ অপর পক্ষকে যা দেয়, তার বিপরীতে বিনিময় গ্রহণ করে। অর্থাৎ অর্থাৎ কোম্পানী আর্থিক নিরাপত্ত বা নিশ্চয়তা অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করছে, আর গ্রাহকরা তা ক্রয় করছে (شركة التأمين التجاري= بائعة الأمن. وحملة الوثائق = مشترو الأمن)।

এতে সুদ, গারার এবং জুয়ার উপস্থিতি থাকার বিশ্লেষণঃ

বাণিজ্যিক বা প্রচলিত বীমা ব্যবস্থায় দু' ধরণের সুদ রয়েছে। যেহেতু, এ ধরনের চুক্তিতে অর্থের সাথে অর্থের বিনিময় হয়, তাই ইসলামে বিধান অনুযায়ী এই লেনদেনে 'সমান সমান ও হাতে হাতে' (তাৎক্ষণিক বিনিময়) নীতি অনুসরণ অপরিহার্য। এ জাতীয় লেনদেনে যদি প্রদত্ত ও গৃহীত অর্থের মধ্যে পরিমাণগত বৈষম্য থাকে, তা হলে তা রিবা ফাদল এবং তাৎক্ষণিক ভিত্তিতে না হয়ে যদি বিলম্বিত হয়, তবে রিবা নাসীয়াহ বলে গণ্য হয়। এদুটোই প্রচলিত বীমা ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। কারণ বীমাগ্রহীতা ঝুঁকিগ্রস্থ হলে যে ক্ষতিপূরণ পায়, তা একদিকে যেমন বিলম্বিত, অন্যদিকে তা তার প্রদত্ত প্রিমিয়ামের সমান নয়।

প্রচলিত বীমা ব্যবস্থায় ঘারার ও ক্কিমার (অনভিপ্রেত ঝুঁকি) রয়েছে। কারণ বীমাগ্রহীতা আদৌ ক্ষতিপূরণ পাবে কিনা, পেলে কখন ও কি পরিমাণ পাবে? এই বিষয়গুলো তার কাছে চুক্তি সম্পাদনের সময় স্পষ্ট থাকে না, কারণ এগুলো নির্ভরশীল বীমাকৃত বিপদ-বিপত্তির সাথে। আর তা আদৌ ঘটবে কিনা, ঘটলেও কখন ঘটবে, তাতো কারো জানা থাকে না। এমনকি বীমাকারী কোম্পানীও তা জানে না। অনেক সময় একটি কিস্তি দিয়েও গ্রহীতা বিপত্তির কারণে পুরো ক্ষতিপূরণ পেয়ে যায়, আবার অনেক সময় প্রিমিয়ামের পূর্ণ কিস্তি পরিশোধ করেও কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ পায় না। প্রথম অবস্থাটা আসলেই কোম্পানীর জন্য একটি বড় ঝুঁকি। কারণ সে কোন অপরাধ না করেই বড় অংকের জরিমানা দিতে বাধ্য হচ্ছে, অন্যদিকে অন্যপক্ষ (গ্রহীতা) যে আর্থিক সুবিধা অর্জন করেছে, তা বিনিময়হীন বা অসম। এসব কারণে প্রচলিত বীমা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছেন।

পক্ষান্তরে, ইসলামী বীমা عقود التبرعات (অনুদান চুক্তিসমূহের) অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই বীমা কোম্পানী বীমা তহবীলের স্বত্বাধিকারী হয় না। তাই (স্বল্প, মাঝারি বা অধিক পরিমাণ) গরার বা ক্কিমার তথা অনিশ্চয়তা, অসম্পটতা, বা ঝুঁকি এতে কোন ক্ষতিকারক উপাদান হিসেবে গণ্য হয় না। কারণ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্পরিক উপকার, সাহায্য-সহযোগিতা, ব্যবসা-বাণিজ্য নয়।। আর যেহেতু এই বীমা ইসলামী শরীয়ার নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হয়, তাই এতে সুদেরও কোন গন্ধ থাকেনা।

এক কথায় বলা যায় যে, বীমা ব্যবস্থা কে عقود المعاوضة থেকে عقود التبرع তে পরিবর্তিত করাই হচ্ছে তাকাফুল বা তা'আউন বীমার শরীয়ত সম্মত হওয়ার মূলভিত্তি। যথার্থই বলেছেন প্রখ্যাত ইসলামী আইনজ্ঞ عبد الستار أبو غدة: "তাবাররু ধারণাই হচ্ছে প্রচলিত বীমা ব্যবস্থার সাথে তাকাফুর বীমা ব্যবস্থার ভিন্ন পথের সূচনা"[২৩]।

এই ভিত্তিমূলের ধারণায় বিশেষজ্ঞগণ ঐকমত্য পোষণ করলেও এই তাবারু' চুক্তির মূল প্রকৃতি কি? অর্থাৎ এটি কোন প্রকার তাবাররু'? সে ব্যাপারে তাদের একাধিক অভিমত রয়েছে। নিম্নে তা আমরা আলোচনা করব।

এক. الهبة بالعوض বা الهبة المشروطة **(বিনিময়ভিত্তিক বা শর্তযুক্ত হিবাহ)**

ইসলামী শরীয়ত দানকে শর্তের অধীনে বা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কিংবা নির্দিষ্ট ঘটনায় সীমিত রাখার বিষয়টি অনুমোদন করে। কারণ শর্তারোপ ও দানের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। বরং দান-অনুদানের মধ্যে পরোক্ষভাবে প্রতিদানের অর্থ লুকিয়ে থাকে।[২৪] এ কথার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আলামা বাবরতি (صاحب العناية)বলছেন:

"কারণ সচারাচার লক্ষ্য করা যায় যে, মানুষ কিছু পাওয়ার বাসনাতাড়িত হয়েই সাধারণত অন্যকে কিছু উপহার-উপঢৌকন প্রদান করে। অপেক্ষাকৃত অধিক সম্মানিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে কিছু দান করে কেউ তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব-বলয়ে রক্ষণাবেক্ষণ লাভ করতে চায়। কেউ বা আবার সেবা-পরিচর্যা লাভের উদ্দেশ্যে নিম্নতম কাউকে কিছু দান করে। আর যখন কেউ সমপর্যায়ের কাউকে কিছু দান করে, তখন মনে মনে তার বিনিময় কামনা করে। এজন্যই দানচুক্তির এ উদ্দেশ্যে যখন ব্যহত হয়, তখন দানকারীর জন্য চুক্তি রহিত করার অধিকার সাব্যস্ত হয়ে যায়। ঠিক ক্রেতা যেমন ক্রীত পণ্যের মধ্যে কোনপ্রকার ত্রুটি পেলে তা বিক্রেতার কাছে ফিরিয়ে দেয়ার অধিকার লাভ করে। কারণ এতে তার উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয়ে যায়"। রাসূল (স.) ইরশাদ করেন: "প্রতিদান প্রাপ্তি পর্যন্ত দানকারী তার দানের ব্যাপারে সর্বাধিক হক্কদার" (ইবনু মাজাহ, দারু কুতনী, ইবনু আবী সাইবা)।

দুই. আকিলাহ পদ্ধতি (نظام العاقلة): ইসলামের আত্মপ্রকাশের পূর্বে আল্-আকিলাহ পদ্ধতি তৎকালীন সমাজে একটি বহুল প্রচলিত প্রথা হিসেবে কার্যকর ছিল। এই প্রথা অনুযায়ী এক গোত্রের কোন লোক যদি অপর গোত্রের কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতো, তবে নিহত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনকে হত্যাকারীর নিকটাত্মীয় ব্যক্তিবর্গ সম্মিলিতভাবে দিয়্যাত বা রক্তমূল্য (Blood Money) পরিশোধ করতো। হত্যাকারীর এ নিকটাত্মীবর্গকে বলা হতো 'আকিলাহ'। কারো মতে, আসাবাহ বা হত্যকারীর পিতৃসম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়বর্গকেই 'আকিলাহ' বলা হতো।

পরবর্তীতে মহানবী (স.) অনিচ্ছাকৃত, ভুলক্রমে হত্যার দিয়্যাতের ক্ষেত্রে এই 'আকিলাহ' পদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং এই দূর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব সমষ্টির উপর অর্পণ করেন। যেমন: হুযাইল গোত্রের এক মহিলার খুনের রায় প্রদান কালে মহানবী (স.) স্বয়ং 'আকিলাহ'র ধারণা গ্রহণ করেন। যা নিচের বর্ণনায় বিধৃত হয়েছে।

"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: একদা হুযাইল গোত্রের দু'জন মহিলা বিবাদকালে একজন অপরজনকে পাথর দ্বারা আঘাত করলে সে তার গর্ভের শিশুসহ নিহত হয়। নিহতের উত্তরাধিকারীরা রাসূল (স.) এর নিকট এর প্রতিকার দাবী জানালে তিনি এই রায় প্রদান করেন যে, গর্ভস্রুনের জন্য একজন দাস এবং আকিলা (পিতৃকুলের নিকটাত্মীয়বর্গ) রীতি অনুযায়ী নিহত মহিলার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে"। আর্থিক লেনদেনের এ নিয়ম বীমা কোম্পানীকে প্রদেয় প্রিমিয়াম প্রদানের সাথে যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ। এ ছাড়া ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা পরিবারের ক্ষতিপূরণের দিক থেকে আকিলার কার্যকারিতা প্রচলিত বীমা ব্যবস্থায় অপ্রত্যাশিত দূর্ঘটনা বা মৃত্যুর মোকাবেলায় আর্থিক সহায়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উভয় পদ্ধতির মাঝে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির লোকসানের বোঝা একদল লোক পরস্পররের মাঝে ভাগ করে নেয়ার রীতি স্বীকৃত। আবার অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার মোকাবেলায় উভয় পদ্ধতি ছিল ক্ষতিগ্রস্থদের অর্থনৈতিক রক্ষাকবচ স্বরূপ। ফলে এ আকিলাহ পদ্ধতিকে বর্তমান বীমা ব্যবস্থার ভিত্তি বলা যেতে পারে।

তিন. মুওয়ালাহ চুক্তি (عقد الموالاة): মুওয়ালাহ চুক্তি হচ্ছে: "এ মর্মে দু'ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি যে, তাদের কেউ যদি দিয়্যাতযোগ্য অপরাধ করে, তাহলে অন্যজন তার রক্ষপণ দেবে এবং মৃত্যুর পর তারা একজন আরেকজনের উত্তরাধিকারী হবে.[25]"। ইসলামপূর্ব কালে এ ধরনের চুক্তি প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে ইসলামেও এর স্বীকৃতি দেয়া হয়। এটিই হচ্ছে হযরত ইবনু আব্বাস, ইবনু মাসউদ এবং হানাফী মযহাবের অভিমত। অবশ্য কোন কোন গবেষক মুওয়ালাহ চুক্তির উপর বীমা ব্যবস্থার ভিত্তি রচনার এই প্রয়াসের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছেন। কারণ, عقد الموالاة ইসলামী আইনবেত্তাগণের কাছে محل اتفاق (সর্বজন স্বীকৃত কোন মত) নয়। অথচ কিয়াসের ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে: আসল বা مقيس عليه সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য হবে।

চার. বাধ্যতামূল দান (الالتزام بالتبرع) : এটি মালিকী মাযহাবের একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি। এ প্রসঙ্গে ইমাম হাত্তাব স্বীয় কিতাব (تحرير الكلام في مسائل الالتزام) এর মধ্যে বলেন: "বাধ্যতামূলক দান হচ্ছে ,"নিঃশর্তভাবে নিজের উপর নিজেই জনকল্যাণমূলক দায়ভার গ্রহণ করা । এর মধ্যে সাদাকাহ, হিবাহ, ওয়াকফ, আরীয়াহ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত"[26] । ইমাম মালিক (ব.) তার المدونة الكبرى এর মধ্যে الحمالة অধ্যায়ে কাফীল কর্তৃক কাফালাতের দায়িত্ব পালনের অপরিহার্যতা ব্যাখ্যা করতে বলেন: "কাফালাহ (কারো প্রতিভূ/জামিন হওয়া) হচ্ছে একটি জনকল্যাণমূলক কাজ। আর কেউ যদি কোন মা'রূফ বা জনকল্যাণকর কাজ নিজের জন্য অবধারিত করে নেয়, তবে তা পালন করা তার জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়"।

সমবায়ভিত্তিক ইসলামী বীমা একটি জনকল্যাণমূলক চুক্তি। কারণ এর মাধ্যমে দুর্ঘটনা বা ঝুঁকিগ্রস্থ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ আর্থিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তা অর্জন করতে পারে। এ ব্যাপারে বীমাগ্রহীতা ও বীমাকারীর মধ্যে একটি সমঝোতা হয়ে থাকে। বীমাগ্রহীতা যেহেতু এ চুক্তি অনুযায়ী বীমাফান্ডে দান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে, তাই এটি তার জন্য বাধ্যতামূলক দান (الالتزام بالتبرع) হিসেবে পরিগণিত হবে।

পাঁচ. ওয়াক্ফ (الوقف): বীমা পলিসি হোল্ডার নিজের অর্থ দিয়েই নিজে উপকৃত হচ্ছে,তা সত্বেও কি করে এখানে তাবাররু' সম্পর্কের কথা বলা হচ্ছে? এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সমকালীন অনেক গবেষক বলছেন: আসলে এটি হচ্ছে এক প্রকার ওয়াকফ ভিত্তিক তাবাররু পদ্ধতি। যাতে ওয়াকফকারী নিজে ও তার সন্তানাদি কর্তৃক ওয়াকফকৃত সম্পদ দ্বারা উপকৃত হওয়ার শর্তারোপ করতে পারে। এর দ্বারা ওয়াকফ তার তাবররু' বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে না[27]। বরং ওয়াকফ ও শর্ত দু'টোই শুদ্ধ। এর উপরেই হানাফী মযহাবের ফাতওয়া[২৮]। এ মতের সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি-প্রমাণও আছে। যেমন:

ক. নবী কারীম (স.) এর বাণী: "যে ব্যক্তি রওমাহ কুপটি ক্রয় করে তাতে নিজের ও অন্যান্য মুসলমানদের বালতি ফেলার ব্যবস্থা করবে, (অর্থাৎ এটি আল্লাহর পথে দান করে নিজেও উপকৃত হবে, অন্যদেরকেও উপকৃত করবে), তাকে জান্নাতে এর চেয়ে অতিউত্তম প্রতিদান দেয়া হবে"। অতঃপর উসমান সেটি ক্রয় করলেন[29]।

খ. ওমর (রা.) তাঁর ভূমি ওয়াকফ করেছিলেন, তখন বলেছিলেন: "যে এর দেখাশুনা ও সার্বিক তত্তাবধানে থাকবে, সে এর থেকে ন্যায়সঙ্গতভাবে যা খাবে, তাতে কোন অপরাধ নেই"[30]। বাস্তবে এই ওয়াকফকৃত ভূমির উপর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁরই তত্ত্বাবধান ছিল।

ছয়. (তাবাররু ও মু'আওদা বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত তা'আউনী চুক্তি)।

সমকালীন গবেষকদের একটি দলের অভিমত হচ্ছে: বীমা ফান্ডকে ওয়াকফ-নীতির আওতাভুক্ত বা অন্য যে কোন রূপে এর আইনগত ভিত্তি রচনা করা হোক না কেন, মূল তাকাফুল চুক্তিটিকে নিছক তাবাররু' (التبرعات

(المحضة) হিসেবে গণ্য করাটা বিধিসম্মত নয়। কারণ এতে বীমাগ্রহীতা বীমা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার আগে প্রথমেই যেটা চিন্তা করে সেটি হচ্ছে নিজের উপকার, (ঝুঁকি বা দুর্ঘটনা থেকে) আত্মরক্ষা বা আর্থিক নিরাপত্তা লাভের আত্মনিশ্চয়তা। অন্য গ্রাহকদের উপকার ও সহযোগিতা করার চিন্তা যদিও থাকে, সেটি আসলে অনেকটা প্রান্তিক, গৌণ ও অমৌলিক। এটা তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। পক্ষান্তরে, তাবাররু' চুক্তির ক্ষেত্রে দাতার মূল উদ্দেশ্য থাকে, অন্যকে সাহায্য করা। আর যদি সে নিজে এর দ্বারা উপকৃত হয়, সেটি থাকে গৌণ বা প্রকৃত উদ্দেশ্যের অনুগত। তাই আসলে তাকাফুল চুক্তিটি নিছক তাবাররু' চুক্তি বা নিছক মু'অআদাহ চুক্তি কোনটিই নয়। বরং এটি হচ্ছে এমন একটি তা'আউন বা সমবায় চুক্তি যার মধ্যে তাবাররু' ও মু'আঅদাহ উভয়েরই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। আর সহযোগিতামূলক চুক্তি (العقد التعاوني) হচ্ছেঃ কান যৌথ স্বার্থ বা কল্যাণ সাধনের নিমিত্তে জন্য দু'ব্যক্তির মধ্যকার চুক্তি। اشركة النَهد/التناهد এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইমাম বুখারী এ নামে একটি বাব বা অধ্যায়েরও নামকরণ করেছেন। এভাবেঃ باب الطعام في الشركة ، النهْد والعروض ..

বুখারীর ব্যাখ্যাকারক আলামা ইবনু হাযার التناهد /النهد এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেনঃ إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة "সফরসঙ্গীদের সংখ্যানুপাতে সফরের ব্যয়ভার একত্রিত করা"। ইমাম বুখারী (র.) النهد এর বৈধতা ও সাহাবীদের জীবনের এর বাস্তবায়ন প্রমাণ পর্যায়ে সংশিষ্ট অধ্যায়ে একাধিক হাদীস উলেখ করেছেন। তন্মধ্যে রয়েছেঃ

হযরত জাবির বিন আব্দুলাহ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হযর আবু উবায়দার ঘটনা সম্বলিত হাদীস।

জাবির বিন আব্দুলাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুলাহ সমুদ্র তীর অভিমুখে বাহিনী প্রেরণ করেন এবং আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.) কে তাদের সেনাপতি নিয়োগ করলেন। এ বাহিনীতে তিনশ' লোক ছিল। আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। আমরা রওয়ানা হলাম। কিন্তু মাঝখানেই আমাদের পাথেয় শেষ হয়ে গেল। তখন আবূ উবায়দা দলের সকলকে নিজ নিজ খাদ্যদ্রব্য এক জায়গায় জমা করার নির্দেশ দিলেন তাই সমস্ত খাদ্য দ্রব্য জমা করা হল। এতে মোট দু'থলে খেজুর জমা করা হল। আবূ উবায়দা প্রতিদিন আমাদের এই খেজুর থেকে কিছু কিছু করে খেতে দিতেন। অবশেষে তাও শেষ হওয়ার উপক্রম হল এবং জন প্রতি একটা করে খেজুর ভাগে পড়তে লাগল। রাবী বলেন, আমি (জাবির (রা.)) কে বললাম, একটা খেজুর কি যথেষ্ট হত? তিনি বললেন, তার মূল্য তখন বুঝতে পারলাম যখন তাও শেষ হয়ে গেল। তিনি বলেন, এরপর আমরা সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। হঠাৎ ছোট পাহাড়ের ন্যায় একটা মাছ আমরা পেয়ে গেলাম। এবং এ বাহিনী আঠারো দিন পর্যন্ত এই মাছ থেকে খেলো[৩১]"।

শেষোক্ত এই অভিমত অনুসারে ইসলামী জীবন বীমার চুক্তিগত নাম হবেঃ عقد تعاوني। যার মধ্যেয عقد معاوضة এবং عقد التبرع উভয়ের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে এর মূল ভিত্তি হিসবে ধর্তব্য থাকলে شركة النهد।

দুই. عقد الوكالة বা ওয়াকালাহ চুক্তি (বীমা কোম্পানী ও বীমাগ্রহীতাদের মধ্যে সম্পর্ক) :

যে চুক্তির মাধ্যমে বীমা কোম্পানী (ওয়াকীল) ও বীমাচুক্তিতে অংশগ্রহণকারীরে (মুওয়াক্কেল) মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক পরিচালিত হয়, সেটি হচ্ছে ওয়াকালাহ চুক্তি। এটি পারিশ্রমিকের বিনিময় হতে পারে, আবার বিনিময় ছাড়াও হতে পারে। এই চুক্তির ভিত্তিতেই বীমা প্রতিষ্ঠান বীমাগ্রহীতাদের প্রতিনিধি (وكيل) হিসেবে বীমার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

তিন. عقد المضاربة বা মুদারাবাহ চুক্তি (বীমা কোম্পানী ও বীমা গ্রহীতাদের থেকে সংগৃহীত অর্থের মধ্যকার সম্পর্ক):

যে চুক্তির মাধ্যমে বীমা কোম্পানী ও বীমা তহবীলে সঞ্চিত অর্থের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক পরিচালিত হয়, সেটিই হচ্ছে মুদারাবাহ জাতীয় চুক্তি। এতে কোম্পানী (মুদারিব) পলিসিহোল্টারদে (رب المال) প্রদত্ত কিস্তি থেকে সংগৃহীত অর্থ মুদারবাহ নীতির ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে থাকে এবং অর্জিত মুনাফা শরীয়তসম্মত চুক্তি অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়।

চার. عقد المشاركة والشركة মুশারাকাহ চুক্তি (বীমা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা বা শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক) :

বীমা কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারদের বা প্রতিষ্ঠাদের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয় যে চুক্তির মাধ্যমে, তাই হচ্ছে মুশারাকাহ বা অংশীদারিত্ব চুক্তি। ইসলামী ফিকহের পরিভাষায় এই প্রকার شركة কে عقد شركة নামকরণ করা

হয়। شركة عقد হচ্ছেঃ عقد بين المتشاركين في الأصل والربح "মূলধন ও মুনাফা উভয়ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বে চুক্তি[৩২]"। এটিকে شركة العنان ও বলা হয়। কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে এর বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিক পরিভাষায় একে شركة المساهمة বা লিমিটেড কোম্পানী বলা হয়।

উপসংহার

শরীয়তের আলোকে ইসলামী বীমার ভিত্তিমূল সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে উপসংহারে এসে আমরা যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছি, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ

১. বীমা ব্যবস্থার ইসলামায়ন সম্পূর্ণরূপে শরীয়ত সম্মত। এ ব্যাপারে পৃথিবীর মুসলিম অর্থনীতিবিদ ও গবেষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন মতানৈক্য আছে বলে আমাদের জানা নেই।

২. সমকালীন পরিবর্তিত জীবনধারার প্রয়োজনে উদ্ভাবিত কোন পদ্ধতি-প্রক্রিয় ও ধ্যান-ধারণাকে প্রথম দৃষ্টিতে প্রত্যাখ্যান না করে তা বিশ্লেষণ করা এবং তাতে ইসলামবিরোধী কোন উপাদান পাওয়া গেলে, তার মূলোৎপাটন করে ইসলামী নীতিমালার আলোকে তাকে ইসলামায়ন করা আমাদের দায়িত্ব।

৩. ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও মৌল নীতি মালার আলোকে বিশ্ববাসীর সামনে নিত্য নতুন আধুনিক কনসেপ্ট উপস্থাপন করার চেষ্টা করা। আমরা যেন নিত্য নতুন চিন্তা, কল্যাণকর কর্মকৌশল উদ্ভাবনের দুয়ার উন্মোচণ করে মানবতাকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে পারি, এজন্যইতো ইসলামের মূলনীতি হচ্ছেঃ الأصل في الأشياء الإباحة। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছেঃ আমরা যেন কেন অনুৎপাদনশীল চিন্তাবৃত্ত থেকে বেড়িয়ে আসতে পারছি না।

৪. বীমা ব্যবস্থার মাধ্যমে যে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার কথা বলা হচ্ছে এটা মূলত ইসলামী জীবনব্যবস্থা কর্তৃক প্রবর্তিত সামগ্রীক আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। তাই সামগ্রীকভাবে ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমেই আমরা কাংখিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারব।

৫. ইসলামী অর্থব্যবস্থা আজ গোটা বিশ্বে বহুল আলোচিত একটি সত্য। তাই সভা-সেমিনার, মসজিদ-মাদ্রাসা-স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র ইসলামী বীমা ব্যবস্থাসহ ইসলামী অর্থব্যবস্থার মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠ্যত্বতা ও জীবন-উপযোগীতা প্রমাণ করা এবং মহামন্দার জন্মদাতা অনৈসলামিক ব্যবস্থাপনাগুলোর অসাড়তা তুলে ধরা আজ আমাদের অনিবার্য দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে ইসলামী জীবনদার্শের আলোকে উজ্জীবিত করুন। আমীন।

---

১ আল-মাওরিদ, পৃ: ৩৫৮।

২ – الشبيلي، د. يوسف بن عبد الله : التأمين التكافلي من خلال الوقف، ص: ৪. المعايير الشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: معايير التأمين الإسلامي، ص: ৩৩৪. الثنيان، د. سليمان : التأمين وأحكامه، (دار ابن حزم، ط الأولى - ১৪২৪هـ)، ص : ৮৩.

৩ কুররা দাগী: التأمين الإسلامي: دراسة فقهية تأصيلية, প: ১৯৯। আরো দেখুন: ড.গরীব জামাল: نحو نظام تأميني إسلامي, পৃ: ৭২। مجلة البنوك الإسلامية, তৃতীয় সংখ্যা -১৯৭৮, পৃ: ৩৪। সিদ্দীক দরীর: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي, পৃ: ৬৪৬। আহমাদ মূলহিম: التأمين الإسلامي, পৃ: ১১০। مجلة المجمع الفقهي الإسلامي, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৪১২হি. পৃ: ১৬২।১৯৩। ড. মুহাম্মাদ আল্-বালতাজী: عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي, পৃ:১৯৩। ড. ওয়াহাবাহ আয-যহাইলী: الفقه الإسلامي وأدلته, ৪/৪৪২। ড. সানহুরী: আল-অসীত, ২/১০৯৯।

৪ ইবুন মাজাহ: আস্-সুনান: كتاب الزهد، باب القناعة, হাদীস নং: ৪১৪১।

৫ বুখারী, كتاب الكفالة، با ب الدين, ৪/৫৫৭, হাদীস নং: ২২৯৮। মুসলিম (بالمعنى), كتا ب الفرائض، با ب من ترك مالا فلورثته, ৬/৬৮, হাদীস নং: ১৫, ১৬/১৬১৯। আবু দাউদ, كتاب الفرائض، با ب في ميراث ذوي الأرحام, ৮/৮৬, হাদীস নং: ২৮৯৭।

৬ মুসলিম, كتا ب الفرائض، با ب من ترك مالا فلورثته, ৬/৬৮, হাদীস নং: ১৭/১৬১৯। আবু দাউদ, كتاب الفرائض، با ب في ميراث ذوي الأرحام, ৮/৮৫, হাদীস নং: ২৮৯৬।

৭ الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية, ৫ম খন্ড, المجلد, بحث مقدم إلى, تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التعاوني, পৃ: ১৯ । الثاني الشرعي، التأمين الاجتماعي في الإسلام, পৃ: ১৩৫ ।

৮ বুখারী:৪৯৯৮ ।

৯ মুসিলম: ২৫৮৬

১০ সহীহ আল্-বুখারী, كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس, হাদীস নং: ২৭৪২ ।

১১ ইমাম তিরমিযী, হাদীস নং: ২৫১৭ ।

১২ তিরমিযী: ২৩৪৫ ।

১৩ بدائع الصنائع, ৭/২৮৬ । الدر المختار , ৫/৪৪২ ।

১৪ مجمع الضمان , পৃ: ২৭০ ।

১৫ بحث في التأمين نشر مجلة نور اليقين، في غزة، في اعدادها من عام ১৯৬৫ حتى أغسطس ১৯৬৬

১৬ ক্বারাফী: ৪/৮ ।

১৭ আল্-ইকতিসাদুল ইসলামী, (১৯৯৫), পৃ:৬০.

১৮ আব্দুহ, ঈসা: التأمين الأصيل والبديل, পৃ: ২০-২১ ।

১৯ محمد بلتاجي: عقد التأمين ص২২৮

২০ ড. মোহা: মাসুম বিলাহ: বাস্তবতার আলোকে ইসলামী জীবনবীমার রূপরেখা, অনুবাদ: মির্জা ওয়ালি উলাহ,(প্রবন্ধ, জাতীয় সেমিনার স্মরণিকা-২০০২, প্রাইম লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী) । পৃ:

২১ দেখুন: কুররাহ দাগী: التأمين الإسلامي , পৃ: ২৩৬ ।

২২ ড. আব্দুল ওয়াহিদ কারাম: معجم المطلحات القانونية, (দারুন নাহদাহ আল্-আরাবিয়্যাহ-১৯৮৭), পৃ: ৩৩৬ । -

২৩ আবু গুদ্দাহ: (بحث مقدم إلى ندوة عالمية حول التأمين التعاوني من خلال نظام الوقف، , نظام التأمين التكافلي من خلال الوقف التي نظمتها الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، في ৬مارس، ২০০৮م)، পৃ:৬ ।

২৪ الهداية مع شرح العناية وتكملة فتح القدير, (কায়রো, প্রকাশনা: মুস্তাফা আল্-হালাবী), ৯/৪০ । شرح الخرشي (প্রকাশনা: বুলাক মাসর-১৩১৮হি), ৭/১০২ । روضة الطالبين ৫/৩৮৪-৩৮৭ ।

২৫ আল্-বাররী, যাকারিয়া : الوسيط في أحكام التركات والمواريث, (দারুন নাহদাহ-১৯৭৭), পৃ: ৫০ । যা'বী, ড. মুহাম্মাদ: عقود التأمين (পিএইচ.ডি থীসিস, আইন অনুষদ, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়-১৪০২হি),পৃ: ৩১৫ ।

২৬ حرير الكلام في مسائل الالتزام، المنقول بنصه في فتح العلي المالك, ১/২১৭ ।

২৭ المغني , ৫/৩৬৭ । نهاية المحتاج, ৪/৮২ । حاشية الدسوقي, ৩/৩২৮ । تبيين الحقائق, ৫/৩৫৩ ।

২৮ আল্-মাবসূত, ১২/৪১ । بدائع الصنائع , ৬/২২০ । فتح القدير , ৬/২২৫ ।

২৯ সহীহ আল-বুখারী (تعليقا بصيغة الجزم), ৫/২৯, হাদীস নং: ৩৬০৮ । তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৭০৩ ।

৩০ ফাতহুল বারী, ৫/৪০৪ । الحاوي الكبير , ৯/৩৮৮ ।

৩১ বুখারী । হাদীস নং: ২৪৮৩ ।

৩২ الموسوعة الفقهية الكويتية (২৬/৩৫) ।

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 75-80)

বুদ্ধিবৃত্তিক রেনেসাঁ ঃ প্রেক্ষিত ইসলামি বিপ্লব

মোহাম্মদ নুরুন্নবী*

প্রাক-কথন:

এক বিংশ শতাব্দিতে ইসলামি বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন বুদ্ধিবৃত্তিক রেনেসাঁ আন্দোলন। দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সব সময় জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। মানব জাতির মধ্যে যে শ্রেণী ও গোষ্ঠী জ্ঞান বা শিক্ষার গুণে অন্যদেরকে ছাড়িয়ে যাবে তারাই সমগ্র মানব জাতির নেতা হতে পারবে। ঠিক যেমন সৃষ্টি জগতের মধ্যে মানুষ অন্য সব সৃষ্টির ওপর এই জ্ঞানের বদৌলতেই খলিফা হতে পেরেছিল। বিগত পাঁচ শতাব্দিতে উম্মাহ সৃজনশীলতা ও এজতেহাদের দ্বারে তালা ঝুলিয়েছিল। ফলশ্রুতীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে উম্মাহ তাগুতি শক্তির সাথে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে বুদ্ধিভিত্তিক ক্ষেত্রে উম্মাতের সামনে কুটনৈতিক চ্যালেঞ্জ, জ্ঞানের ইসলামায়ন ও ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রনয়নের চ্যালেঞ্জ, মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জের মত গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ গুলো বর্তমান। এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা এ শতাব্দিতে বিশ্ব ইসলামী বিপ্লবের পূর্ব শর্তের রূপ পরিগ্রহ করেছে। ব্যাক্তিগত ও বিচ্ছিন্নভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা করে সংগঠিত জাহিলী বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন মোকাবেলা করা সম্ভব নয় এবং যা অবাস্তব পন্থাও বটে। তেমনিভাবে উম্মাহর বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিপ্লবের জন্য রাষ্ট্রভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠন সময়ের অপরিহার্য দাবী ও বিপ্লবের রোডম্যাপ তুল্য। নিম্নে এই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের জনক মুসলিম উম্মাহ:

খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দি থেকে একাদশ শতাব্দি পর্যন্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় মুসলমানরা শীর্ষে ছিল। ইমাম জাফর সাদিক, জাবির ইবনে হাইয়ান, ওমর খৈয়াম, আল বিরুনি, ইবনে সিনা, আল খাওয়ারেযমি প্রমুখ বিজ্ঞানীর অবদানের কথা পাশ্চাত্যের লেখকরাও অস্বীকার করতে পারছে না। অবশ্য পাশ্চাত্যের লেখকরা সুপরিকল্পিতভাবে তাঁদের নাম বিকৃত করে উল্লেখ করার কারণে অনেক পাঠকের কাছে তাদের আসল পরিচয় অস্পষ্ট। এর ফলে অনেক মুসলিম পাঠকও বিভ্রান্ত হয়ে তাঁদেরকে পাশ্চাত্যের মনীষী বলে মনে করেন। কেননা মুসলমানদের অতীত গৌরবজনক ইতিহাস সম্পর্কে অনেক মুসলমানই অবিহিত নন। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আশরাফ আলী "Muslim Contribution to Science and Technology" বইয়ের ভূমিকায় যথার্থই লিখেছেন ঃ

"Most of the Muslims, indeed, do not know about the historic and stupendous contributions that the Muslims have made to Science and Techonology".

মুসলিম তরুন সমাজকে মনে রাখতে হবে যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে ইবেনে সিনা, জাবির, হাসান বিন হাইয়ান, রাযী প্রমুখের বইয়ের ল্যাটিন অনুবাদ ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যায়ের পাঠ্যবই হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসলমানরাই প্রথম রাসায়নিক ঔষধ সমূহকে পিল ও মিকশ্চার হিসেবে ব্যবহার শুরু করেন এবং বড় বড় মুসলিম শহরে হাসপাতাল গড়ে তোলেন। জাবির বিন হাইয়ান রসায়নশাস্ত্রের ভিত্তি রচনা করেন। ইবনে আল হাইসাম ছিলেন সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী। তিনি সর্বপথম জড়তত্ত্ব আলোর প্রতিসরণ তত্ত্ব প্রদান করেন, যা পরবর্তীকালে নিউটনের হাতে পুনরাবিস্কৃত হয়। এ কথা সকলেই জানেন যে, কম্পিউটার আবিস্কার অংকশাস্ত্র নির্ভর। আল খাওয়ারেযমী প্রথম বস্তুর সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিমাপ প্রণয়ন করেন। প্রখ্যাত কবি ওমর খৈয়াম নিউটনের বহু আগের বাইনোমিয়াল থিউরাম আবিস্কার করেন। মুসলিম ভূগোলবিদ ইবনে হাক্কল সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম সম্পূর্ণ মানচিত্র প্রণয়ন করেন। আল বিরুনি, ইবনে বতুতা প্রমুখ মুসলিম মনীষী ভূবিদ্যার প্রসারে যথেষ্ট অবদান রাখেন। আল ফারাবি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ ও দার্শনিক। তিনি প্রায় ৭০টি ভাষায় কথা বলতে পারতেন।

---

* ১ম সেমিষ্টার, এম এ, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

আল কিন্দি গণিত, ভূগোল, ইতিহাস ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ৩৬৯টি গ্রন্থ রচনা করেন। ইবনে খালদুনকে ইতিহাস, দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। ইবনে জরির তাবারি বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক। তাঁর তারিখ আল রাসূল ওয়া আল মুলুক গ্রন্থটি বিশ্বের সর্বত্রই রেফারেন্স হিসেবে পঠিত হচ্ছে। শিল্প কল-কারখানাতেও মুসলমানদের অবদান অনস্বীকার্য। মুসলমানরাই চামড়ার কাগজের পরিবর্তে তুলার তৈরি কাগজের প্রচলন করেন। এর ফলেই ইউরোপে মুদ্রণশিল্পের বিকাশ সাধিত হয়। মুসলিম শাসকরা অতীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। আব্বাসীয় খলিফা মামুন প্রায় ৭ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে বাগদাদে দারুল হিকমাহ নামে একটি বিজ্ঞান কেন্দ্র গড়ে তোলেন। গুলিস্তাঁ ও বোঁস্তার ইসলাম ও আরবি সভ্যতার ইতিহাস বইতে লিখেছেন, "ইউরোপে যখন বই ও পাঠাগারের কোনো অস্তিত্ব ছিল না অনেক মুসলিম দেশে তখন প্রচুর বই ও পাঠাগার ছিল। সত্যিকার অর্থে বাগদাদের বায়তুল হিকমাহ চল্লিশ লক্ষ, কায়রোর সুলতানের পাঠাগারে দশ লক্ষ, সিরিয়ার ত্রিপোলী পাঠাগারে ত্রিশ লক্ষ গ্রন্থ ছিল। অপরদিকে মুসলমানদের সময়ে কেবল স্পেনে প্রতি বছর ৭০ থেকে ৮০ হাজার বই প্রকাশিত হতো।" এ প্রসঙ্গে ড. মরিস বুকাইলী তাঁর গ্রন্থে (The Bible, The Quran and Science) উল্লেখ করেন, অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অনেক উর্ধ্বে তুলে ধরে। যখন খ্রিষ্টীয় জগতে বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের উপর নিষেধাজ্ঞা চলছিল তখন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বহুসংখ্যক গবেষণা ও আবিস্কার সাধিত হয়। কার্ডোভার রাজকীয় পাঠাগারে চার লাখ বই ছিল। ইবন রুশদ তখন সেখানে গ্রীক, ভারতীয় ও পারস্য দেশীয় বিজ্ঞানে পাঠদান করেতন। যার কারণে সারা ইউরোপ থেকে পন্ডিতরা কর্ডোভায় পড়তে যেতেন, যেমন আজকের দুনিয়ার মানুষ তাদের শিক্ষার পরিপূর্ণতার জন্য আমেরিকায় যায়। আমরা আরব সংস্কৃতির কাছে বহুলভাবে ঋণী"।[১] বর্তমান মুসলিম তরুণ সমাজকে অতীত ইতিহাস থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে এবং স্বীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব সৃষ্টির জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও নেতৃত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক :

সর্বপ্রথম ভেবে দেখা দরকার যে, দুনিয়ায় নেতৃত্ব (LEADERSHIP) ও কর্তৃত্ব কিসের উপর নির্ভরশীল? কখনো মিশর নেতৃত্বে আসীন হয় এবং সারা দুনিয়া তার পেছনে চলতে আরম্ভ করে। কখনো ব্যাবিলনের হাতে চলে যায় কর্তৃত্বের চাবি-কাঠি এবং সমগ্র দুনিয়া তার অনুসরণ করে। কখনো গ্রীস নেতৃত্ব লাভ করে আর সারা দুনিয়া করে তার পদানুসরণ। কখনো ইসলাম গ্রহণকারী জাতিগুলোর হাতে যায় নেতৃত্বের লাগাম এবং সারা পৃথিবী তার বশ্যতা স্বীকার করে। আবার কখনো ইউরোপ পায় কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের লাগাম আর সারা দুনিয়ার মানুষ করে তার অনুগত্য। এ সব কেন হয়? কি কারণে নের্তৃত্ব ও কর্তৃত্ব আজ একজন পায় আবার কাল তার হাতছাড়া হয়ে অন্যর হাতে চলে যায়? আবার তার পরের দিন তার থেকেও তা তৃতীয় জনের অধিকারে চলে যায়? এসব কি অনিয়মিত আকস্মিক ঘটনা মাত্র? না এর কোন সুনির্দিষ্ট নীতি আছে এই বিষয় নিয়ে যত বেশী চিন্তা করা যায় ততই কেবল এই উত্তর পাওয়া যায় যে, এর একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে এবং সেই নিয়মটা হল নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সব সময় জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। প্রাণী জগতে একমাত্র মানুষ জ্ঞানের কারণেই এ পৃথিবীর খলিফা হয়েছিল তাকে চোখ, কান ও মন মস্তিস্ক দেয়া হয়েছে। অন্যান্য প্রাণীকে এগুলো হয় আদৌ দেয়া হয়নি নয়তো অপেক্ষাকৃত কম দেয়া হয়েছে। এই জন্য অন্য সমস্ত সৃষ্টির উপর মানুষকে আল্লাহ প্রতিনিধি করেছেন। এখন মানব জাতির মধ্যে শ্রেণী বা গোষ্ঠী জ্ঞান বা শিক্ষার গুনে অন্যদের ছাড়িয়ে যাবে, তারাই সমগ্র মানব জাতির নেতা হতে পারবে। ঠিক যেমন- সৃষ্টি জগতের মধ্যে মানুষ অন্য সব সৃষ্টির উপর এই জ্ঞানের বদৌলতেই খলিফা হতে পেরেছিল। তেমনি ভাবে মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাধান্যের ভিত্তি স্থাপিত হয় চিন্তা-গবেষণা ও জ্ঞান সাধনার ওপর। যে জাতি এ পথে অগ্রগামী সে-ই দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসন অলংকৃত করে, তার চিন্তাধারাই গোটা দুনিয়াকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। পক্ষান্তরে যে জাতি এক্ষেত্রে পেছনে পড়ে থাকে, তাকে স্বভাবতই অন্যের অনুবর্তী ও অনুসারী হয়ে থাকতে হয়। চিন্তাধারা ও মতাদর্শে লোকদের মস্তিষ্কের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার মতো কোনো শক্তিই বাকি থাকেনা। জ্ঞানসাধক ও সত্যানুসন্ধিৎসু জাতির শক্তিশালী চিন্তা ও মতবিশ্বাসের বন্যাপ্রবাহ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবার মতো শক্তি-সামর্থ্য পর্যন্ত তার মধ্যে বর্তমান থাকেনা। মুসলমানরা যতোদিন সত্যানুসন্ধিৎসা ও জ্ঞান সাধানার পথে অগ্রসর ছিল, ততোদিন দুনিয়ার সকল জাতি তাদের অনুসরণ ও অনুবর্তন করে চলছে। ভালো-মন্দ, সুকৃতি-দুষ্কৃতি, ভ্রান্তি অভ্রান্তি সম্পর্কে ইসলামের নির্ধারিত মানদন্ড সজ্ঞানে হোক আর অজ্ঞানে সমগ্র দুনিয়ার কাছে একমাত্র মানদন্ড হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। আর দুনিয়ার লোকেরা কি ইচ্ছায়, কি

অনিচ্ছায় তাদের চিন্তাধারা ও কর্মকান্ডকে সেই মানদন্ডের আদলেই গড়ে তুলেছিল। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে চিন্তানায়ক ও গবেষকের আবির্ভাব যখন বন্ধ হয়ে গেলো, তারা ত্যাগ করলো চিন্তা-ভাবনা ও সত্যানুসন্ধিৎসা এবং জ্ঞান-সাধনা ও চিন্তা গবেষণার ক্ষেত্রে ক্লান্ত হয়ে পড়লো, তখন তারা দুনিয়ার নেতৃত্ব থেকেই যেন অবসর গ্রহণ করলো। অন্যদিকে পাশ্চাত্য জাতিগুলো এই সকল ক্ষেত্রেই দ্রুতবেগে এগিয়ে চললো। তারা চিন্তা গবেষণার শক্তিকে কাজে লাগালো, বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উদঘাটনে আত্মনিয়োগ করলো, প্রকৃতির আন্তর্নিহিত শক্তিগুলোর উৎস সন্ধান করলো। এর অনিবার্য পরিণতি যা হবার তা-ই হলো। পাশ্চাত্য জাতিগুলো দুনিয়ার নের্তৃত্ব আসন দখল করে বসলো। এক সময় যেভাবে দুনিয়ার লোকেরা মুসলমানদের কর্তৃত্বের সামনে নতি স্বীকার করেছিল, তেমনি তাদেরকেও পাশ্চাত্য জাতিগুলোর কর্তৃত্ব মেনে নিতে হলো। চার পাঁচ শতক পর্যন্ত মুসলমানরা তাদের পূর্ব পুরুষদের বিছানো সুখশয্যায় অঘোরে ঘুমাচ্ছিল, আর পাশ্চাত্য জাতিগুলোর ছিলো নিজেদের উন্নয়নের কাজে লিপ্ত। এরপর সহসা পাশ্চাত্য শক্তিগুলোর অভ্যুত্থান ঘটলো এবং মাত্র এক শতকের মধ্যেই তারা গোটা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়লো। ঘুমের ঘোরে চোখ মেলে তাকিয়েই মুসলমানগণ দেখতে পেলো, খ্রীষ্টান ইউরোপ লেখনী ও তরবারি উভয় দিক থেকেই সুসজ্জিত, আর এই দ্বিবিধ শক্তির সাহায্যেই তারা গোটা দুনিয়ার ওপর কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। একটি ক্ষুদ্রাকৃতির দল এর মোকাবিলায় প্রতিরক্ষার চেষ্টা করলো, কিন্তু তার না ছিলো লেখনী শক্তি আর না ছিলো তরবারির তেজ। ফলে তারা শুধু পরাজয়ই বরণ করতে লাগল। জাতির বাকী অংশ অর্থ্যাৎ সংখ্যাগুরু দলটি যে কর্মনীতি অবলম্বন করলো, দূর্বল ও কাপুরুষরা চিরকাল তা-ই করে থাকে। তরবারির তেজ, যুক্তির বল, বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য-প্রমাণের সমর্থন এবং চোখ ধাঁধানো রূপ-সৌন্দর্যসহ যে ধ্যান ধারণা, মতাদর্শ ও রীতিনীতি পাশ্চাত্য থেকে এলো, আরামপ্রিয় মস্তিষ্ক ও পরাভূত মানসিকতা তাকে একেবারে ঈমানের মর্যাদা দিয়ে বসলো। যে সব পুরানো ধর্মবিশ্বাস, নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক আইনকানুন নিছক গতানুগতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো, এই নতুন ও শক্তিশালী বন্যার স্রোতে তা খড়কুটোর মতো ভেসে গেলো। আর চেতনাহীনতার এইপথে লোকদের মন-মগজে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, পাশ্চাত্য থেকে যা কিছু আসে তাই সত্য এবং তা-ই হচ্ছে সত্যতা ও বিশুদ্ধতার এক মাত্র মানদন্ড। পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের কারণে এরূপ হয়েছে।[২]

উম্মাহর বর্তমান বুদ্ধিবৃত্তিক পরিস্থিতিঃ

মুসলিম জাতির নের্তৃত্ব ও কর্তৃত্ব হারানোর পর ইউরোপ শিক্ষার ময়দানে অগ্রগামী হলো। অনিবার্য কিছু কারণে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠলো খোদাদ্রোহী। এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই তারা সংগ্রহ করলো শ্রুতিলব্ধ জ্ঞান পুঁজি। ঐ (খোদাদ্রোহী) দৃষ্টিভঙ্গিতেই প্রাকৃতিক জগতকে পর্যবেক্ষণ করে নবতর জ্ঞান অর্জন করলো। আর এই উভয় জ্ঞানের সমন্বয় ও বিন্যাস ঘটিয়ে তার নির্যাস গ্রহণ করলো। একই দৃষ্টিভঙ্গিতে তারপর তারা মানব জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নৈতিক নীতিমালা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের নিয়ম বিধি-বিধান, রীতি-প্রথা এবং ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনের আচার-আচারণের পদ্ধতি ও ঐ দৃষ্টিভঙ্গিতেই রচনা করলো। স্বাধীন গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানের ফলে অর্জিত ক্ষেত্রেও নির্ণয় করলো ঐ একই দৃষ্টিভঙ্গি (খোদাদ্রোহী)। অবশেষে এই জ্ঞানের বলে বলীয়ান হয়ে যখন তারা আধিপত্য বিস্তারে অগ্রসর হলো তখনো একদেশ অপর দেশের উপর এক জাতি অপর জাতির উপর নতজানু হতে লাগল, ক্রমেই এতদূর গড়ালো যে সময় একটি শিশুর বোধশক্তির উন্মেষ ঘটে ঠিক সে সময় থেকেই তার মন-মগজ ও স্বভাব চরিত্রে ইউরোপবাসি মনোনীত ও পরিকল্পিত নীল নকশা অনুসারে গঠন করা হয়।

বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার কোর'আনিক পদ্ধতিঃ

আল্লাহ তা'আলা বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার একটি কৌশল বর্ণনা করেছেন পবিত্র কুরআনে "সামআ" শ্রবণ শক্তি, "বাছরা" অর্ন্তদৃষ্টি এবং "ফুয়াদ" উপলব্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। "সামআ" দ্বারা বুঝানো হয়েছে তথ্য সংগ্রহ করা, "বাছরা" অর্থ নিজে পর্যবেক্ষণ করে তথ্য উদ্ধার করা বা এনালাইসিস করা এবং "ফুয়াদ" অর্থ হচ্ছে ঐ দুই মাধ্যম দ্বারা অর্জিত তথ্যের সমন্বয় সাধন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এই তিনটি জিনিসের সমাবেশেই জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে যা কেবল মানুষকেই দেয়া হয়েছে। সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে প্রত্যেক মানুষই এ তিনটি শক্তি ব্যবহার করছে। একটা গোষ্ঠী মানব জাতির নেতা হয় তখনই, যখন তারা একদিকে অতীত ও বর্তমান কালের মানুষের কাছ থেকে যত বেশি তথ্য যোগাড় করে অপরদিকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আরো বেশি তথ্য সংগ্রহে নিয়োজিত থাকে। অতঃপর এই দুই রকম তথ্য সংগ্রহ করার পর তা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তা বাস্তবায়ন করে। তাদের পর্যবেক্ষণে আগের যে সব জিনিস ভুল বলে প্রমানিত হয় তারা তার সংশোধন করে। যে

সব নতুন তথ্য জানতে পারে তা যথা সম্ভব বেশি করে কাজে লাগায়। আর যে জনগোষ্ঠীর মাঝে অপেক্ষাকৃত তা কম হয় তাদের জন্য আল্লাহর অকাট্য ফয়সালা হলো তারা অন্যদের আনুগত্য এবং অনুকরণ করবেই। পরাধীনতা থেকেই সৌভাগ্যবশতঃ বেঁচে গেলেও অনুকরণ থেকে রেহাই পাবেনা।

বুদ্ধিবৃত্তিক স্থবিরতার স্বরূপ ও ইসলামী বিপ্লবঃ

যখন কোন জাতির পতনের যুগ ঘনিয়ে আসে তখন তারা তাদের অতীতের অর্জিত জ্ঞানকে যথেষ্ট মনে করতে থাকে। নিজেদের মন মগজকে ব্যবহার করে আরো বেশি সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা ত্যাগ করে। তারা শুধু-অতীতের জানা তথ্য ভান্ডারকেই যথেষ্ট মনে করে এবং অতীতের গৃহীত মতামত সমূহ কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন বা সংশোধনের প্রয়োজন মনে করে না। এই ভুল ধারণায় তারা ডুবে থাকে এই পর্যায়ে উপনীত হয়েই এই গোষ্ঠী আপনা আপনি নেতৃত্বের আসন থেকে সরে যায়। আর সরতে না চাইলে জোর করে হটিয়ে দেওয়া হয়। এরূপ অবস্থাকে আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধিকতা ও স্থবিরতা বলতে পারি। বর্তমান মুসলিম উম্মাহ এই রোগে আক্রান্ত।

বুদ্ধিবৃত্তিক পশ্চাদপদতার পরিণাম মানসিক গোলামীঃ

আধিপত্যের মত গোলামী ও পরাধীনতাও দু প্রকার। প্রথমটি মানসিক ও দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক। কোন জাতি চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, জ্ঞান সাধনা ও তথ্যানুসন্ধানের পথে অগ্রসর হলে তার মানসিক উন্নতির সাথে সাথে তাদের বৈষয়িক উন্নতি অর্জন করে। জ্ঞান গবেষণার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়লে মানসিক অবনতির সাথে সাথে তার বৈষয়িক অধঃপতনও শুরু হয়।[৩] আধিপত্ত্ব-শক্তিমত্ত্বা ও পরাধীনতার শিকার হতে থাকে। বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্যতাই তাদের এই পরাধীনতার ফল।

বুদ্ধিবৃত্তিক চাহিদা বস্তুগত চাহিদার উপর প্রাধান্য পাবেঃ

মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কমপক্ষে দু ধরনের প্রয়োজন রয়েছে। প্রথমত রয়েছে বস্তুগত প্রয়োজন, যেমন- খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়, পোশাক, ঔষধ চিকিৎসা ও এই ধরনের অন্যান্য প্রয়োজন এই পর্যায়ে গণ্য। দ্বিতীয়ত বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজন সমূহ শিক্ষালাভ, জ্ঞানার্জন, সাহিত্য, শিল্পকলা, দার্শনিক চিন্তাভাবনা, অনুমান, বিশ্বাস, আদর্শ, ধর্মপালন, নৈতিকতা ইত্যাদি। মানুষ যে অবস্থায় থাকুক না কেন, এই দু ধরনের প্রয়োজনের মধ্যে অগ্রবর্তী কোনটি? মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক চরিতার্থতা তার প্রকৃতিতে দৈহিক চরিতার্থতা ও আকর্ষনাবলীর তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী।[৪]

বুদ্ধিবৃত্তিক মৌলিক চ্যালেঞ্জ সমূহ :

ক) ওরিয়েন্টালিজম সহ বুদ্ধিবিত্তিক আগ্রাসন মোকাবেলার চ্যালেঞ্জ।

খ) সাংস্কৃতিক ও তথ্য সন্ত্রাস মোকাবেলার চ্যালেঞ্জ।

গ) জ্ঞানের ইসলামীকরণ ও জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রাধান্যের চ্যালেঞ্জ।

• ওরিয়েন্টালিজম সহ বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন মোকাবেলার চ্যালেঞ্জ এর বিবরণঃ

ইসলাম, কুরআন ও সুন্নাহকে নানান ভাবে ওরিয়েন্টালিষ্টরা বিকৃত ভাবে উপস্থাপন করছে। প্রাচ্যবীদ এডওয়ার্ড ডাব্লিউ সাঈদ ওরিয়েন্টালিজমকে উপনিবেশবাদী ও সম্রাজ্যবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৫] এছাড়া কোরআন ও সুন্নাহ এর ব্যাখ্যায় নানান ইসরাইলী রেওয়ায়েত পেশ করা হয়েছে। মূর্খ মুসলমানকে মিসগাইড করা, পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে কুটনৈতিক আগ্রাসন, মেধাবীদের অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করে মুসলমানদের বিরূদ্ধে ব্যবহার, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও বর্তমান সময়ে আর একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের রূপ পরিগ্রহ করছে।

• সাংস্কৃতিক ও তথ্য সন্ত্রাস মোকাবেলার চ্যালেঞ্জের বিবরণঃ

ইহুদীরা তথ্য সন্ত্রাসের জনক ও অগ্রদূত।[৬] মুসলমানদের বিরূদ্ধে ইহুদীরা যে কত নিষ্ঠাবান শত্রু তা মূসা (আঃ) এর আমল থেকে এই পর্যন্ত হাজার হাজার ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত। এই তথ্য সন্ত্রাসের মাধ্যমে ঘটনার মোড়কে সম্পূর্ণ উল্টিয়ে দিচ্ছে। ইসলামের জেহাদকে "জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নামে" আখ্যা দিয়ে প্রকৃত অর্থে উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে মিডিয়া ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্থ করছে। এগুলোই সুস্পষ্ট তথ্য সন্ত্রাস। মানব কল্যাণমূখী মিডিয়া সৃষ্টি ও তথ্য সন্ত্রাসের বিরূদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপও আজ উম্মার জন্য আরেকটি বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ।

• জ্ঞানের ইসলামীকরণ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রাধান্যের চ্যালেঞ্জের বিবরণঃ

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রনয়নের পূর্বশর্ত হলো জ্ঞানের ইসলামায়ন। ১৯৭৭ সালে এ আন্দোলন শুরু হয়[৭]। সমকালীন বিশ্বে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলোতে যে সকল সাবজেক্টএ অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স চালু আছে, এ গুলোর ইসলামায়নের জন্যও প্রয়োজন হবে শতাধিক মিশনারী স্কলারর্স। এছাড়া সামগ্রিকভাবে উম্মাহর জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রসরতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্যও প্রয়োজন শতাধিক মিশনারী স্কলারর্স। যা ব্যতিরেকে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী উম্মাহর বিশ্ব নেতৃত্বপ্রদান ও বিশ্বজনীন বিপ্লব আশা করাটা হবে অবাস্তব কল্পনাবিলাশ মাত্র।

প্রয়োজন বুদ্ধিবৃত্তিক রেনেসাঁ আন্দোলন ও সংগঠন:

ইতিপূর্বে আমরা নেতৃত্বের পরিবর্তনে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার গুরুত্ব আলোকপাত করেছি। প্রকৃত ব্যাপার হল বাতিল মোকাবেলা করে সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ পবিত্র কোরআনে জিহাদের দুটো ধারার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

"দাওয়াত ভিত্তিক জিহাদ" ও "বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদ"

পবিত্র কুরআনের সূরা তাওবায় ১২২নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা যে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন তা বঞ্চিত মুসলিম উম্মাহর হারানো বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের প্রত্যাবর্তন ও প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকার জন্য সামগ্রিক ভাবে বিশ্বজনীন ইসলামী বিপ্লবের জন্য রোডম্যাপ হিসেবে যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালা বলেন

"ইমানদারদের সকলেই বাহির হইয়া পড়া জরূরী ছিলনা। কিন্তু এই রূপ কেন হইল না যে, তাহাদের অধিবাসীদের প্রত্যেক অংশ হইতে কিছু লোক বাহির হইয়া আসিত ও দ্বীনের জ্ঞান লাভ করিত এবং ফিরিয়া গিয়া নিজ নিজ এলাকার অধিবাসীদের সাবধান করিত যেন তারা বিরত থাকে ও সতর্কতা অবলম্বন করে"।

এই আয়াতটির তাৎপর্য বুঝিবার জন্য এই সূরারই ৯৭নং আয়াতটি সামনে রাখিতে হইবে। সে আয়াতে বলা হয়েছে বেদুঈন আরবরা কুফর ও মুনাফিক হইতে অত্যন্ত শক্ত এবং তাহাদের ব্যাপারে ইহার সম্ভাবনা বেশি যে তাহারা সেই দ্বীন এর সীমা ও আইন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকিয়া যাইবে, যাহা আল্লাতায়ালা তার রাসুলের প্রতি নাযিল করিয়াছিলেন। গ্রামের জনতার মূর্খতা দূর করার জন্য ঘর-বাড়ি ছাড়িয়া মদীনায় চলিয়া আসিতে হইবে এবং এখানে উপস্থিত হইয়া সকলকে ইলম হাসিল করিতে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। ইহার পরিবর্তে বরং প্রতিটি গ্রাম-অঞ্চল হইতে প্রতিটি গোত্র-বংশ হইতে কিছু সংখ্যক লোক যদি মক্কা মদীনায় ও এই ধরনের অন্যান্য জ্ঞানকেন্দ্র সমূহে চলিয়া আসে ও এখানে আসিয়া দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করে অতঃপর নিজেদের অঞ্চলে ফিরিয়া গিয়া সেখানকার জনগণের মধ্যে দ্বীন সম্পর্কে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিবে।[৮] এই আয়াতে বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব, চিন্তা ও মনস্তাত্ত্বিক সংকট মোকাবেলার জন্য আল্লাহ তায়ালা তিন দফা স্থায়ী কর্মনীতি দিয়েছেন। যে কর্মনীতির মাধ্যমে মানবতার যে কোন বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা মোকাবেলা করে তাগুতী শক্তির উপর বুদ্ধিবৃত্তিক বিজয় নিশ্চিত করা সম্ভব।

১ম দফা ঃ নফরুত তয়িফা বা বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠন, সংঘ ও গ্রুপ প্রতিষ্ঠা।

২য় দফা ঃ তাফাক্কুহ ফিদ দ্বীন বা দ্বীনের বিষয়ে গবেষণা করা।

৩য় দফা ঃ ইন্যারুল কাউম বা সম্প্রদায়কে সতর্ক করা ও (জাহিলীয়াত সম্পর্কে) ভয় দেখানো।

এই তিন দফা কর্মনীতির বিস্তারিত বিবরণ হলো এই যে, যেকোন ফিরকা বা মানব গোষ্ঠী থেকে একটি "ত্বা-ইফা" বা উপদল, গ্রুপ প্রথমে একত্রে সংগঠিত হবে। যারা সংঘবদ্ধ হওয়ার মুল লক্ষ্যই হবে ইনযারুল কাওম বা মানুষকে সত্যের পথ দেখানো এবং অসত্য থেকে ভীতি প্রদর্শন। বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব কখনও সংগঠন, সংস্থা নূন্যতম একটা গ্রুপের সামষ্টিক প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। "ফেরকা" বলতে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠিকে যেমনি বুঝায় তেমনি নির্দিষ্ট সেক্টর, এবং মানব জীবনে বিভিন্ন দিক ও বিভাগকেও বুঝাতে পারে। অতএব বুঝা গেল বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রভিত্তিক, অঞ্চল ভিত্তিক এবং সেক্টর ভিত্তিক একটা গ্রুপ বা সংগঠন প্রথমত সৃষ্টি করতে হবে। তারা জাগতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সংগঠিত হবে না। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্যই হবে মানুষকে জাহিলিয়াতের হাত থেকে রক্ষা করা, সত্যের পথ প্রদর্শন করা এবং সত্যের উপর মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের পূর্নবিন্যাস। বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার দ্বিতীয় কর্মনীতি ও কর্মসূচী হলো মানব জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ গবেষণা করা। ফিকহ ফিদ দ্বীন বলতে শুধু পরিভাষায় ফিকহকে বুঝায়না। বরং ফিকহ বলতে আল্লাহর নিদর্শনাবলীর গবেষণা, সৃষ্টি তত্ত্বের গবেষণা, মানব জীবনের প্রত্যেক দিক ও বিভাগ নিয়ে গবেষণা, সমাজের উত্থান-পতনের গবেষণা, সমকালীন সমস্যা চিহ্নিত করণ ও এর সমাধান নিয়ে গবেষণা সহ মানব

জীবনের প্রয়োজনীয় সার্বিক গবেষণাকে অন্তর্ভূক্ত করে [৯]। এছাড়া নিত্য নতুন আবিস্কার, মানুষের ভুল ধারণা অপসারণ, মানুষের চিন্তার পরিশুদ্ধি, গণ সচেতনতা সৃষ্টি, মানুষকে সৃষ্টির মৌলিক উদ্দেশ্যের দিকে কেন্দ্রীভূত করার বুদ্ধিবৃত্তিক সামগ্রীক প্রয়াস ও 'তাফাক্কুহ ফিদ দ্বীন' এর অন্তর্ভূক্ত। বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব সাধনে আল-কোরআনে ঘোষিত তৃতীয় কর্মনীতি হল ইন্‌যারুল কাওম বা নিজের সম্প্রদায় জাতি জনগোষ্ঠী ও নিকটবর্তী পরিবেশকে জাহিলিয়াত সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করবে। এর দ্বারা মূলতঃ Theorical Intelectuality কে বুঝায় না। বরং Practicing Intelectuality কে বুঝায়। কারণ আল্লাহ তায়ালা কওম থেকে বিচ্ছিন্ন কোন গবেষণাকে গ্রহণ করেন না। যে গবেষণা শুধু তত্ত্বের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকে, ইন্‌যারুল কাউম এর দায়িত্ব পালন করতে পারে না এবং সমাজ পরিবর্তন করতে পারে না। সেরূপ গবেষণা ও প্রতিভার অপচয়কে আল-কোরআন কঠোর ভাবে নিষেধ করেছে। আয়াতের শেষের অংশের দ্বারা সমাজকে বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবে সংস্কার প্রচেষ্টা চালানোর কথা বলা হয়েছে। কারণ এরূপ বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কার প্রচেষ্টা চালালে মানুষ জাহিলিয়াতের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়া থেকে নিজেদেরকে আত্মরক্ষা করতে পারবে এবং সমাজে নিজেদের প্রয়োজনীয় ভূমিকার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে। এছাড়া তাগুতী শক্তি তাদের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাবে নিজেরা আতংকিত হবে ও কোনঠাসা হয়ে যাবে। এই তিনটি কর্মনীতির সফল বাস্তবায়ন সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লবের জন্য খোদা প্রদত্ত রোডম্যাপ।

যবনিকা:

ইকামাতে দ্বীন ও বিশ্বজনীন বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে বিশ্বনেতৃত্ব খোদাদ্রোহী কুফুরী শক্তির হাত থেকে মুত্তাকী লোকদের নিয়ন্ত্রণে আনার পূর্বশর্ত হলো বুদ্ধিবৃত্তিক রেনেসাঁ আন্দেলন। যদিও উম্মাহর মধ্যকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ে সময়ের স্বল্পতা এবং মিশ্র আদর্শিক শিক্ষানীতির কারণে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় গুলো অনেকাংশে উম্মাহর বুদ্ধিবৃত্তিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে। তাই বর্তমান সময়ের অপরিহার্য দাবি হল প্রত্যেক রাষ্ট্রে দা'ওয়াত ভিত্তিক সংগঠনের পাশাপাশি স্বতন্ত্র বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা। যে সংগঠনের কর্মীগণ তাদের সমগ্র জীবনকে বুদ্ধিবৃত্তিক রেনেসাঁর জন্য কুরবান করে দেবেন। তাহলেই মুসলিম উম্মাহ বুদ্ধিবৃত্তিক হারানো ঐতিহ্য পূনরুদ্ধার করে সমগ্র দুনিয়াকে চলমান "যুলুমতন্ত্র" থেকে রক্ষা করে অনাবিল শান্তি ও সাম্যের ইনসাফ ভিত্তিক ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা বা খিলাফাতে ইলাহিয়া প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

তথ্য সূত্র ঃ

---

১ **আবদুদ দাইয়ান মোহাম্মদ ইউনুছ**, ক্যারিয়ার গঠন ও মান উন্নয়ন, (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, এপ্রিল, ২০০৫), পৃষ্ঠা: ২৪ ও ২৫

২ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, শিক্ষা ব্যবস্থা: ইসলামী দৃষ্টিকোণ, (ঢাকা: ইসলামী এডুকেশন সোসাইটি, ২০০৫সাল), পৃষ্ঠা: ৪৮ও ৪৯

৩ **সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী**, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব, (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, নভেম্বর ২০০৪), পৃষ্ঠা: ০৭।

৪ **মাওলানা আব্দুর রহীম**, ইসলামের ইতিহাস দর্শন, (ঢাকা: খাইরুন প্রকাশনী, মে ২০০৩), পৃষ্ঠা: ৯৭।

৫ বেনজিন খান, এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ, ঢাকা সংবেদ প্রকাশনা, এপ্রিল ২০০৫, পৃষ্ঠা: ১৭১।

৬ জহুরী, তথ্য সন্ত্রাস, (ঢাকা: উতলু প্রকাশনা, মার্চ ১৯৯৯), পৃষ্ঠা: ১২১ - ১৩২।

৭ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক স্মারক ২০০৪, (ঢাকা: আই. সি. এস. প্রকাশনা), পৃষ্ঠা: ৪৭।

৮ **সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী**, তাফহীমুল কোরআন, পঞ্চম খন্ড, (ঢাকা: খাইরুন প্রকাশনী, ১৯৭৯), পৃষ্ঠা: ৯২ - ৯৩।

৯ **ডঃ ইউসুফ আল কারজাভী**, আওলাবিয়াত ফিল হারাকাত আল ইসলামিয়াহ, (কায়রো: দারুন নশরি ওয়াত তাওজিহ, মাকতাবাহ ওয়াহবাহ, ১৯৯১), পৃষ্ঠা: ২৪।

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 81-90)

আরাকানে মুসলিম নির্যাতন ও আমাদের করনীয়

আব্দুর রহিম*

ভূমিকাঃ

যে হারে জঙ্গিবাদী মৌলবাদী অপবাদ দিয়ে দেশের পর দেশ দখল করে ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত করা হচ্ছে, মানুষের উপর পশু-পাখির চেয়ে নিকৃষ্ট ভাবে নির্যাতন চালানো হচ্ছে, যখন যাকে যেখান থেকে ইচ্ছা গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হচ্ছে, নির্মম নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হচ্ছে আজ ইরাক, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, আরাকানবাসীকে। তাতে মনে হয় অদুর ভবিষ্যতে পৃথিবীতে কিছু মানুষ রুপি হায়েনা ব্যতীত আর কারো অস্তিত্ব থাকবেনা। আমরা গুয়ান্তনামো'বে কারাগারে সন্দেহভাজন (!) আল-কায়েদা (?) অপবাদ দিয়ে নিরীহ কিছু মানুষের উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্যাতনের হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখেছি, দেখেছি ইরাকের বাগমারা কারাগারে ইরাকিদের ওপর পরিচালিত মার্কিন বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের চিত্র, আফগানিস্তানে তালেবান অপবাদ দিয়ে নিরীহ গ্রামবাসীর ওপর দখলদার বাহিনীর পৈশাচিক বিমান হামলাও বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে, আমরা ফিলিস্তীনিদের উপর ইহুদিদের প্রকাশ্য ও আরাকানে মুসলামনদের উপর পরিচালিত মিয়ানমারের জান্তা সরকারের নীরব গণহত্যাও দেখেছি, তাছাড়া কাশ্মীর, চেচনিয়া, ফিলিপাইন,ও থাইল্যান্ডেও মুসলিম দমন অভিযানের খবর বিভিন্ন সময় মিড়িয়ার কল্যাণে জানা যায় --- এতে কেউ যদি অদুর ভবিষ্যতে পৃথিবীতে মানব জীবের অস্তিত্ব নিয়ে আশংকা প্রকাশ করে, তবে তার এই আশংকা একেবারে অমূলক হবে না। মানুষ হয়েও অন্য কোন দূর্বল মানুষকে মানুষ মনে করে তাদের পক্ষে দুচারটা কথা বলার জন্য আমাদের বিবেক তাড়া দেয়না। ফলে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচারের কদর্য উদাহরণের সঙ্গী হয়ে অস্তিত্বহীনতার আশঙ্কার মধ্যে কোনরকমে বেঁচে আছে। না হলে আরাকানে (বার্মায়) আজ এসব কি হচ্ছে! ইরাক, আফগানিস্তানে যা হচ্ছে, তা পৃথিবীর সব মিডিয়ায় স্থান পায়। কিন্তু ব্রার্মায় আরাকান রাজ্যে পৃথিবীর সব মিডিয়ার দৃষ্টির অগোচরে সামরিক জান্তা কর্তৃক আরাকানের অধিবাসী বিশেষ করে মুসলমানদের উপর নির্যাতনের যে ষ্টীম রোলার চালানো হচ্ছে, তা পৃথিবীর অন্য দেশ কেন,মিয়ানমারের প্রতিবেশী আমাদের এই বাংলাদেশের অনেক মিডিয়ার সংবাদকর্মীরাই জানেন না। না জানারই কথা, মিয়ানমারের জান্তা সরকার সব ধরণের মিডিয়াকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, যাতে তার নির্যাতনের সংবাদ বহিঃর্বিশ্বে প্রকাশ না পায়। যেমন আমরা দেখেছি, মিয়ানমারে গণতন্ত্রের দাবীতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিক্ষোভ আন্দোলনের সময় পেশাদারী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিহত জাপানী সংবাদিকের কোন বিচারই হয়নি।

আরাকানে মুসলমানদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যঃ

মূলতঃ মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের সেদেশের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করেনা। তাদের চিন্তাধারা হল- বার্মা হবে মুসলিম মুক্ত দেশ। এদেশে কোন মুসলমান থাকতে পারবেনা। রোহিঙ্গারা যেহেতু মুসলিম এবং অশিক্ষিত ও একটি অনুন্নত প্রদেশে বাস করে তাই তাদের ওপর চলে জান্তা সরকারের নিয়মিত ও রুটিন মাফিক নির্যাতন। যা বিশ্বের অনেকেই জানেনা। জানে শুধু অং সান সু চি'র ব্যাপারটা। তাই রোহিঙ্গারা সবকিছু ছেড়ে নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে নিতান্তই প্রাণ রক্ষার্থে আমাদের দেশে চলে আসে। আর আমরা পড়েছি রোহিঙ্গা বিষয়ক বিরাট এক সমস্যায়, যার গ্রহণযোগ্য সমাধান এখনো কেউ দিতে পারে নাই।

---

* ৫ম সেমিস্টার, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

কোন জাতির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় সে জাতির বা দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করে। আমরা যদি রোহিঙ্গা বা আরাকান প্রদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তাহলে রোহিঙ্গাদের পরিচয়ের পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবে এ সমস্যার সমাধান করা সহজ হয়ে যাবে।

মূলতঃ সপ্তম-অষ্টম শতাব্দি থেকে আরাকানে মুসলিম বসতি শুরু। ইতিহাস থেকে জানা যায়- আরবের বণিকরাই আরাকানে ইসলাম প্রচার ও মুসলিম বসতি স্থাপন করেন। আরবের বণিকদের দ্বারা ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি বাংলার সুলতান জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহের সহযোগিতায় আরাকানরাজ নরমিখলা বা মোহাম্মদ সোলাইমান শাহ কর্তৃক ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে আরাকান পুনরুদ্ধারের পর মুসলিম প্রভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। বৃটিশ শাসনামলে বাংলাদেশ ও ভারত থেকে কাজের সন্ধানে আগত মুসলমানরাও সেখানে বসতি স্থাপন করে বসবাস শুরু করেন। ১৭৫৭ সালে পলাশীর পরাজয়ের পর মুসলমানদের দূর্বলতার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বর্মিরাজ বোধাপায়া আরাকান দখল করে নেন। ১৯৩৭ সালে বৃটিশ প্রশাসন কর্তৃক Home Role জারি এবং ১৯৪০ সালে মুসলমান কর্তৃক গৌতম বুদ্ধের অবমাননার মিথ্যা অভিযোগ এনে সরকারী মদদে স্থানীয় মগরা মুসলিম নিধনে নেমে পড়ে এবং ১৯৪২ সালে সংগঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রায় এক লাখ মুসলমানকে হত্যা ও পাঁচ লাখ আরাকানী মুসলমানকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করে। পরে স্বাধীনতা উত্তর বার্মার শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন অজুহাতে তাদেরকে আরাকান বা মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে স্বীকার না করে শুধুমাত্র আরাকানের বাসিন্দা বলে ঘোষণা দেয়। পরে মুসলমানদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর রাত ৮.০০ টায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী উ-নু রেডিওর মাধ্যমে রোহিঙ্গাদেরকে স্বদেশী হিসাবে ঘোষণা করলেও তা ছিল তার রাজনৈতিক কৌশলমাত্র। ১৯৭৮ সালে মিয়ানমার সরকারের নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রায় তিন লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করলে আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের চাপ ও তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমানের জোর কূটনৈতিক তৎপরতায় মিয়ানমারের সামরিক শাসক নে-উইন কে কঠিন সমস্যার মধ্যে ফেলে দেয়। ফলে সে রোহিঙ্গাদেরকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু মুসলিম দমন অভিযান থেমে থাকেনি। তারই অংশ হিসাবে ১৯৮২ সালে বিবর্তনমূলক বর্ণবাদী নাগরিকত্ব আইন করে রোহিঙ্গাদেরকে ১৮৩২ সালের পরে আগত বলে মিথ্যা অজুহাতে আরাকানের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়।

অথচ মুসলমানদের আরাকানে বসবাস সেই সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু। মুসলমানরা যে আরাকানের নাগরিক, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় বিশ্ববিখ্যাত ইবনে বতুতার ভ্রমণ কাহিনীতে। তিনি বার্মায় ভ্রমণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছেন- "১৫ দিন সমুদ্র যাত্রার পর আমাদের জাহাজ জুং বারাহ নগর নামে এক দেশে পৌঁছল (বার্মার পশ্চিম উপকূলীয় কোন এলাকা)। এখানকার লোকজন আদিম গুনপ্রকৃতির। কোন ধর্মকর্ম নেই। উপকূলীয় এলাকায় খড়ের তৈরি ঘরে বাস করে। আশ্চর্যের ব্যপার হল- পুরুষরা উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করে, আর নারীরা গাছের পাতা দিয়ে লজ্জাস্থান ঢেকে রাখে। এদেশে আলাদা জায়গায় বাংলা ও জাভা থেকে আসা অনেক মুসলমানও বাস করে । *গত ৮ই এপ্রিল ২০০৯ রোজ বুধবার আমার দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় কলামিস্ট ও শিক্ষাবিদ ইবনে গোলাম সামাদের "*মিয়ানমারের কাটাতারের বেড়া*" শীর্ষক লেখাটিতে ফুটে উঠে আরাকানে মুসলমানদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথা। তিনি লিখেছেন- " আরকানের সব মুসলমান বাংলাদেশ থেকে যায়নি। মুসলমানদের আরো একটি উৎসও ছিল। আরাকানের অনেককে দেখা যায় দুটি করে নাম- একটি হল আরাকানী ভাষায়, অন্যটি হল মুসলিম। অর্থাৎ আরবী অথবা ফার্সি ভাষায়। আরাকানের এসব রাজা সিংহাসনে আরোহনের সময় মুসলিম নাম গ্রহণ করতেন। আরাকানের শেষ রাজা যার নাম ছিল- মিন থামা উংগা, তার মুসলিম নাম হল- হোসেন শাহ (১৬১২-১৬২২ খৃঃ)। এর পরে রাজাদের নাম কেবল আরাকানী ভাষাতেই রাখতে দেখা যায়। অনেকেই মনে করেন- আরাকানে মুসলিম নাম গ্রহণকারী রাজারা ধর্মে আসলে ছিলেন মুসলিম। এসব রাজাদের যেসব মুদ্রা পাওয়া যায় তাদের একটিতে আরবী, ফার্সি বর্ণমালায় লেখা থাকতে দেখা যায় মুসলিম নাম। এমনকি এদের তিনজন রাজার মুদ্রার উপর কালিমা তায়্যিবাহ লেখা থাকতে দেখা যায়। তিনি আরো লিখেছেন- "অতীতে আরাকান মিয়ানমারের অংশ ছিলনা। ষোড়শ শতকে

বর্তমান মিয়ানমারের দক্ষিণাংশে পর্তুগীজদের সহায়তায় একটি শক্তিশালী বংশের উদয় হয়। এ রাজবংশের রাজা বোধোপায়া ১৭৮৫ সালে আরাকান দখল করে নেন।

চট্টগ্রামের স্থানীয় ও পত্রিকা *দৈনিক কর্ণফুলীতে গত ৭ই জুন ২০০৯ রোজ- রবিবার* প্রকাশিত একটি প্রবন্ধতেও ফুটে উঠে আরাকানে মুসলমানদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির কথা। এতে লিখা হয়- "আরাকান এককালে ইতিহাস সমৃদ্ধ স্বাধীন জনপদের নাম। বৌদ্ধপ্রধান বার্মা থেকে আরাকান পর্বতমালা দ্বারা বিভক্ত। আরাকান প্রদেশের আয়তন বিশ হাজার বর্গমাইল এবং এর প্রাদেশিক রাজধানী আকিয়াব। এ প্রদেশে জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ মুসলমান, শতকরা ২৫ ভাগ বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মিলে শতকরা ৫ ভাগ। ১৪০৬ সালে বার্মা আরাকানের উপর হামলা চালায়। তখন আরাকানের শাসক ছিলেন নরমিখলা। তখন তিনি বাংলার সুলতান নাসির উদ্দিনের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে এই বৌদ্ধ রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সোলাইমান শাহ নাম ধারণ করে বাংলার সুলতানের সহায়তায় আরাকান পুনরুদ্ধার করেন। ১৪২০ খ্রিস্টাব্দে সোলাইমান শাহের নেতৃত্বে আরাকান ইসলাম রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী সাড়ে তিনশত বছর পর্যন্ত দেশটিতে মোট পনের জন মুসলিম শাসক শাসন কার্য পরিচালনা করে। এই শাসনামলে আরাকানে শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। বর্তমানে আরাকান মিয়ানমারের ১৪টি প্রদেশের একটি..... ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত আরাকানের জনগণ সংরক্ষণ করেছিল তাদের স্বাধীনতা। কিন্তু ১৭৮৪ সালে বর্মীরাজ বোধোপায়া কর্তৃক আরাকান দখলের পর থেকে শুরু হয় রোহিঙ্গাদের লাঞ্ছনা বঞ্চনার ইতিহাস"। সর্বশেষ ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত বালি সম্মেলনে মিয়ানমারের উপ-পুলিশ প্রধান রোহিঙ্গাদের সে দেশের নাগরিকত্ব অস্বীকার করে ভাষণ দিলে আমাদের দেশে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী দিপু মনি এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন- "রোহিঙ্গারা আরাকানের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, তারা যুগ যুগ ধরে আরাকানে বসবাসের পাশাপাশি আরাকানের সাহিত্য সংস্কৃতি লালনও পালন করে আসছে। তাছাড়া মিয়ানমার কর্তৃক রোহিঙ্গা শরনার্থীদের তালিকা প্রকাশ ও বাংলাদেশ সরকারকে রোহিঙ্গাদের তালিকা প্রদানও প্রমাণ করে রোহিঙ্গারা আরাকানের নাগরিক"।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথাই আমাদের সামনে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আরাকানে মুসলামানদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সূচনা হয়েছিল মূলতঃ সপ্তম-অষ্টম শতকে। আর এর পূর্ণতা লাভ করে ১৪২০ সালে। আর বার্মায় জান্তা সরকার কর্তৃক রোহিঙ্গাদেরকে ১৮৩২ সালের পরে আগত বলে তাদের নাগরিকত্ব বাতিল শুধু একটি মিথ্যাচারই নয় বরং এটি একটি জাতির ওপর নীরব গণহত্যা, যা জাতিসংঘ মানবাধিকার আইনের সরাসরি লংঘন। যার দায়ভার মিয়ানমার সরকার কোনভাবেই এড়াতে পারেনা।

আরাকানে মুসলমানদের লাঞ্চনা বঞ্চনার ইতিহাসের সূত্রপাতঃ

১৭৮৪ সালে বোধোপায়া কর্তৃক আরাকান দখল হওয়ার পর থেকে মুসলমানদের লাঞ্ছনা বঞ্চনার সূত্রপাত ঘটে। বর্মীরাজ বোধোপায়ার ৪২ বছরের শাসনামলে মুসলমানরা ধ্বংসের মুখোমুখি পৌছে যায়। তিনি মুসলমানদের শক্তি পুরোপুরি নিঃশেষ করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এবং মসজিদ মাদ্রাসা ধ্বংস করে সেখানে গড়ে তোলেন প্যাগোডা, বৌদ্ধ বিহার ইত্যাদি। ১৮২৩ সালে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশরা বার্মা ও আরাকান দখল করে। পরে ১৯৩৭ সালে তারা বার্মাকে স্বায়ত্ব শাসন দিয়ে পরিকল্পিতভাবে আরাকানের ক্ষমতা মুসলমানদেরকে না দিয়ে বর্মীদের হাতে দেয়। ফলে যা হবার তাই হল- ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত আরাকানের মুসলিম নিধনের নামে অসংখ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা সংগঠিত হয়। এতে লাখ লাখ মুসলিম নিহত হয় এবং তারা অনেকে নিজ ঘর-বাড়ি ছাড়া হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৯৫৮ সালে আরাকানী বৌদ্ধরা নিজেদের ক্ষমতা মজবুত করার লক্ষ্যে ব্যাপক আকারে মুসলিম নিধনে নেমে পড়ে। ১৯৬২ সালে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখলের পর মুসলমানদের উপর নির্যাতনের নতুন মাত্রা যোগ হয়, যা আজও বিদ্যমান। সেনা প্রধান নে-উইন মুসলিম মুক্ত আরাকান গড়ে তোলার হীন উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলিম এলাকাগুলোতে হত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ ইত্যাদিতে ব্যাপৃত হয় এবং রোহিঙ্গা অঞ্চলে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। তার সেই উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা এখনো অব্যাহত রেখেছে বর্তমান সামরিক জান্তা সরকার। মুসলমানদের ওপর চালানো হচ্ছে রুটিন মাফিক নির্যাতন,যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও

মিডিয়া কর্মীদের দৃষ্টির অন্তরালেই রয়ে গেছে। রোহিঙ্গাদের ওপর জান্তা সরকারের পরিচালিত নির্যাতনের ছোট্ট একটি চিত্র তুলে ধরা হলঃ

আরাকানে মুসলমানদের জমি-জমা কেড়ে নিয়ে সেখানে মগ-রাখাইনদের জন্য ঘর বাড়ি তৈরির কাজে জবরদস্তি মূলকভাবে মুসলমানদের শ্রমিক হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সরকারী যাবতীয় কঠিন কাজগুলো বিনা পারিশ্রমিকে মুসলমানদের দিয়ে করানো হচ্ছে। সেনাবাহিনীর সহায়তায় মগ-বৌদ্ধরা মুসলমানদের বাড়ি ঘর দখল করে নিচ্ছে। বিয়ে করতে হলে সরকারকে মোটা অংকের টাকা পরিশোধ করে অনুমতি নিতে হবে এবং ছেলে ৩০ বছর ও মেয়ে ২৫ বছরের নিচে কেউ বিয়ে করতে পারেনা । পাহাড়ী মগদের শহরে স্থানান্তরিত করার নামে মুসলিমদের জমি জোর পূর্বক দখল করে নেয়া হচ্ছে। মহিলারা ঘর থেকে বের হতেই পারে না। যদি কোন মহিলার প্রতি কোন মগ- রাখাইনের দৃষ্টি পড়ে, তাহলে তার আর রক্ষা নেই। অনেক সময় স্থানীয় ঘাঁটিতে সামরিক কোন বড় অফিসার আসলে তার সেবা করার জন্য জোর পূর্বক মুসলিম তরুণীদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। মুসলিম কোন ছেলে মেয়ে স্কুলে মুসলিম নাম ধারণ করে লেখা পড়া করতে পারেনা। এটা মিয়ানমার জান্তা সরকারের আরাকানে অবস্থানকারী মুসলিমদের ওপর চালানো স্থায়ী নির্যাতনের একটি খণ্ডিত চিত্র মাত্র। পুরো ব্যাপারটা আরো ভয়াবহ। স্থায়ী নির্যাতন বললাম এ কারণে যে- এ নির্যাতনগুলো সবসময় চলে, এর কোন ব্যত্যয় হয় না। তাছাড়া আরো আছে মুসলিম নির্মূলের জন্য সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ বিশেষ অভিযান। জান্তা সরকার পরিকল্পিতভাবে ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত মোট ১৪টি অপারেশন চালিয়ে রোহিঙ্গা নির্মূলকে আরো ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করে। এই অপারেশনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হল- ১৯৪৮ সালে BTF Operation (Burma Territorial Force Operation), ১৯৫৫ সালে Combined Immigration & Army Operation, ১৯৫৫ সালে UMP Operation (Union Military Police Operation, ১৯৫৬ সালে Captain Teen Cave Operation, ১৯৬৬ সালে Shwe Kye Operation, ১৯৬৭-৬৮ সালে Naga Zink Operation, ১৯৬৯-৭১ সালে Myat Mon Operation, ১৯৭৪ সালে Sabe Operation, ১৯৭৮ সালে Naga Min Dragon Operation, ১৯৯১ সালে বর্মী সেনাবাহিনী "বিজয় অপারেশন" চালায়। এটি ছিল একটি ব্যাপক অভিযান। এই অপারেশনের মাধ্যমে জান্তা সেনাবাহিনী রোহিঙ্গা অঞ্চলে লুটতরাজ, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদিতে ব্যাপৃত হয়ে রোহিঙ্গা অঞ্চলে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।

জান্তা সরকারের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে বিডিআর এর চোখকে ফাঁকি দিয়ে যে দু-একজন রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে, আমরা যারা দক্ষিণ চট্টগ্রামের বাসিন্দা, ছড়িয়ে পড়া রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে মিয়ানমারের অভ্যন্তরের কিছু না কিছু সংবাদ পাই। এমনই একজন মোহাম্মদ কাসেম সে মণ্ডু এলাকার সাতকানিয়া পাড়ার বাসিন্দা। তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো- সে কেন তার মাতৃভূমি ছেড়ে এদেশে চলে আসল, সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় যা বলল তার অর্থ দাঁড়ায়- " তার সব কিছু আছে,গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, সুন্দর সুপারি বাগান সবই আছে,সর্বোপরি তার ছিল একটি সুখের সংসার। কিন্তু একদিন জান্তা সরকার তাকে ধরে নিয়ে যায় সরকারী স্বেচ্ছাশ্রম কার্যক্রমে। তার অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী ও তার অবিবাহিত বোনের ওপর চলে জান্তা সরকারের মগ-সৈনিকদের পৈশাচিক নির্যাতন। স্বেচ্ছাশ্রম শেষে বাড়ী ফিরে এই কথা শোনার পরে সে স্থানীয় আর্মি ক্যাম্পে নালিশ করতে গেলে তার ওপরও চলে নির্যাতন এবং তাকে বলা হয়- তোরা বাঙ্গালী, এদেশে মেহমান হিসেবে এতদিন বসবাস করে আসছ, এবার চলে যাও। কাল সকালে যদি তোমাকে এলাকায় দেখা যায়- তবে তোমাকে মেরে ফেলা হবে।" একথাগুলো বলতে বলতে এতক্ষণকার শান্ত শিষ্ট মানুষটি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে এবং বলতে থাকে জানিনা, কি নির্যাতন চালানো হচ্ছে আমার স্ত্রী ও বোনদের ওপর।

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে রোহিঙ্গাদের নিয়ে আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় একটু-আধটু আলোচনা হলেও এরপরে এরা আর সংবাদ পত্রে জায়গা পায়নি। ইদানিং তারা আবার সংবাদ পত্রের শিরোনাম হয়েছেন। এই সংবাদের মাধ্যমে উঠে আসে রোহিঙ্গাদের উপর পরিচালিত জান্তা সরকারের নির্যাতনের নির্মম চিত্র। এর মধ্যে সবচেয়ে নির্মম ও পীড়াদায়ক সংবাদটি আসে গত রমজানে। রমজানে মুসলমানদের উপর জান্তা সরকারের নির্যাতন

অকস্মাৎ বেড়ে যায়। "রমজানে জান্তা সরকার মসজিদে তারাবির নামাজ নিষিদ্ধ ঘোষনা করেদ্ধ ইমাম-মোয়জ্জিনদেরকে গণহারে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়,বার্মা সেন্ট্রাল নেদারল্যান্ড (বিসিএন) নামক একটি মানবাধিকার সংগঠনের ম্যাগাজিন রাখার দায়ে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মম নির্যাতন চালিয়ে জিহবা কেটে ফেলে রিদওয়ান নামে এক মাদ্রাসা ছাত্রের। মগ সৈনিকরা বুচিদং থানার জাদিটং থানার দুই মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে সমজিদে রাতভর গণধর্ষন করে,এতেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, ধর্ষনের পর ছোরা দিয়ে গুপ্তাঙ্গে ও স্তনে আঘাত করে"।

ইন্দোনেশিয়ায় উদ্ধার হওয়া নুর মোহাম্মদ সম্প্রতি আলোচিত রোহিঙ্গা "নড়ধঃ ঢ়বড়ঢ়ষহ্বদের একজন। সে জানায় জান্তা সরকার কোন অভিযোগ ছাড়াই তাকে গ্রেফতার করে ,তারপর তার উপর চলে জান্তা সরকারের মধ্যযুগীয় নির্যাতন এবং তাকে মগ সেনাদের ফাই ফরমায়েশ খাটতে বাধ্য করা হয়। তাকে যখন মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর কথা বলা হয় তখন সে বলে " আমি না হয় এখানেই মরব,তবু আমি মিয়ানমারে ফেরত যাব না, আমাকে যদি মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো হয়,কর্তৃপক্ষ নির্ঘাত আমাকে মেরে ফেলবে।

গত ৫ ই এপ্রিল -২০০৯ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায়, মিয়ানমারের জান্তা সরকার মুসলমান নিধনে নতুন কৌশল হিসেবে রাখাইন ও মুসলমানদের মধ্যে নতুন করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির চেষ্টা করছে,এবং এর অংশ হিসেবে রাখাইন যুবকদেরকে মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব সৃষ্টির পাশাপাশি রামদা,ক্রিস,ছুরি,ইত্যাদি ধারালো অস্ত্র বিতরণ করছে। অন্যদিকে মুসলমানদের বাড়ী-বাড়ী তল্লাশী চালিয়ে ধারালো সব বস্তু নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দেশ-বিদেশে জান্তা সরকারের এই গোপন পরিকল্পনার কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় আপাতত এই অভিযান বন্ধ রেখেছে মিয়ানমার সরকার। কিন্তু অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন , অদুর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সীমান্তে কাটাতারের বেড়া ও নাফ নদীর উপর বাধ দেয়া শেষ হওয়া মাত্র শুরু হয়ে যাবে এই দমন অভিযান। *গত ২১শে জুলাই ২০০৬ সালে প্রকাশিত "রিফিউজী ইন্টারন্যাশনাল"* এর রিপোর্টেও উল্লেখ করা হয়েছে,"রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে বার্মা ভেদ-বিচার করছে,এবং রোহিঙ্গাদের উপর নির্মম নির্যাতন চালাচ্ছে"।

এত নির্যাতন নীপিড়ন যাদের উপর তাদের বিরুদ্ধে জান্তা সরকারের তেমন কোন অভিযোগ নেই । স্থানীয় থানায়ও তাদের বিরুদ্ধে নেই কোন চুরি,ডাকাতির বা রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ। আছে শুধু একটা অভিযোগ আর সেটা হলো "তারা মুসলিম ও বাঙ্গালী (*জান্তা সরকারের দাবী অনুযায়ী*) "। বাঙ্গালী বলে তাদেরকে জোরপুর্বক বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে,আবার আমরা তাদেরকে রোহিঙ্গা বলে মিয়ানমারে পুশব্যাক করছি, এই পুশইন -পুশব্যাকের যাতাকলে ঘুরপাক খেতে খেতে হয়তোবা একদিন নাফ নদীতেই এদের সলিল সমাধি ঘটবে। কুতুপালং শরনার্থী শিবিরের মাঝি বাদশাহ মিয়াকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল-"আপনারা তো বাঙ্গালী না,আবার মিয়ানমার সরকার আপনাদের নাগরিকত্বও স্বীকার করেনা এ ব্যপারে আপনার মতামত কি?" তখন সে বলে,"আমরা মানুষ, আমরা গাছ-গাছালী না যে,মাটি ফুড়ে জন্মেছি,সে স্পষ্ট ও দৃঢ়তার সাথে বলে,আমার চৌদ্দপুরুষ আরাকানের জমিতে শুয়ে আছে, আমি বাঙ্গালী হব কেন?"। সে আরো বলে,"মিয়ানমার সরকার আমাদের অস্বীকার করছে,এমতাবস্থায় আমাদের বাংলাদেশ ব্যতিত অন্য কোন দেশে আশ্রয় গ্রহন করার সুযোগ নেই। কিন্তু এতে করে বাংলাদেশ সরকার বিরাট সমস্যায় পড়ে গেছে। আমরা কাউকে কষ্ট দিতে চাইনা,মালয়েশিয়া যাবার পথে আমাদের ভাইয়েরা যেভাবে মারা গেছে, সেভাবে আমাদেরকেও গভীর রাত্রে জাহাজে করে গভীর সমুদ্রে ফেলে দেওয়া যায়না!!,তাহলেতো মিয়ানমার ও বাংলাদেশ উভয়ের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে!!" কথাগুলো বলতে বলতে তার দুচোখ দিয়ে বেয়ে পড়ল স্বজন হারানো,ও মাতৃভুমি ছেড়ে আসার দু-ফোটা বেদনার অশ্রু। মানবাধিকার কর্মীরা(!?) বাদশাহ মিয়ার পরামর্শটি ভেবে দেখতে পারেন!!।

তিব্বতের আধ্যাত্মিক ধর্মীয় নেতা দালাইলামা বলেছিলেন- "তিব্বতিরা পৃথিবীর জাহান্নামে বসবাস করছে।" কিন্তু তারপরেও তাদের স্বাধীকার আন্দোলনের সংবাদ, তাদের অধিকারের কথা বিভিন্ন গণমাধ্যমে স্থান পায়। কিন্তু কেউ যদি আরাকানের মুসলমানদের ওপর মিয়ানমার সরকার কর্তৃক পরিচালিত নির্যাতনের চিত্রগুলোতে

একবার চোখ বুলান, তাহলে তাকে অবশ্যই একবার হলেও চিন্তা করতে হবে- বর্তমান সভ্য দুনিয়ায় এও কি সম্ভব? চিন্তা করুন, তিব্বতিরা যদি পৃথিবীর জাহান্নামে বসবাস করে, তাহলে আরাকানে মুসলমানদের কি অবস্থা?

অনেকেই হয়তোবা প্রশ্ন করতে পারে- এতই যখন নির্যাতন, নিপীড়ন, তখন আরাকানের মুসলিমরা কেন আন্দোলন বা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে না? আমরা গত বছর মিয়ানমারে গণতন্ত্রের দাবিতে ভিক্ষু আন্দোলন দেখেছি। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মিয়ানমারের সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি। কিন্তু জান্তা সরকার নিজেদের গদি রক্ষার স্বার্থে সেই সম্মানিত ব্যক্তিদের ওপর নির্যাতনের যে স্টিম রোলার চালিয়েছে তার নির্মম চিত্র আমরা দেখেছি। আরাকানের মুসলমানরা কোনরকম খেয়ে না খেয়ে সরকারের কোন কাজে বাধা প্রদান না করে নিজ মাতৃভূমির শিকর আকড়ে পড়ে আছে আরাকানে। তাতেও তাদের ওপর যে নির্যাতন নিপীড়ন, আর যদি কোনদিন বিক্ষোভ বা আন্দোলন করে তাহলে তার পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে? আর রোহিঙ্গারা যেহেতু অধিকাংশই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, তাইতাদের মধ্যে তেমন নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তি নেই। যে দু-একজন ছিল, মিয়ানমারের জান্তা সরকার বিভিন্ন মিথ্যা অজুহাতে তাদেরকে হয় কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করেছে, না হয় মৃত্যুদন্ড দিয়েছে। যেমন মৌলানা শহীদ সাঈদ, মৌলানা রিদোয়ান, ছিদ্দিকুর রহমান প্রমুখ। এদেরকে মিয়ানমার সরকার মিথ্যা অজুহাতে নির্মম নির্যাতন চালিয়ে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় করে দিয়েছে।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরনার্থীদের আগমন ও তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার:

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরনার্থীরা আসে মূলত ১৯৭৮ সালের শুরুর দিকে। কিন্তু বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমানের শক্ত কুটনৈতিক প্রচেষ্টার কারণে মিয়ানমার সরকার তাদেরকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এরপরে ১৯৯১-৯২ সালে যারা আসে তাদের স্বদেশে ফিরিয়ে পাঠানোর ব্যাপারে জাতিসংঘ হোক,বাংলাদেশ হোক কেউ তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেনি। যার ফলশ্রুতিতে রোহিঙ্গারা একদিকে হয়ে পড়ছে অভিভাবকহীন অন্য দিকে বাংলাদেশ পড়ে গেছে রোহিঙ্গা বিষয়ক বিরাট এক সমস্যায়।

বর্তমানে কুতুপালং,ও মোসনী শরনার্থী শিবিরে বসবাসকারী প্রায় ২১,০০০(একুশ হাজার) শরনার্থী জাতিসংঘ শরনার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর (UNHCR) এর রেজিষ্টারভুক্ত,এরা নিয়মিত রিলিফ পেয়ে থাকে। যদিও তা তাদের স্বাভাবিক জীবন ধারনের জন্য যথেষ্ট নয় । তারপরেও তারা কোন রাকমে দু'বেলা খেতে পারছে। কিন্তু এর বাইরেও দুটো শরনার্থী শিবির আছে,যারা রেজিষ্টারভুক্ত নয় এবং এদেরকে বাংলাদেশ সরকার শরনার্থীর মর্যাদা দেয় না। এখানে প্রায় ৬ হাজার রোহিঙ্গা শরনার্থীর বসবাস, এই শরনার্থীগুলোর অবস্থা ভয়াবহ,এখানে মানুষের বসবাসের নুন্যতম উপযোক্ততা নেই। তারপরেও তারা নিতান্ত প্রাণ রক্ষার্থে জান্তা সরকারের নির্যাতন থেকে বাচাঁর আশায় এই শিবির গুলোতে বসবাস করছে। *"রিফিউজি ইন্টারন্যাশনাল"* ২০০৬ এর রিপোর্টে এই শরনার্থী শিবিরগুলোর অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন,"এই শরনার্থী শিবির গুলির অবস্থা খুবই করুন।এখানে মানুষ "রোহিঙ্গারা" কোন রকম খড় দিয়ে ঝুপড়ি তৈরি করে বসবাস করছে। অনেক সময় নাফ নদীর পানির জোয়ারে অনেক ছোট্ট ছেলেমেয়ে ভেসে যায় । আর চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে অনেকে বিভিন্ন চর্ম ও জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে,যাদের অধিকাংশই নূন্যতম চিকিৎসা সেবার অভাবে মৃত্যু বরণ করছে।

যখন কোন জনপদের উপর, কোন গোষ্ঠীর উপর শোষক শ্রেনীর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায় ,তখন এই নির্যাতিত জনতার একমাত্র আশ্রয়স্থল হল মিডিয়া, বিশেষ করে সংবাদপত্র। কারণ এই মিড়িয়ায় অনেক সময় বুলেটের ভুমিকা পালন করে,তাই তারা মিডিয়াকেই নিজেদের অভিভাবক মনে করে। আল-হামদুলিল্লাহ অনেক মিডিয়া বিশেষ করে কিছু সংবাদপত্র এই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির উপর পরিচালিত জান্তা সরকারের নির্মম নির্যাতনের খবর বিশ্ববাসীর কাছে পৌছে দিয়ে তারা তাদের পেশাদারী দায়িত্বের পাশাপাশি নৈতিক ও.ঈমানী দায়িত্বও পালন করেছে। আল্লাহ তাদের মঙ্গল করুক।

কিন্তু অত্যন্ত দুংখজনক হলেও সত্য যে,সাম্রাজ্যবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত ও আজগুবি সংবাদ প্রচার করে বিখ্যাত আমাদের দেশের কিছু প্রিন্ট মিডিয়া এই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে এমন সব মিথ্যা সংবাদ প্রচার করছে,যার ফলে এই অসহায় জনগোষ্ঠীর জীবন আরো দুঃসহ হয়ে উঠছে,এবং শোষক শ্রেনীকে তাদের শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে আরো বেশী উৎসাহ যোগাচ্ছে। *গত ২৪মে-২০০৯ রোজ বৃহঃপতিবার একটি জাতীয় পত্রিকায় মোটা হরফে লাল কালি দিয়ে"বিপদ ঘনিয়ে আসছে"* নামে পত্রিকাটির প্রধান শিরোনাম ছাপে। এতে অভিযোগ করা হয়,"রোহিঙ্গা আশ্রিত শরনার্থী শিবিরগুলোতে মাদক, আগ্নেয়াস্ত্রের ছড়াছড়ি,অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্তসহ নানা অভিযোগের মাধ্যমে এদেরকে দাগী অপরাধী হিসেবে প্রমান করার দৃঢ় চেষ্টা চালানো হয়েছে।" তাদের অভিযোগগুলোর একটি অনুসন্ধানী পর্যালোচনা করলেই সে অভিযোগগুলো কতটুকু মিথ্যা ও বানোয়াট তা সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। শরনার্থী শিবিরগুলোতে মাদক ও আগ্নেয়াস্ত্রের অস্থিত্ব সম্পর্কে সেখানে নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত একজন নিরাপত্তা কর্মীকে জিজ্ঞাসা করা হলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি বলেন,"রোহিঙ্গাদেরকে আমাদের চেয়ে কে বেশী বুঝবে,এদের বাড়ী ঘর গুলো ঢাকা শহরের বস্তি আকৃতির। তাই নতুন কেউ এখানে আসলে মনে হবে এখানে বুঝি সেই ঢাকা শহরে বস্তির মত মাদক ও আগ্নেয়াস্ত্রের রমরমা ব্যবসা হচ্ছে। কিন্তু এখানকার পরিস্থিতি ভিন্ন, এখান থেকে এই পর্যন্ত অস্ত্র উদ্ধারতো দুরের কথা,কোনদিন শরনার্থী শিবিরের ভিতরে কেউ একটি গুলির আওয়াজও শুনেনি।" আর মাদক সম্পর্কে তিনি জানান,"এটা সত্য যে, রোহিঙ্গাদের অধিকাংশই বিড়ি খায়, কিন্তু এটাকে হিরোইন বা গাঁজা মনে করা ভুল হবে।"

পত্রিকাটি আরো অভিযোগ করেছে, "এদের কারণে স্থানীয় শ্রমবাজারে চাপ পড়ছে,এরা গাছ-পালা কেটে, পাহাড় কেটে পরিবেশ দুষণ করছে"। যারা জাতিসংঘের রেজিষ্ট্রার ভুক্ত তারা নিয়মিত রেশন পাচ্ছে, এদের শিবিরের বাহিরে গিয়ে কাজ করার প্রয়োজন পড়েনা। তাহলে অভিযোগগুলো মুলত রেজিষ্টারভুক্ত হয়নি এমন শরনার্থী শিবিরের বিরুদ্ধে। এদেরকে শরনার্থীর মর্যাদা না দেয়ায় এরা বাংলাদেশ বা জতিসংঘ থেকে কোন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা পায়না। অন্য কোন সংস্থাও এদেরকে কোন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করেনা। এরা বাধ্য হয়ে দু-বেলা খাওয়ার জন্য শিবিরের বাইরে গিয়ে স্থানীয় শ্রমিকদের তুলনায় কম পারিশ্রমিকে কাজ করে। আচ্ছা ধরা যাক, পত্রিকাটির রিপোর্ট অনুযায়ী এরা বাইরে কাজ করতে যাবেনা যাতে করে স্থানীয় শ্রম বাজারে চাপ না পড়ে। কেউ তাদেরকে দুমোটো ভাতও দেবেনা তাহলে এরা খাবে কি ? এদের কি খাবার দাবারের প্রয়োজন নেই? এই অসহায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিটি না খেয়ে মারা যাক এটাই কি তাহলে তাদের রিপোর্টের মুল উদ্দেশ্য। যদি তাই হয়, তাহলে তাদের উদ্দেশ্যে বলতে হয়, সাংবাদিকতার পেশাদারী দায়িত্বের পাশাপাশি মানবিক দিকটির প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত। এই পত্রিকার রিপোর্টে রোহিঙ্গা নারীদের বিরুদ্ধে পতিতাবৃত্তির অভিযোগ আনা হয়েছে,কিন্তু রোহিঙ্গাদের নিয়ে ২০০৬ সালে "রিফিউজী ইন্টারন্যাশনাল" কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টে একবার চোখ বুলালে এই পত্রিকার অভিযোগটি কতটুকু মিথ্যা তা পরিস্কার হয়ে যাবে। "রিফিউজী ইন্টারন্যশনাল"তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছে,"শরনার্থী শিবির গুলোতে রোহিঙ্গা নারীদেরকে কোন কাজে অংশগ্রহণ করানো যাচ্ছে না,রোহিঙ্গাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী নারীদের বাড়ীর বাইরে কাজ করার ক্ষেত্রে এক প্রকার বিধিনিষেধ রয়েছে"।

গত ১২ই ডিসেম্বর ২০০৭ ইং রোজ বুধবার কক্সবাজারে এনজিও পালস এর উদ্যোগে মানবাধিকার বিষয়ক এক গোল টেবিল আলোচনায় 'রোহিঙ্গাদের কারণে কক্সবাজারের আইন-শৃংখলার অবনতির অভিযোগ আনা হয়"। এই ব্যাপারে কক্সবাজারের এক খ্যাতনামা আইনজীবিকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,"আসলে এই পেশাদারী জীবনে অনেক মামলা পরিচালনা করেছি,তবে অনেকাংশে যাদের বিরুদ্ধে 'রোহিঙ্গা' অভিযোগে গ্রেফতার দেখানো হয়,তদন্তের পর দেখা যায় যে,এদের অধিকাংশই স্থানীয় বাসিন্দা"। তিনি আরো বলেন,"এটা হয়তোবা রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে একটি সংঘবদ্ধ প্রচারনা। তাদেরকে খারাপ মানুষ হিসেবে পরিচিত করার মানসে এমনটা করা হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।"

কিন্তু আমি একথা বলছিনা যে,রোহিঙ্গাদের মধ্যে সবাই ভাল বা সবাই সাধক। পৃথিবীর সব দেশে সব জাতিতে কিছু না কিছু কুলঙ্গনা থাকে, কিন্তু দু-একজন কুলঙ্গনার অপরাধের দায়ভার পুরো জাতির উপর চাপিয়ে দেয়া আইনের কোন সজ্ঞায় পড়ে?।

গত ১৩ জুন ২০০৯ একটি জাতীয় দৈনিকে অভিযোগ করা হয়,প্রায় বিশ হাজার রোহিঙ্গা বান্দারবানে স্থায়ী ভাবে বসবাস করছে। এবং তারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করা সহ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করছে। অভিযোগের নির্ভরযোগ্য কোন সুত্রের কথা উল্লেখ করা হয়নি। মুলত ধারণাপ্রসূত এসব রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে এটা সুস্পষ্ঠ। তারপরেও বলতে হয়,জিম্বাওয়ের উপর পশ্চিমাদের অব্যাহত অবরোধের পর যখন দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থা চরমে তখন রবার্ট মুগাবের মেয়ের হংকংয়ে বিলাসবহুল জীবন যাপন করে লেখাপড়ার খবর প্রকাশ হয়ে পড়লে, পশ্চিমা মিডিয়া তাকে হংকং থেকে বের করে দেয়ার জন্য অব্যাহত ভাবে নানা প্রচার চালাচ্ছিল। তখন তার সহপাঠি বন্ধুরা বলেছিল "কেন তাকে তার লেখাপড়ায় বাধাগ্রস্ত করা হবে , সেতো কোন অন্যায় করেনি"। পরিশেষে হংকং সরকারও তাকে আর তার দেশ থেকে বের করে দেয়নি। যদি রোহিঙ্গারা এই দেশে এসে লেখাপড়া করে তাতে তারা বাংলাদেশ সরকারের বোঝা না হয়ে সম্পদে পরিনত হবে।এই রিপোর্টে রোহিঙ্গাদের সহযোগিতার অভিযোগ তুলে এলাকার গন্য-মান্য মানুষদের প্রতিও বিষোদাগার করা হয়েছে।

আমার খুব আশ্চর্য লাগে যখন দেখি আমাদের দেশের সংবাদ মাধ্যমগুলো মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে চলে আসা লোকদের বেলায় একপেশে সংবাদ পরিবেশন করে। একটা কথা মনে রাখতে হবে মিয়ানমার থেকে শুধু মাত্র রোহিঙ্গারা এই দেশে এসে আশ্রয় নেয়নি। জান্তা সরকারের নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে অনেক গণতন্ত্রকামী রাখাইন ও মগরা এদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে । কিন্তু তারা এদেশে বহাল তবিয়তে আছেন, উপজাতীয়দের সাথে তাদের দৈহিক ও সংস্কৃতির মিল থাকায় তারা সহজে নিজেদেরকে উপজাতী হিসেবে পরিচয় দিয়ে এদেশের ভোটার হওয়া থেকে শুরু করে সরকারী যাবতীয় সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে। রোহিঙ্গারাতো "রোহিঙ্গা স্কুল" নামে কোন স্কুল প্রতিষ্ঠা করে নাই,"রেহিঙ্গা মার্কেট' নামে কোন মার্কেটও প্রতিষ্ঠা করে নাই, কিন্তু রাখাইন ও মগরা "বার্মিজ স্কুল" নামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে, যে স্কুলে ক্লাস ফোর পর্যন্ত বার্মিজ ভাষা পড়ানো হয়,"বার্মিজ মার্কেট" নামে মার্কেট করেছে, তাদের দোকানের অধিকাংশ সাইনবোর্ডও বার্মিজ ভাষায়। আর তাদের এই দোকানগুলোতে স্থানীয় কারো চাকরি করার সুযোগ নাই, রাখাইন মেয়েরাই এসব মার্কেট ও দোকন পরিচালনা করে,তারা এখানো নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করে বার্মিজ ভাষায়। তারা আজ কক্সবাজারে কোটি কোটি টাকার মার্কেট নিয়ন্ত্রন করছে বার্মিজ দ্রব্য সামগ্রীর প্রতি সাধারন মানুষের কদর থাকায়। এবং রাখাইনরা সরাসরি বার্মা থেকে মালামাল নিয়ে আসতে পারে বিধায় তারা কক্সবাজারে একচেটিয়া ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করছে। এবং প্রতি পর্যটন মৌসুমে কোটি কোটি টাকা আয় করছে,যা তারা তাদের নিজ দেশেই পাচার করছে। একাধিক রাখাইন মহিলাদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, তাদের বাংলাদেশে একটা বাড়ী আছে, এবং মিয়ানমারেও তাদের একটা বাড়ী আছে। তারা যখন যেখানে ইচ্ছা থাকতে পারে। তাদের শারীরিক গঠন মিয়ানমারের মগদের সাথে মিল থাকায় তারা অবাধেই মিয়ানমারে যাতায়াত করতে পারে। গৃহবন্দির নিয়ম ভাঙ্গার অভিযোগে যখন অং সান সুচিকে গ্রেফতার করা হল, তখন তারা ককস বাজার শহীদ মিনার চত্বরে প্রকাশ্যে মিছিল সমাবেশ করল। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এদের কর্মকান্ড নিয়ে কেন কোন আলোচনা হয়না,কেন এদের অবাধ কর্মতৎপরতা নিয়ে গোল টেবিল, সেমিনার হয়না? । অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে উত্তেজনা দেখা দিলে,অবাধ বিচরনের সুযোগ নিয়ে তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগীরি করেন। আর কক্সবাজারের বার্মিজ পল্লীগুলোতে কখন কে আসে, যায় তার কি কোন তদারকি আছে? অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন,পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী উপজাতীদের মাঝে মানোন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড পরিচালনার কথা বলে পশ্চিমা এনজিও গুলো মূলত খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচার করছে। খাগড়াছড়ি জেলার 'সাজেক' যেন আজ বাংলার বুকে এক খন্ড ইউরোপ , বাংলা গানের পরিবর্তে ইংরেজী গানের সুর উঠছে আজ তাদের গিটারে,তাদের চাল-চলনে পোশাক-পরিচ্ছদে আজ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি। তারা পার্বত্য

চট্টগ্রামে স্বায়ত্বশাসনের নামে এই অঞ্চলকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করছে। তাদের সাথে আমরা 'পার্বত্য শান্তি চুক্তি' নামে এক কালো চুক্তি করেছি। তারা আজ বিদেশীদের সহযোগিতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা প্রত্যাহার করার জন্য সরকারকে চাপ দিচ্ছে,যেন আমাদের দেশের সেনাবাহিনী অন্য কোন দেশ দখল করে আছে। আর সে দেশের সরকার তার দেশ থেকে আমাদের সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানাচ্ছে। যেমনটি দেখি আমরা ইরাক, আফগানিস্তানের সরকারের বেলায়, যারা তাদের দেশ থেকে দখলদার বাহিনী প্রত্যাহারের জন্য নিয়মিত অনুরোধ জানিয়ে আসছে। বান্দরবান ও নাইক্ষ্যংছড়ির কয়েকজন জনপ্রতিনিধির সাথে কথা বলে জানা গেছে,পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে উপজাতীয়দের নামে আলাদা রাষ্ট্র করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে আছে, পাহাড়ী বাঙ্গালী ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী মুসলিমরা, তাই নির্বাচন বা ভোটার তালিকা প্রণয়নের সময় আসলে একটি কুচক্রি মহল এই এলাকাগুলোতে অবৈধ রোহিঙ্গারা বসবাস করছে বলে অপপ্রচার চালায়, যাতে স্থানীয় মুসলিমদের ভোটার সংখ্যা কমে যায়। আর উপজাতীয়দের সাথে মিয়ানমারের রাখাইন ও মগদের শারিরীক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে মিল থাকায় তারা সহজে এদেশে এসে বসতি স্থাপন করে উপজাতী পরিচয় দিয়ে ভোটার হয়ে যাচ্ছে,যার ফলে প্রতি নির্বাচনে এই অঞ্চলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপজাতীদের পছন্দের প্রার্থীরাই জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন বলেও মন্তব্য করেন অনেকে। আর বান্দরবান ও নাইক্ষ্যংছড়ি স্থানীয়দের কাছে 'মগ' পল্লী হিসেবে খ্যাত এলাকাগুলোতে তাদের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন মিয়ানমার থেকে আগত গণ্য-মান্য ব্যক্তি ও গায়ক গায়িকারা কিন্তু আমরা এগুলো দেখিনা,দেখি শুধু ঐ নিরীহ রোহিঙ্গা জনগোষ্টিকে-যাদের নেই কোন ভুমি,নেই কোন অভিভাবক। পিলখানা হত্যাকান্ড সম্পর্কিত সরকারি রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পর কলামিষ্ট ও শিক্ষাবিদ ড. রেজোয়ান সিদ্দিকীর প্রখ্যাত "একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধির তদন্ত রিপোর্ট" নামে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। খুব ভাল লেগেছিল প্রবন্ধটি পড়ে। তিনি সেখানে যারা দেখেও না দেখার ভান করেন,শুনেও না শুনার ভান করেন তাদেরকে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বলে উপমা দিয়েছেন। আজ যারা রাখাইন ও বার্মিজ মগদের এ দেশে অবাধ বিচরণ ও তাদের অবৈধ তৎপরতার বিষয়টি দেখেও না দেখার ভান করে,বস্তু-ভিটাহীন অসহায় রোহিঙ্গা জনগোষ্টিকে নির্মূল করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মিথ্যাচার করে একপেশে সংবাদ পরিবেশন করে তাদেরকে কি উপমা দেওয়া যেতে পারে? গত ৭ই মে ২০৯ প্রথম আলো পত্রিকায় "দক্ষিণ এশিয়ায় উদ্ধাস্তুদের লম্বা সারি" নামে একটি প্রবন্ধ ছাপে, এতে পাকিস্তানের সোয়াত উপত্যকাবাসীর দুর্বিষহ জীবনের কথা,শ্রীলংকার তামিলদের কষ্টের জীবন নিয়েও আলোকপাত করা হয়েছে,এবং তথাকথিত ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী পাহাড়ী উপজাতীদের উদ্ধাস্তু জীবন নিয়েও কিছু লিখা হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে,যে শরনর্থী সমস্যা সামাল দিতে আমাদের এই বাংলাদেশ হিমশিম খাচ্ছে,যে শরনার্থী শিবিরগুলো আমাদের নাকের ডগার উপর বসে আছে,সেই রোহিঙ্গা শরনার্থী শিবিরগুলোর দূরাবস্থা সম্পর্কে একটি কথাও এই প্রবন্ধে স্থান পায়নি। মানবাধিকার কর্মীদের আরো বড় মনের অধিকারী হওয়া উচিত,না হলে এই অসহায় নির্যাতিত জনগোষ্ঠি কাদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করবে?

রোহিঙ্গা শরনার্থী শিবির পরিদর্শনকালে ইইউ মিশন প্রধান ড.ষ্টিফেন ফরউইন বলেছেন"কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজ দেশ ত্যাগ করতে চায়না, নিশ্চয় মিয়ানমার সরকার সে দেশে এমন কোন সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যার ফলে রোহিঙ্গা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন"। এর আগে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদুত জেমস এফ মারিয়ার্টি নয়াপাড়াস্থ রোহিঙ্গা শরনার্থী শিবির পরিদর্শনকালে বলেছেন,"রোহিঙ্গারা আমাদের মতই মানুষ,আমাদের সবার উচিত তাদের জীবনযাত্রা ও মানবাধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা"। যেখানে ইইউ প্রতিনিধি প্রধান ও মার্কিন রাষ্ট্রদুত আমাদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছেন,এই অসহায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিটির প্রতি সহমর্মিতা ও সহানুভুতি প্রদশন করতে,সেখানে আমাদের দেশের কিছু সংবাদপত্রের এ কেমন নিষ্ঠুর আচরণ এই অসহায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিটির প্রতি?!!। আজ যদি আমরা এই অসহায় জনগোষ্ঠিটির প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিই, তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে প্রাকৃতির আচরন খুবই নিষ্ঠুর। হয়তবা একদিন এই পরিণতি আমাদেরও ভোগ করতে হতে পারে। (আল্লাহ না করুক)।

শেষ কথা

দীর্ঘদিন ধরে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা কর্তৃক নোবেল বিজয়ী ও সে দেশের একটি গনতান্ত্রিক পার্টির নেত্রী অং সান সুচির উপর অব্যাহত নির্যাতন, আরাকানে মুসলমানদের উপর পরিচালিত নীরব গণহত্যা, ও গনতন্ত্রের দাবিতে বিক্ষোভরত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উপর নির্মম নির্যাতনের পরও,বিশ্ব মোড়লরা ও জাতিসংঘ মিয়ানমারের বিরুদ্ধে তেমন কোন বড় ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারেনি। যা করেছে তা না করার মত, মিয়ানমারের উপর আমেরিকার একটি অকার্যকর অর্থনৈতিক অবরোধ, যার খেসারত শুধু সাধারণ জনগণকেই ভোগ করতে হয়েছে, এতে জান্তা সরকারের চেলাদের তেমন কোন ক্ষতিই হইনি। আর কিছু মোটা মোটা কথা ও হুমকি ছাড়া তেমন কিছুই করতে পারেনি। ইব্রাহীম গাম্বেরী নামে এক ব্ল্যাক ম্যান মাঝে মধ্যে জাতিসংঘের দূত হিসেবে মিয়ানমার সফর করেন। মিয়ানমারের বিমান বন্দরে নেমে সুন্দরী ললনাদের ফুলেল শুভেচ্ছা পেয়ে বিশ্ববিখ্যাত প্যাগোডার দেশ মিয়ানমার ভ্রমন করে যথারীতি অং সান সুচির সঙ্গে এবং মিয়ানমারের জান্তার সাথে এক ঘন্টার একটা বৈঠক শেষে,"মিয়ানমারে আমরা গণতন্ত্র আশা করি" বলে ছোট্ট একটা বিবৃতি দিয়ে মিয়ানমার সরকারের শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে মুল্যবান মনি মুক্তার একটা ব্রিফকেস নিয়ে এক সপ্তাহের একটা প্রমোদ ভ্রমন শেষে মিয়ানমার ত্যাগ করেন। ফলাফল=শুন্য। সর্বশেষ জাতিসংঘ মহাসচিব বান কিং মুন মিয়ানমার সফর করেন। কিন্তু তিনিও মিয়ানমার সরকারের পক্ষ থেকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আশানুরুপ সাড়া না পেয়ে বলতে বাধ্য হয়েছেন "মিয়ানমার বড় একটি সুযোগ হাতছাড়া করল"। আজ যদি মিয়ানমার মুসলিম বিশ্বের কোন দেশ হত, তাহলে গণতন্ত্রের ফেরিওয়ালারা 'গণতন্ত্র ধ্বংস' হয়ে গেল বলে শ্লোগান দিয়ে ধর-ধর মার-মার বলে জাতিসংঘ নামে এই 'আমেরিকা সংঘ' বিশ্ব জনমতের তোয়াক্কা না করে এই দেশটিকে আরেক ইরাক,আফগানিস্তানে পরিণত করত। কিন্তু তারা আজ তা করছে না, কারণ মিয়ানমারের জান্তা সরকারতো মুসলিম নিধনের মাধ্যমে তাদেরই এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে।

প্রতি বছর বিশ্ব শরনার্থী দিবস পালিত হয় । এই দিবসকে সামনে রেখে মিছিল-মিটিং হয়,গোল টেবিল বৈঠক ও সেমিনারে শরনার্থী বিষয়ক আলোচনা হয়। জাতিসংঘের মহাসচিব ও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ বিবৃতি দেন, বড় বড় মানবাধিকার সংগঠনগুলো (?) শরনার্থীদের নিয়ে বড় বড় কথা বলেন। এই দিবস উপলক্ষে (UNHCR)কর্মরত অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রমোশন হয়,শরনার্থীদের নিয়ে কাজ করার বিশেষ অবদান স্বরূপ কাউকে পুরস্কৃতও করা হয়,এভাবে অনেকের ভাগ্যই বদলে যাবে, কিন্তু.....কিন্তু বদলায়না নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিগৃহীত, নিষ্পেষিত এই অসহায় রোহিঙ্গা জনগোষ্টিটির ভাগ্য।

তথ্যপুঞ্জি:

১. রোহিঙ্গা সমস্যা : বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি,ড.মাহফুজুর রহমান আকন্দ,ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত।
২. মাসিক রহস্য পত্রিকা, মার্চ-২০০৯।
৩. দৈনিক আমার দেশ, ৮ই এপ্রিল, ২০০৯ ও ২২ শে মে ২০০৯
৪. দৈনিক কর্নফুলী, ৭ই জুন, ২০০৯ ও ১২ই ডিসেম্বর ২০০৭
৫. রোহিঙ্গা সমস্যা : বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি,ড.মাহফুজুর রহমান আকন্দ,ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত।
৬. দৈনিক নয়াদিগন্ত, ৩ই সেপ্টেম্বর-২০০৮, ৫ই এপ্রিল ও ৭ই মে ২০০৯
৭. প্রথম আলো, ৫ ই ফেব্রুয়ারী,২০০৯।
৮. রিফিউজী ইন্টারন্যশনাল,২০০৬।
৯. www.kaladanpress.org.
১০. www.youtube.com.
১১. দৈনিক সমকাল,২৪ মে ২০০৯।
১২. দৈনিক যুগান্তর, ১৩ই জুন,২০০৯।
১৩. মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরনার্থী:প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ড. মাইমুল আহসান খান।
১৪. রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস-এম.এ হাবিব।

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 91-97)

দা'ওয়াতী কার্যক্রমে দোয়ার ভূমিকা

কাশেফা ফেরদাউস*

ভূমিকাঃ

মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানবজাতিকে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্যেই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, আর তাদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জীবন গঠনের আদর্শের প্রতি মানুষকে আহ্বান করা। তবে এ কথা সত্য যে, হেদায়েত মানুষের হাতে নয় বরং আল্লাহর ইচ্ছাধীন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য "হে নবী! তুমি যাকে ইচ্ছা সুপথ প্রদর্শন করাতে পারো না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সুপথ দেখান।"[১] এ ক্ষেত্রে দায়ীর অন্যতম করনীয় হচ্ছে মহান আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করা এবং দোয়ার মাধ্যমে ধৈর্য্য ধারণ করা। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন-"হে বান্দা সকল! তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো।[২] আর এ জন্যেই ইসলামী দাওয়াত ফলপ্রসূ হওয়ার ক্ষেত্রে দোয়ার রয়েছে এক অপরিহার্য ভূমিকা। কারণ দোয়ার বদৌলতেই মহান আল্লাহ পারেন কঠিনকে সহজ করে দিতে, অন্ধকারে নিমজ্জিত ব্যক্তিদের আলো দেখাতে, অসাধ্যকে সাধ্য করতে, মানুষের ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে। সর্বোপরি দোয়ার মাধ্যমেই উভয়কালে প্রভূত কল্যাণ লাভ সম্ভব।

দোয়ার পরিচয় ঃ

- দোয়া শব্দটি আরবী বিশেষ্য। এর অর্থ হলো- "ডাক, আহ্বান, সম্বোধন, প্রার্থনা, আশীর্বাদ, মঙ্গল কামনা।
- পরিভাষায় ইমাম খাত্তাবী বলেন- "বান্দাহ কর্তৃক মহান আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা।"[৩]
- ইবনুল কাইয়্যিম বলেন- "দায়ীর কল্যাণকামী বিষয়ের প্রার্থনা এবং অনিষ্টতা হতে আশ্রয় চাওয়া।"[৪]
- মোটকথা বান্দাহ কর্তৃক মহান আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণ কামনা করাকে দোয়া বলা হয়।

দোয়ার মাহাত্ম্য ঃ

মহান আল্লাহ কর্তৃক বান্দাহকে আদেশকৃত ইবাদতের অন্যতম হলো দোয়া। এর মাধ্যমে তিনি বান্দাহকে প্রভূত কল্যাণ দান করেন, আর যারা বিমুখ হন তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেন। দোয়ার মাধ্যমেই বান্দাহ তাঁর দয়া প্রার্থনা করে, সাহায্য চায়, অভিশাপ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। নিজের দীনতা তাঁর কাছে প্রকাশ করে এবং তাকে সবকিছুর ধারক-বাহক হিসেবে মনে করে। পবিত্র কুরআনের শুরু এবং শেষ উভয়ই হয়েছে দোয়া সম্বলিত বাণী দিয়ে। নিচের বিষয়গুলোর মাধ্যমে আমাদের সামনে দোয়ার মাহাত্ম্য প্রতিভাত হয়ে উঠে ঃ

১. মহান আল্লাহ মুমিন বান্দাহকে দোয়া করার আদেশ দিয়েছেন এবং যারা দোয়া-বিমুখ তাদেরকে ভয় দেখিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হচ্ছে- "তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে তারা সত্বরই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[৫]

২. মহানবী (দঃ) দোয়াকে ইবাদত হিসেবে গুণান্বিত করেছেন। যেমন হাদীসের বাণী: "দোয়াই হচ্ছে ইবাদত"[৬]

৩. মহান আল্লাহর কাছে দোয়া অধিক সম্মানের বিষয়বস্তু। যেমন- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস: "মহানবী (দঃ) ইরশাদ করেন: "মহান আল্লাহর কাছে দোয়ার চেয়ে সম্মানিত আর কিছু নেই।"[৭]

৪. মৃত্যুর পরে দোয়া মুসলামানদের পরস্পরের মাঝে যোগসূত্র। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে এসেছে- "আর যাঁরা পরে এসেছেন তারা বলেন: হে আল্লাহ! আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্ববর্তী মুমিন ভাইদেরকে আপনি ক্ষমা করে দিন।"[৮]

---

* ৫ম সেমিস্টার, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

৫. দোয়া মানুষের জন্যে সর্বাবস্থায় অনুমোদিত একটি ইবাদত। ফলে সে দিবারাত্রি, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে, সুস্থ-অসুস্থ, দুঃখে-প্রাচূর্যে সব সময় তা করতে পারে।

৬. মহান আল্লাহ তায়ালা প্রশংসা করেছেন দোয়াকারীদের। " সৎকর্মে ঝাপিয়ে পড়তো আর আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকতো এবং তাঁরা ছিলো আমার কাছে বিনীত।"[৯]

৭. দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বান্দাহকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করেন। মহানবী (দঃ) এর বাণী- "যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সত্য সহকারে শাহাদাত কামনা করলো, আল্লাহ তায়ালা তাকে শহীদের মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দেবেন, যদিও সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।"[১০]

দোয়ার শিষ্টাচার ঃ

মহান আল্লাহ শিষ্টাচারকে ভালবাসেন। নম্র, ভদ্র ও শালীনভাবেই কোন জিনিস প্রার্থনা করলেই কেবল তা পাওয়ার আশা করা যায়। এ জন্যে দোয়ার রয়েছে কিছু শিষ্টাচার ও শালীনতা। ইমাম আবূ হামেদ আল গাযালী দোয়ার দশটি শিষ্টাচার উল্লেখ করেছেন[১২] নিম্নে তা প্রদত্ত হলো:-

১. পবিত্র সময়গুলোর অপেক্ষায় থাকা। যেমন- আরাফার দিন, জুমার শেষ মুহূর্তে, রাতের শেষ এক তৃতীয়াংশে। রাতের শেষ এ অংশের প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে- "রাসূল (দঃ) বলেন, প্রতি রাতে যখন রাতের শেষ এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকে তখন আল্লাহ তায়ালা নিকটবর্তী আসমানে অবতীর্ণ হন এবং বলতে থাকেন- যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দেবো, যে আমার কাছে কিছু চাইবে আমি তা তাকে দিবো এবং যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো।"[১৩]

২. পবিত্র অবস্থা সমূহে দোয়া করা, যেমন- সিজদাবস্থায়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে- "সিজদাবস্থায়ই বান্দাহ তাঁর প্রভূর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। সুতরাং তোমরা বেশী বেশী দোয়া করো।"[১৪] বৃষ্টি বর্ষণের সময় এবং সৈন্যদলের সাথে মিলিত হবার সময়।

৩. অযূর পরে হাত উত্তোলন করে দোয়া করা, ক্বিবলাকে সামনে রেখে দোয়া করা। এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- " মহান আল্লাহর নবী (দঃ) ক্বিবলাকে সামনে রেখে কুরাইশের ছয় ব্যক্তির উপর বদদোয়া করলেন।"[১৫] এছাড়াও অসংখ্য হাদীসে পবিত্র ক্বাবার সামনে মহানবীর (দঃ) দোয়ার প্রমাণ মেলে।

৪. উঁচু স্বর এবং নিঃশব্দতার মাঝামাঝি দোয়া করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী- "আর আপনি নামাজ আদায়কালে উঁচু শব্দেও নামাজ পড়বেন না এবং নিঃশব্দেও না। বরং এতদুভয়ের মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করুন।"[১৬] একদা রাসূল (দঃ) এক জাতিকে উচ্চস্বরে দোয়া করতে শুনলে তাদেরকে বাধা দিয়ে বলেন- "তোমাদের স্বরকে নিচু করো, কেননা তোমরা কোন বধির এবং অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে দোয়া করছো না বরং নিকটবর্তী সর্বশ্রোতার কাছেই দোয়া করছো।"[১৭]

৫. বিনয়, নম্রতা ও ভয়ের মাধ্যমে দোয়া করা। কেননা, আল্লাহ তায়ালা বলেন- "আর স্মরণ করতে থাকো স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায়।"[১৮]

৬. দৃঢ় সংকল্পবলে এবং নিশ্চিত কবূলের আশায় দোয়া করা। কারণ, হযরত মুহাম্মদ (দঃ) হতে আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক এ মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (দঃ) বলেন- "তোমাদের কেউ যেন এ বলে প্রার্থনা না করে যে, হে আল্লাহ! যদি তোমার ইচ্ছা হয় তাহলে ক্ষমা করো। যদি তোমার ইচ্ছা হয় তাহলে দয়া করো, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তাহলে রিযিক দাও। বরং সে যেন দৃঢ়ভাবে প্রার্থনা করে। কারণ, মহান আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন, তাঁকে কোন কিছু বাঁধা দিতে পারে না।"[১৯]

৭. ধীরে ধীরে কোন বিষয় তিনবার পুনরাবৃত্তি পূর্বক দোয়া করা। এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কুরাইশদের উপর মহানবীর (দঃ) বদদোয়া প্রসঙ্গে বলেন: অতঃপর তিনি (দঃ) তাদের উপর বদদোয়া করলেন, এবং তিনি যখন চাইতেন তখন তিনবার চাইতেন এবং যখন দোয়া করতেন তখন তিনবার দোয়া করতেন, অতঃপর "হে আল্লাহ! কুরাইশদের ব্যাপার আপনার উপর ন্যস্ত" তিনি বললেন।"[২০]

৮. মহান আল্লাহর গুণকীর্তন এবং রাসূলের (দঃ) উপর দরুদ ও সালাম প্রেরণ পূর্বক দোয়া করা। হযরত ফুদালা ইবনে উবাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (দঃ) এর সামনে উপবিষ্ট ছিলাম। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি নামায পড়ে দোয়া করে বললেন: হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন এবং দয়া

করুন, তখন রাসূল (দঃ) তাকে বললেন! "তুমি খুব তাড়াতাড়ি করেছো, যখন তুমি নামায শেষে বসবে তখন আল্লাহর গুণ কীর্তন করবে এবং আমার উপর দরূদ পড়বে, অতঃপর আল্লাহর কাছে দোয়া করবে।" বর্ণনাকারী বলেন: এর পরে অপর এক লোক নামায পড়ে আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসূলের (দঃ) উপর দরূপ পড়লে মহানবী (দঃ) তাকে বলেন: "তুমি দোয়া করো, আল্লাহ তোমার দোয়া কবুল করবেন।"[২১]

৯. অত্যাচার, হারাম হতে বিরত থাকা পূর্বক দোয়া করা।

১০. অলংকারপূর্ণ ভাষা তথা কাব্যিক ছন্দে দোয়া না করা। কেননা, এতে মনযোগ ব্যহত হতে পারে।

দোয়া কবূলের প্রতিবন্ধকতাসমূহ ঃ

বান্দাহদের প্রতি মহান আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু। তাদের কোন দোয়াই তিনি ফিরিয়ে দেন না। তবে বান্দাহর কিছু কর্মের ফলে তাদের দোয়া কার্যকর হয় না। যেমন-

১. হারাম খাবার ভক্ষণ করা। কারণ মহান আল্লাহ অপবিত্র কোন বস্তুকে গ্রহণ করেন না। সকল নবী, রাসূল ও সকল সালফে সালেহীন তাঁদের খাবারের হালালের ব্যাপারে অধিক সতর্ক ছিলেন। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) কে একবার বলা হলো : সাহাবাদের মধ্য হতে আপনার দোয়া কবূল করা হয়। তখন তিনি বলেন- কোন খাবার কোত্থেকে এসেছে তা না জানা পর্যন্ত আমি ভক্ষণ করি না।" ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ বলেন- "যে ব্যক্তি চায় যে তার দোয়া কবূল করা হোক, সে যেন তার খাবার পবিত্র করে নেয়।"[২২]

২. দৃঢ় মনে দোয়া না করা।

৩. দোয়ার ফল তাড়াতাড়ি আশা করা তথা ধৈর্য্য ধারণ না করা।

৪. অমনোযোগী হয়ে দোয়া করা। কারণ হাদীসে এসেছে, রাসূল হতে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (দঃ) ইরশাদ করেন, "নিশ্চিত কবুলের আশায় তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করো আর জেনে রাখো যে, মহান আল্লাহ কোন অলস ব্যক্তির দোয়া কবূল করেন না।"[২৩]

৫. সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ হতে বিরত থাকা। সুনানে ইবনে মাজায় হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল (দঃ) কে বলতে শুনেছি যে- "দোয়া করার পূর্বে তোমরা ভাল কাজের আদেশ দাও এবং খারাপ কাজ হতে নিষেধ করো, অন্যথায় তোমাদের দোয়া কবূল হবে না।"[২৪]

৬. কোন পাপ কাজ অথবা বংশ ছিন্ন হওয়ার জন্যে দোয়া করা। কারণ দোয়ার মৌলিকত্ব হচ্ছে মুসলমানদের জন্যে কল্যাণ কামনা এবং ইসলামের শত্রুদের জন্যে ধ্বংস কামনা করা।

অমুসলিমদের জন্যে ইসলামে প্রবেশের দোয়া ঃ

মহান আল্লাহ বলেন, "আমি প্রত্যেক জাতির প্রতি এ মর্মে রাসূল প্রেরণ করেছি যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতী শক্তির ইবাদত হতে দূরে থাকো।"[২৫] কাফের জনগোষ্ঠীকে মহান আল্লাহর একাত্ববাদের প্রতি আহ্বানের জন্যে যুগে যুগে অসংখ্য রাসূল প্রেরিত হয়েছেন। কারণ দাওয়াতের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো মানুষকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করানো। আর এই বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজন অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা, উৎসর্গ-বিসর্জন, দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য্য, প্রচুর সময় ব্যয়, সর্বোপরি একনিষ্ঠ আত্মত্যাগ। মহান আল্লাহ তায়ালা নবী-রাসূলদেরকে মু'জিযা দ্বারা সাহায্য করা সত্ত্বেও অল্পসংখ্যক মানুষ এ দাওয়াত কবুল করেছেন। এজন্যে দায়ীরা দাওয়াতকৃত ব্যক্তিদের সামনে যেন এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এ কারণে দায়ীদের সর্বশক্তি ব্যয়পূর্বক মহান আল্লাহর কাছে সে সমস্ত জাতির জন্যে হেদায়েত কামনা এবং ধৈর্য্যধারণ ব্যতীত অন্য কোন পথ খোলা থাকে না। মহানবী (দঃ) এর দা'ওয়াতী জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা এর প্রমাণ পাই, যেমন-

১. উমর ইবনে খাত্তাবের (রাঃ) জন্যে রাসূলের (দঃ) দোয়া ঃ

ইসলামে প্রবেশের পূর্বে হযরত ওমর (রাঃ), হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর দাওয়াতের এক লক্ষ্যবস্তুতে পরিগণিত ছিলো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (দঃ) এ বলে দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ! তুমি ওমর অথবা আবু জেহেলের কোন একজনের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করো। এতদুভয়ের মধে উমরই (রাঃ) আল্লাহর নিকট বেশী প্রিয় ছিল।"[২৬]

উমরের (রাঃ) ভাগ্যে ইসলাম লিখিত ছিলো বলে তিনি ইসলাম কবুল করেছেন এবং তাঁর ইসলামে প্রবেশের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে শক্তিশালী করেন এবং মুসলমানরা প্রকাশ্যে মক্কায় বের হতে সক্ষম হন।

২. আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর মায়ের জন্যে দোয়া ঃ

ইসলামের অন্যতম দায়ী হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) তাঁর মাকে ইসলামে প্রবেশ করানোর জন্যে যথাসম্ভব সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। এতদসত্ত্বেও তাঁর মা ইসলাম কবুল করেননি বরং উল্টো রাসূল (দঃ) এর ব্যাপারে এমনসব কথা বলেছেন যা আবূ হুরায়রা (রাঃ) কে কাঁদিয়েছে। অনন্যোপায় হয়ে আবূ হুরায়রা রাসূলের দরবারে মায়ের জন্যে দোয়া প্রার্থনা করতে গেলেন। তখন রাসূল (দঃ) "হে আল্লাহ! আবূ হুরায়রার (রাঃ) মাকে হেদায়েত করো" এ বলে দোয়া করলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) এ সুসংবাদ বহন করে বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর যখন তাঁর মা টের পেলেন তখন তিনি পবিত্র হয়ে বললেন; "হে আবূ হুরায়রা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রাসূল।"[২৭]

৩. দাওস গোত্রের জন্যে রাসূলের (দঃ) দোয়া ঃ

দায়ী যতই প্রচেষ্টা, সংগ্রাম করুক না কেন দাওয়াতকৃত ব্যক্তিদের অন্তর যেন লৌহ শলাকার পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকে। তারা এর থেকে বের হয়ে মহাসত্য ও সুউজ্জ্বল আলোকে গ্রহণ করতে চায় না। এমতাবস্থায় দায়ী কর্তৃক আল্লাহর কাছে তাদের জন্যে হেদায়েত প্রার্থনা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। কারণ, তিনিইতো অন্তর সমূহের মালিক। তিনি চাইলে সকল অন্তরকে ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দিতে পারেন। এরকমই এক গোত্র দাওস, যারা রাসূলের (দঃ) দাওয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো। তখন রাসূল (দঃ) তাদের জন্যে বদদোয়া করার পরিবর্তে আল্লাহর কাছে হেদায়েত কামনা করলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা তোফায়েল ইবনে আমর রাসূল (দঃ) এর নিকট এসে বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! দাওস গোত্র অবাধ্য হয়েছে এবং ইসলামের দাওয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আপনি তাদের জন্যে বদ্‌দোয়া করুন।" লোকেরা ধারণা করলো যে, রাসূল (দঃ) তাদের জন্যে বদ্‌দোয়া করবেন। বরং তিনি "হে আল্লাহ! তুমি দাওস গোত্রকে হেদায়েত দান করো এবং তাদেরকে ইসলামে প্রবেশ করাও" এ বলে দোয়া করলেন।[২৮]

৪. বনূ ছাক্বীফের জন্যে দোয়া ঃ

বনূ ছাক্বীফকে ইসলামে প্রবেশ করানোর জন্যে রাসূল (দঃ) প্রবল আগ্রহী ছিলেন। তাদের তীরের কারণে মুসলামানদের ক্ষয়ক্ষতি হলে তাঁরা রাসূল (দঃ) এর কাছে এসে তাদের বিরূদ্ধে অভিযোগ করলে রাসূল (দঃ) তাদের জন্যে বদদোয়ার পরিবর্তে "হে আল্লাহ! বনূ ছাক্বীফকে তুমি হেদায়েত দান করো।"[২৯] এ বলে দোয়া করলেন।

৫. আহলে কিতাবের জন্যে দোয়া ঃ

ইয়াহুদীরা রাসূল (দঃ) এর কাছে এসে সর্বদা হাঁচি দিতো এ কারণে যে, রাসূল (দঃ) যেন তাদের জন্যে 'আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করুন' এ বলে দোয়া করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (দঃ) "আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়েত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থার উন্নতি করুন।"[৩০] এ বলে দোয়া করতেন। আল্লামা মোবারকপুরী (রঃ) এর কারণ বর্ণনায় বলেন, "রহমত যেহেতু মু'মিনদের সাথে খাস, সেহেতু তিনি তাদের জন্যে হেদায়াতের জন্যে দোয়া করতেন।"

৬. মুশরিকদের উপর বদদোয়া ঃ

মুশরিকদের উপর বদদোয়া করা জায়েয। নবী (দঃ) থেকে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন-কাফের মুশরিকরা যখন রাসূল (দঃ) কে উটের নাড়ীভূঁড়ি, গোবর এবং রক্ত দিয়ে কষ্ট দিয়েছিলো তখন রাসূল (দঃ) তাদের জন্যে এ বলে বদদোয়া করলেন যে, "হে আল্লাহ! কুরাইশদের দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত" এ কথা তিনবার বললেন এবং পরে একেক জনের নাম ধরে বদদোয়া করলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারে রাসূলের (দঃ) বদদোয়া কবুল করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন: "আল্লাহর শপথ আমি তাদেরকে বদরের দিন ধরাশায়ী হতে দেখেছি।"[৩১] অনুরূপভাবে, হযরত (দঃ) যখন তাদের অত্যাচারে এবং ধর্ম বিমুখতায় অতিষ্ট হয়ে যেতেন, তখন তাদের উপর বদদোয়া দিতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন- "তাদের অবস্থা এমন হলো যে, এক বছর দূর্ভিক্ষ তাদেরকে পেয়ে বসলো, এমনকি খাওয়ানোর জন্যে তারা কিছু পেল না। ক্ষুধায় অতিষ্ট হয়ে তারা চামড়া এবং মৃত জীবজন্তু খেতে লাগলো। এমনও হতো যে, ক্ষুধার জ্বালায় তারা আকাশ পানে তাকিয়ে থাকতো এবং কেবল ধোঁয়া দেখতে পেতো।"[৩২]

অনুরূপভাবে হযরত নূহ (আঃ) এর দা'ওয়াতী কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, নূহ (আঃ) নিজ জাতির উপর বদদোয়া করেছেন। তবে তা ছিল তাদের ধর্মবিমুখতা এবং পথভ্রষ্টের কারণে। তিনি নিজ গোত্রের জন্যে এ বলে বদদোয় করতেন যে, "হে আমার রব! তুমি পৃথিবীতে কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দিবে না। যদি

তুমি তাদেরকে রেহাই দাও, তাহলে তারা তোমার বান্দাহদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং কেবল পাপাচারী ও কাফেরের জন্ম দিতে থাকবে।"[৩৩] তবে এ কথা সত্য যে, নূহ (আঃ) প্রাথমিক পর্যায়েই তাদের উপর বদদোয়া করেন নি, বরং যখন তিনি নিশ্চিত জানতে পারলেন যে, তাঁর জাতি ঈমান আনবে না তখন তিনি বদদোয়া করলেন। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের বাণী- "আর নূহ (আঃ) এর প্রতি ওহী প্রেরণ করা হলো যে, যারা ইতিমধ্যে ঈমান এনেছে তাঁরা ছাড়া আর কেউ ঈমান আনবে না। অতএব, তাদের কার্যকলাপে বিমর্ষ হবেন না।"[৩৪]

অনুরূপভাবে, মূসা (আঃ)-এর দাওয়াত যখন ফেরাউন কবুল করলোনা তখন তিনি তাদের মালামাল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্যে বদদোয়া করলেন। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হচ্ছে "মুসা বললো! হে আমার পরওয়ারদিগার! তুমি ফেরাউনকে এবং তার সর্দারদেরকে পার্থিব জীবনের আড়ম্বর দান করেছো এবং সম্পদ দান করেছো। হে রব! তারা তোমার পথ থেকে দূরে সরে যাবে। হে আল্লাহ ! তুমি তাদের ধন সম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং তাদের অন্তরগুলোকে কঠোর করে দাও যাতে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে যতক্ষণ না বেদনাদায়ক আযাব প্রত্যক্ষ করে।"[৩৫] তাদের ধর্মবিমুখতা এবং অন্তরের কাঠিন্যতার জন্যেই এই বদদোয়া করা হয়েছিল।

একদা রাসূল (দঃ) কাফেরদের ধ্বংসের জন্যে বদদোয়া করলে আল্লাহ তায়ালা এ মর্মে ওহী প্রেরণ করেন যে, "হায় আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা আযাব দিবেন। এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নেই। কারণ তারা রয়েছে অন্যায়ের উপর।"[৩৬]

সুতরাং বলা যায়, হেদায়েত আল্লাহর হাতে, যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করবেন, যাকে ইচ্ছা করবেন না। আর সেজন্য দায়ীদের উচিত, একনিষ্ঠভাবে মানুষের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানো এবং তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করা। আল্লাহ হয়তোবা তাদের দোয়ার বদৌলতে অন্ধকারে নিমজ্জিত ব্যক্তিদের আলোর পথ দেখাতে পারেন।

মুসলমানদের জন্যে গোনাহ হতে পবিত্র থাকার দোয়া ঃ

গোনাহ হতে পবিত্র থাকা বলতেঃ কৃতকর্মের জন্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাওবা করা, সর্বোপরি পাপ-পংকিলতা হতে নিজেকে মুক্ত রাখাকে বুঝায়। গোনাহ করা বান্দার স্বভাবের বিপরীত নয়। কারণ, বিতাড়িত শয়তান সর্বদা মানুষের পেছনে লেগে থাকে যদি তাকে পথভ্রষ্ট করা যায়। আর এ জন্যে বান্দার উচিত আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। আর বান্দাকে ক্ষমা করার মাধ্যমেই আল্লাহ যে ক্ষমাশীল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (দঃ) বলেছেন। "সেই সত্ত্বার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি তোমরা পাপ না করো তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন এবং অন্য এক জাতিকে পাঠাবেন যারা গুনাহ করবে আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।"[৩৭]

হাদীসে কুদসীতে এসেছে যে, "হে আমার বান্দাহ! তোমরা দিবা রাত্রি পাপ করো আর আমি তোমাদের পাপকে ক্ষমা করে দিই। অতএব, তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবো।"[৩৮]

অতএব বলা যায়, ক্ষমা আল্লাহ কর্তৃক বান্দার জন্যে বিশেষ এক রহমত, যার মাধ্যমে বান্দাহ নিজের কৃতকর্মের জন্যে তাওবা করতে পারে এবং আত্মার প্রশান্তি লাভ করতে পারে। সুতরাং বান্দার উচিত অযূ, নামাজ, রোযা, হজ্ব এবং যিকরের মাধ্যমে নিজের জন্যে, নিকটাত্মীয়ের জন্যে এবং অপরের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা। নবী-রাসূলদের দা'ওয়াতী কর্মকান্ডের দিকে তাকালে আমরা এর প্রমাণ পাই। তবে শর্ত হলো যে ঈমান থাকতে হবে। কারণ রাসূল (দঃ) স্বীয় চাচা আবূ তালেবের জন্যে এবং মুশরিকদের জন্যে দোয়া করলে আল্লাহ তায়ালা এ মর্মে ওহী পাঠান যে, "নবী ও মুমিনের উচিত নয়, মুশরিকদের মাগফেরাত কামনা করা, যদিও তারা আত্মীয় হোক-একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা দোযখী।"[৩৯]

মুসলিমদের দ্বীনের উপর অটল থাকার জন্যে দোয়া ঃ

দ্বীনের দাওয়াত কবুল করলেই কেবল দায়ীদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। তাঁদের উপর নব আপতিত এক দায়িত্ব এসে যায়। তাহলো, আল্লাহর কাছে তাদের দ্বীন এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা থাকার জন্যে দোয়া করা। কারণ, মানুষের অন্তর সবসময় পরিবর্তনশীল এবং পরিবর্তন আনাতেই সে আনন্দ পায়। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ছিলেন সর্বদা সত্যের উপর অটল এবং অনড়। তিনি ছিলেন দ্বীনের সমস্ত বিষয়ের পালনকারী। এতদসত্ত্বেও তিনি দ্বীনের উপর অবিচল থাকার জন্যে বেশী বেশী দোয়া করতেন। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (দঃ) এ বলে বেশী বেশী দোয়া করতেন যে, "হে অন্তরের পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে তোমার

দ্বীনের উপর অটল রাখো। তখন আনাস (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (দঃ)! আমরা আপনার প্রতি এবং যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি ঈমান এনেছি, আমাদের ব্যাপারেও কি আপনি ভয় করেন? তখন নবী (দঃ) বললেন, হ্যাঁ, কারণ অন্তরসমূহ মহান আল্লাহর আঙ্গুলসমূহের দুটি আঙ্গুলের মাঝে। তিনি যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ পরিবর্তন করতে পারেন।"[৪০]

অতএব রাসূল (দঃ) এবং সাহাবাদের (রাঃ) অবস্থা যদি এমন হয় তাহলে আমাদের তথা দায়ীদের অতীব প্রয়োজন যে, আমরা সর্বদা আল্লাহর কাছে সত্যের উপর অটল থাকার জন্যে দোয়া করবো। কারণ, আমাদের পূর্ববর্তী নবী-রাসূলরা সর্বদা এ বলে দোয়া করতেন যে, "হে আল্লাহ আমাদেরকে সুপথ দেখানোর পর আর আমাদের অন্তরকে বক্র করে দিওনা, আর আমাদের জন্যে তোমার পক্ষ হতে রহমত দান করো, তুমিইতো দাতা।"[৪১]

সুতরাং দায়ীদের উচিত, দাওয়াতকৃত ব্যক্তি এবং মুসলমানদের জন্যে সত্যের উপর অবিচল থাকার জন্যে দোয়া করা। কারণ, মহানবী (দঃ) সর্বদা সাহাবাদের জন্যে দোয়া করতেন।

বৈষয়িক কল্যাণকর বিষয়ের জন্যে মুসলমানদের জন্যে দোয়া ঃ

কল্যাণ কেবল দ্বীনি বিষয়েই সীমাবদ্ধ নয় বরং দুনিয়াবী তথা বৈষয়িক বিষয়েরও প্রয়োজন রয়েছে যা মানুষকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং মানসিক প্রশান্তি দান করে। যেমন- ধনসম্পদ, বাসস্থান, শিক্ষা-সংস্কৃতি, প্রযুক্তিগত বিদ্যা, মহানবীর (দঃ) আহলে বদর, আহলে মদীনা, হযরত আলী (রাঃ), আনাস বিন মালিক (রাঃ), সা'দ (রাঃ), উবাই (রাঃ) সহ আরও অনেকের জন্যে বৈষয়িক কল্যাণের দোয়া করেছেন।

তাছাড়া বৈষয়িক কল্যাণ এবং নিরাপত্তা যেহেতু মানুষের স্বভাবজাত চাহিদা এবং এগুলোর প্রতিই মানুষ বেশী ধাবমান সেহেতু এগুলোকে উপেক্ষা করা যায় না।

পরিশেষে বলা যায়, দায়ীদের জন্যে দোয়া অনন্য এক প্রজ্ঞাপূর্ণ মাধ্যম। কারণ, যে সমস্ত বিষয় মুখে বলে কিংবা বুঝিয়ে সম্ভব হয় না তা কেবল আল্লাহর বিশেষ রহমতের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। আর এই রহমত লাভে ধন্য হবার অন্যতম উপায় হলো কায়মনোবাক্যে এবং দৃঢ় আস্থার সাথে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। কারণ, মহান আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না বরং তার মনোবাসনা পূর্ণ করেন। যেমন- হযরত সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (দঃ) বর্ণনা করেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা চিরঞ্জীব এবং সম্মানিত। যখন কোন বান্দাহ দু'হাত উত্তোলন করে তাঁর কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করে তখন, তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়াকে লজ্জাজনক বলে মনে করেন।"[৪২] অতএব দায়ীদের উচিত সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর উপর দৃঢ় আস্থা রেখে হেদায়েত এবং সত্যের উপর অটল থাকার জন্যে দোয়া করা।

তথ্যসূত্র

১ সূরা ক্বাসাস, আয়াত নং-৫৬
২ সূরা গাফির, আয়াত নং-৬০,
৩ আল খাত্তাবী, শানুদ-দোয়া, পৃঃ-৪, সংঃ-৩, দারুছ-ছাক্বাফাহ আল আরাবিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৩ হিজরী।
৪ বাদা'য়েদুল ফাওয়ায়েদ-৩/২
৫ সূরা গাফির, আয়াত নং-৬০
৬ আবু দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুস-সালাত, হাদীস নং-১৪৭৯, দারুল হাদীস, বৈরুত
৭ তায়ালিমী, আল-মুসনাদ, হাদীস নং-২৫৮৫, দারুল মা'রিফাহ বৈরুত
৮ সূরা আল হাশর, আয়াত নং-১০
৯ সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত নং-৯০
১০ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীস নং-১৯০৯।
১২ আবূ হামেদ আল-গাযালী, ইহয়ায়ু উলমুদ-দ্বীন, দারুন-নদওয়া আল জাদীদাহ, বৈরুত ১/৩০৪
১৩ সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল জুমুয়াহ, হাদীস নং-১১৪৫
১৪ সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং- ৪৮২।
১৫ প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৭৯৪।

১৬ সূরা ইসরা, আয়াত-১১০
১৭ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস নং-৪২০৫ ।
১৮ সূরা আল আ'রাফ, আয়াত নং-২০৫ ।
১৯ বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, হাদীস নং-৭৪৭৭ ।
২০ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সাইর, হাদীস নং-১৭৯৪ ।
২১ আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং-১৪৮১ ।
২২ ইবনে রজব, জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম (বৈরুতঃ দারুল জাবল, ১৪১৭ হি.) পৃ.১৫৬ ।
২৩ তিরমিযী, সুনান, কিতাবুদ-দাওয়াত, হাদীস নং-৩৪৭৯ ।
২৪ প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং-২১৬৯ ।
২৫ সূরা নাহল, আয়াত-৩৬
২৬ আহমদ আল-মুসনাদ ২/৯৫
২৭ মুসলিম, কিতাবু ফাদায়িলিস সাহাবাহ, হাদীস নং-২৪৯১
২৮ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সাইর, হাদীস নং-২৯৩৭
২৯ আহমদ আল-মুসনাদ ৩/৩৪৩
৩০ তিরমিযী, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং-২৭৩৯
৩১ বুখারী, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং-৫২০
৩২ ইমাম নববী, শরহে সহীহিল মুসলিম, ১৭ খন্ড, পৃ.১৪১ ।
৩৩ সূরা নূহ, আয়াত-২৬, ২৭
৩৪ সূরা হুদ, আয়াত-৩৬
৩৫ সূরা ইউনুস, আয়াত-৮৮
৩৬ আলে ইমরান, আয়াত-১২৮
৩৭ মুসলিম, কিতাবুত তাওবা, হাদীস নং-২৭৪৯
৩৮ প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিররি ওয়াস-সিলাতি, হাদীস নং-২৫৭৭
৩৯ সূরা তাওবা, আয়াত-১১৩,
৪০ আহমদ, আল মুসনাদ, ৪/১৮২
৪১ সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৮
৪২ আহমদ, আল-মুসনাদ, ৫/৪৩৮ ।

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 98-102)

চরমপন্থার উদ্ভব ও প্রতিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

জাকিয়া বিনতে আলম*

প্রাককথন ঃ

ইসলাম বিশ্বজনীন কল্যাণময়ী জীবন-বিধান। ইসলামের সত্য, সুন্দর ও সঠিক পন্থা অবলম্বনে মানুষ তার জীবনকে সফল ও সুখময় করে গড়ে তুলতে পারে। আবার অলস, অসত্য ও নিরসপথে মানুষ তার জীবনকে কুরে কুরে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। ব্যক্তিজীবন থেকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তখনই শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় যখন প্রতিটি মানুষ, সমাজ এবং রাষ্ট্র মধ্যম তথা সঠিক পন্থা গ্রহণ করে এগিয়ে যায়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই দুনিয়াতে অন্যায়-অবিচার দূর করে সত্য-ন্যায় ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য শেষ উম্মতকে أمة وسط তথা 'মধ্যম পন্থা' অবলম্বনকারী জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং صراط مستقيم তথা সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন।[১] আর এ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সকল প্রকার ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামির উর্ধ্বে উঠে এই পথ ধরেই পৃথিবী থেকে যাবতীয় অন্যায়, অনিয়ম, দুর্নীতি, অনাচার, মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করে সাম্য ও সুনীতি প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছিলেন।[২] কিন্তু আজ মুসলিম জাতির কিয়দংশ অকাট্য ও নিগূঢ় সত্যপথ পরিহার করে ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি ও চরমপন্থার কবলে নিপতিত, ইসলাম বিদ্বেষী কার্যক্রমে জড়িত। এজন্যই বিখ্যাত পাশ্চাত্য দার্শনিক জর্জ বার্নাডশ যখন ভারতে এসেছিলেন তখন তাকে ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সংক্ষেপে উত্তর দেন-

"Islam is the best religion in the world, but muslims are the worst people in the world because they are far away from their idiology.[3]

বক্ষমান নিবন্ধে আমি গোঁড়ামি ও চরমপন্থার বিভিন্ন দিক ও তার প্রতিকার নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পাবো-ইনশাআল্লাহ-

চরমপন্থার গোড়ার কথা:

চরমপন্থা বা গোঁড়ামি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হল- অন্ধবিশ্বাস, উগ্রপন্থা, রক্ষণশীলতা, নতুন কিছু মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানানো।[৪] ইংরেজীতে orthodoxy, bigotry, blind faith, conservation and extremism হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।[৫] ইস্তাম্বুলের সর্বোচ্চ ধর্মযাজককে প্রধান বিশপ হিসেবে স্বীকৃতি দানকারী চার্চ the orthodox church (গোঁড়া গীর্জা) বলা হতো। সোভিয়েত ইউনিয়ন, রোমানিয়া, গ্রীস ইত্যাদির স্বায়ত্ত্বশাসিত চার্চ সমূহের গোষ্ঠিকেও the orthodox church or the eastern church বলা হয়।[৬,৭] বর্তমানেও ইউরোপের অনেক church গোঁড়ামিতে অটল। রাষ্ট্রও পরিবর্তনের স্বার্থে তারা দ্বিমত পোষণ করে। ইংরেজদেরও সুদীর্ঘ ইতিহাসের পরতে পরতে গীর্জা বা চার্চের ধর্ম যাজকদের গোঁড়ামি ও চরমপন্থার কারণে রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে তাদের বিরোধ ছিল তুঙ্গে।[৮] ১৫০০ শতাব্দীর The Renaissance'র পূর্ব পর্যন্ত চার্চের গোঁড়া নির্দেশনা অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনায় বাধ্য থাকতেন সিংহভাগ রাজা-বাদশাহগণ। ধর্ম, গীর্জা ও বাইবেলকে ব্যবহার করে তারা ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুর একচ্ছত্র মালিকানা দাবী করে রাষ্ট্রযন্ত্রের কলকাঠি নাড়তো। কিন্তু The Renaissance তথা বিপ্লবোত্তর যুগে গীর্জার Heavenly Bodies বা জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত Geo-Centric ধারণার বিপরীতে Helio-Centric তত্ত্ব আবিষ্কারের ফলে চিরদিনের জন্য ধর্ম, গীর্জা, বাইবেল প্রভৃতির ধারক-বাহকদের ক্ষমতার প্রাধান্য খর্ব হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে তারা কোনঠাসা হয়ে পড়ে।[৯]

পক্ষান্তরে তৎকালীন আরব সমাজেও গোঁড়ামি এবং চরমপন্থার বিভিন্ন দৃশ্য সুস্পষ্ট বিদ্যমান ছিল। সতীদাহ প্রথা, জীবন্ত কন্যা-সন্তান পুঁতে ফেলা, দাস-দাসীদের সাথে পশুর মতো আচরণ, সামান্য ব্যাপারে খুনো-খুনি, বংশ মর্যাদার জন্যে বছরের পর বছর যুদ্ধ, হাট-বাজারে পণ্যদ্রব্যের মত মানুষের বেচা-কেনা এবং ধর্মান্ধতার ফলে গাছ, বাঁশ, আগুন, পাথর, পশু, মূর্তি, সূর্য, চন্দ্রসহ বিভিন্ন বস্তুর পূজা-ই তাদের গোঁড়ামি ও চরমপন্থার

* ৬ষ্ঠ সেমিস্টার, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

প্রমাণ বহন করে। ঐতিহাসিকরা এই চরম গোঁড়ামি, জবরদস্তি ও বাড়াবাড়ির যুগকে আইয়ামে জাহেলিয়া তথা অন্ধকার যুগ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১০] বুঝা যায়, গোঁড়ামি, জবরদস্তি ও চরমপন্থার শেষ পরিণাম অন্ধকার ও পতন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ অন্ধকার, গোঁড়ামি, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, নিপীড়ন, বঞ্চনা, বৈষম্যের শৃঙ্খল ভেঙে মানবতার দূত প্রেরণ করেন। তিনি শ্বেতাংগ-কৃষ্ণাংগ, ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ, আমীর-ফকিরের জাত্যাভিমানের ভেদাভেদ ঘুচিয়ে সমাজে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, সংহতি ও ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।[১১] তাই প্রখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ, ইতিহাসবিদ ও গবেষক আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন-

" First of all he (prophet) removed the sword of hanging over the head of humanity by giving if a new ideal to live for and a new zest and confidence to work for it. A new age of culture and civilization arts and learning, material and spiritual progress- a new brave world came into existence through his efforts."[12]

ইসলামের ইতিহাসে চরমপন্থা বা গোঁড়ামি:

ইসলামের আবির্ভাবের পর মহানবী (সাঃ) যখন আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দেন তখন মক্কার গোঁড়া কাফের বা তাদের পূর্ব-পুরুষদের পৌত্তলিক ধর্ম আঁকড়ে ধরে রাখে এবং উগ্রপন্থা ও চরমপন্থা অবলম্বন করে মহানবী (সাঃ) এর উপর পাথর নিক্ষেপ, পথে কাঁটা দেয়া, মরণঘাতী জাদু, তাবুক প্রান্তরে দন্ত মুবারক শহীদ[১৩] এবং শেষ পর্যন্ত জঙ্গিবাদী (Extremist) হয়ে তাকে হত্যা-প্রচেষ্টার চরম ধৃষ্টতা দেখায়।[১৪] আবার খোলাফায়ে রাশেদার শেষ যুগে ইহুদী চক্রান্তে হযরত উসমান (রাঃ) এর শাহাদাতের পর ইসলামী খেলাফতে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর মতানৈক্যের ফলে মুসলিম উম্মাহ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। হযরত আলী (রাঃ) এর অনুসারীদের বলা হতো শী'আতে আলী (আলীর অনুসারী)। পরবর্তীতে সীফ্ফীনের যুদ্ধে হযরত আলী হযরত মুয়াবিয়ার প্রস্তাবে রাজী হলে এবং সন্ধির ফলাফল তাঁর অনুকূলে না যাওয়ায় একদল শিয়া হযরত আলীর পক্ষ ত্যাগ করে আলাদা হয়ে যায়। এদেরকে ইসলামের ইতিহাসে খারেজী বলা হয়। এই খারেজীরাই ইসলামের ইতিহাসে চরমপন্থী হিসেবে খ্যাত। এরা হযরত আলী (রাঃ) কে সহ অনেককে হত্যা করে এবং সারা মুসলিম সাম্রাজ্যে হিংস্র তৎপরতায় লিপ্ত হয়। শিয়া ও তাদের প্রতিপক্ষের নারী পুরুষসহ শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে হাজারো মুসলমান তাদের বর্বর শিকারে পরিণত হয়।[১৫] ইতিহাসের উক্ত ধারাবাহিকতায় বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় সেই চরমপন্থীদের দেখা যায় বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গোঁড়ামি, উগ্রপন্থা ও চরমপন্থা অবলম্বন করে সমাজকে অশান্ত ও মুসলিম জাতিকে কলংকিত করছে।

চরমপন্থার প্রকারভেদ:

গোঁড়া ও চরমপন্থীদের মূলতঃ দু'টি দলে বিভক্ত করা যায়। যথা: ১। মজ্জাগত গোঁড়া বা বংশগত চরমপন্থী ও ২। পারিপার্শ্বিক প্রভাবে চরমপন্থী বা উগ্রপন্থী।

মজ্জাগত খাঁটি, গোঁড়া ও উগ্রপন্থী জাতির উদাহরণ হল: বর্তমান মুসলিম বিশ্বের বিষফোঁড়া, অভিশপ্ত ঘাতক ইহুদী জাতি এবং দ্বিতীয় উদাহরণে বলা যায়- ভারতের আর্য সম্প্রদায়ভুক্ত চরম ও উগ্রপন্থী শিখ জাতি।

পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন শোষণ নির্যাতনের কারণে যারা সাময়িক চরমপন্থা ব্যবহার করে, প্রতিশোধ বা প্রতিরোধের উগ্রপন্থা অবলম্বন করে মুক্তির ঠিকানা খোঁজে তাদেরকে পারিপার্শ্বিক প্রভাবের কারণে চরমপন্থী বলা যেতে পারে। যেমন- ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী আপামর জনসাধারণ, কাশ্মীরের আযাদীপ্রিয় শোষিত জনগণ ও বিপথগামী কিছু মুসলিম কায়েমীগোষ্ঠী।

চরমপন্থা উদ্ভবের কারণ:

ইসলামে বাড়াবাড়ি, গোঁড়ামি ও চরমপন্থার কোন স্থান নেই। বরং এখানে শান্তিপূর্ণ সুশৃঙ্খল সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের জোর তাগিদ এবং কালজয়ী নীতিমালা অনুসরণের উৎসাহ প্রোথিত। মানুষের স্বাভাবিক জীবনে চরমপন্থা ও উগ্রপন্থার স্থান নেহায়েত নেই বললেই চলে। তবুও ইতিহাসের কাল পরিক্রমায় গোঁড়ামি ও চরমপন্থার উদ্ভব দেখা যায়। এগুলো এমনিতে সৃষ্টি হয়নি। এর উৎপত্তির অনেক কারণ বিদ্যমান, অনেক পরিস্থিতি বিরাজমান। মানুষের ব্যক্তিগত থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, বুদ্ধিবৃত্তিক সহ বিভিন্ন কারণ রয়েছে। এর কোনটা প্রত্যক্ষ, কোনটা পরোক্ষ, কোনটার

IIUC-CENTRAL LIBRARY
ACC. NO.-10160

মূল সুদূর অতীতে, আবার কোনটার উৎপত্তি সাম্প্রতিক কালের, কখনো অধিকার-বঞ্চিত, শোষিত ও নির্যাতিত মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয় আবার কখনো ক্ষমতাসীন সরকারের দুর্নীতির কারণেও জন্ম লাভ করে। দেশের জনগণের অধিকার হরণ, স্বেচ্ছাচারিতা, স্বার্থান্বতা, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ এবং ইসলামের শত্রুদের সাথে সরকারের সম্পর্ক বজায় রাখার কারণেও গোঁড়ামি ও চরমপন্থা বিস্তার লাভ করে। অনেকক্ষেত্রে চরমপন্থীর ব্যক্তিগত জ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, তার পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি কারণে এটি সৃষ্টি হয়। গোঁড়ামি ও চরমপন্থার কিছু মৌলিক কারণ নিম্নে তুলে ধরা হলো-[১৬]

১. ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা: ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও কিছু মানুষ আছে যারা এ সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই তাদের একটি দল অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলামের আবেদন ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে বৃহত্তর অঙ্গনে অনৈসলামিক মতবাদ সমূহের সমর্থক ও অনুসারী হয়ে উঠে। অপর একটি দল অধর্মকে ধর্ম ভেবে ইসলামের সঠিক বিধান পরিহার করে কুসংস্কারের পথ তথা গোঁড়ামি ও চরমপন্থার আশ্রয় নেয়। অথচ মহান আল্লাহ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন-[১৭]

(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)

২. জীবনের মৌলিক জ্ঞানের অভাব: দ্বীন সম্পর্কে যথার্থ ও মৌলিক জ্ঞানের অভাব চরমপন্থার অন্যতম কারণ। দ্বীনি জ্ঞানের স্বল্পতা, দ্বীনের বিধি-বিধানের রহস্য উদঘাটনে ব্যর্থতা এবং তার উদ্দেশ্য ও চেতনা অনুধাবনে অপারগতা চরমপন্থার জন্ম দেয়। এভাবে শরীয়তের বিধি-বিধান সমূহের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য না বুঝে ইচ্ছেমতো অভিমত গ্রহণ ও সহজেই এ সমস্যার জন্ম দেয়।[১৮]

৩. নাফসের প্রাধান্য: তাক্বওয়া অর্জনের মাধ্যমে মানুষ ঐক্য, শান্তি ও সংহতি লাভ করে। পক্ষান্তরে উগ্রতা ও চরমপন্থা সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ হল নাফসানিয়াত ও শয়তানিয়াত। আল্লাহ পাক এই শয়তানিয়াত থেকে দূরে থেকে তাক্বওয়া অর্জনের নির্দেশ দিয়ে বলেন:

"হে ঈমানদাররা তোমরা আল্লাহকে যথার্থরূপে ভয় কর।" (আলে ইমরান-১২০)

৪. ইসলামী শিক্ষার দৈন্যদশা: মধ্যযুগের মুসলমানগণ জ্ঞানের অপূর্ব ভান্ডার, কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়ন করে বিশ্বময় একটি নতুন ও উৎকৃষ্ট সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল। তাদের মধ্যে যেমন সৃষ্টি হয়েছিল মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফক্বীহ, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক তেমনি তাদের মধ্যে জন্ম লাভ করেছিল অসংখ্য রসায়নবিদ, পদার্থবিজ্ঞানী, চিকিৎসাবিদ, ভূগোলবিদ, আলোক বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিদ প্রভৃতি। বস্তুতঃ এ নতুন ইসলামী সভ্যতাই ছিল ইউরোপীয় রেনেঁসার অনুপ্রেরণা। ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছোঁয়া লেগে অন্ধকার ইউরোপে নবজাগরণের সূত্রপাত হয়। ইউরোপের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় Parish University সহ যত গুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিলো সবগুলোই ছিল স্পেন ও বাগদাদের মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর আদলে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বর্তমান ইসলামী দুনিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থার দৈন্যদশার ফলে অধিকাংশ যুবক শ্রেণী হতাশ, বেকার। ফলে তারা উগ্রতা ও চরপন্থাকেই আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করেছে।

৫. মুসলমানদের বিরুদ্ধে নগ্ন অপপ্রচার: বর্তমান বিশ্বে উগ্রপন্থী ও চরমপন্থী বলে যাদের আখ্যায়িত করা হচ্ছে তারা মুসলমান। নীরবে, শান্তিতে সুশৃংখলভাবে কোথাও ইসলামের অগ্রযাত্রা দেখলেই কাফের শক্তি তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করে দমানোর অপচেষ্টা চালায়। ফিলিস্তিনের জনগণ নিরবে ভোট বিপ্লব ঘটিয়ে ইসলামের পক্ষে হামাসের পক্ষে রায় দেয়, তুরস্কে গত নির্বাচন ইসলামী শক্তি নীরব বিপ্লব ঘটায় এবং সম্প্রতি ইরানে ইসলামী শক্তির একচ্ছত্র বিজয় অর্জিত হয়। মুসলিমদের এ সব অগ্রযাত্রাকে কাফির ও ইহুদী শক্তি সহ্য করতে না পেরে বল প্রয়োগপূর্বক এবং উগ্রপন্থায় দমানোর চেষ্টা চালায়। আবার তাদের এই উগ্রপন্থা ও চরমপন্থা অবলম্বনকে মিডিয়ার সাহায্যে উল্টো মুসলমানদের উপর উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর ব্যবস্থা করে মুসলিমদেরকে উগ্রপন্থী ও চরমপন্থী বলে জঘন্য, নগ্ন ও ডাহা মিথ্যা অপপ্রচার চালানো হয়।

৬. মুলসমানদের সম্পদ দখলের অপচেষ্টা: সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী আল্লাহ পাক মুসলমানদের তৈল, স্বর্ণ, কয়লা, গ্যাসসহ যাবতীয় মূল্যবান সম্পদ দান করেছেন। সম্পদের লোভে যখন অমুসলিম শক্তি এসব দখলের অপচেষ্টা চালায় তখনই প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় এবং এই প্রতিরোধের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালায় মুসলিমরা উগ্রপন্থী ও চরমপন্থী বলে। আমেরিকা তেলের লোভে উগ্রপন্থী হয়ে মিথ্যা অজুহাতে ইরাক ধ্বংস করে দিল এবং মুসলিম স্বাধীনতাকামীরা অভিযুক্ত হল সন্ত্রাসী, জঙ্গীরূপে। তাই এসব পারিপার্শ্বিক প্রভাবে অনেকে পা বাড়ায় চরমপন্থার দিকে।

৭. ইসলামী শক্তি দমানোর অপকৌশল: ড. আল্লামা ইকবাল এর মতে- "মুসলমানদের মাঝে দাওয়াতের স্পিরিট যতদিন সমুন্নত থাকবে ততদিন দ্বীন ইসলাম বিজয়ী থাকবে।" মুসলমানদের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টি করে দেয়ার জন্যে কাফের শক্তি নানা অপকৌশল প্রয়োগ করছে ও নির্যাতন চালাচ্ছে। তাদের এ জুলুমের ন্যায্য প্রতিবাদ করতে গিয়ে ইসলামী দলগুলো আত্মরক্ষার চেষ্টা করে লড়াই করে। তখন এ আত্মরক্ষার প্রচেষ্টাকে বলা হয়- গোঁড়ামি, চরমপন্থা, জঙ্গীবাদ ও উগ্রবাদ। পক্ষান্তরে জালিম শক্তিকে দেয়া হয় সাধুবাদ ও ধন্যবাদ।[১৯] আল্লাহপাক বলেন- "ঈমানদার আল্লাহর পথে লড়াই করে আর কাফিররা শয়তানের পথে লড়াই করে।

৮. সংঘাত এবং বৈদেশিক চক্রান্তের শিকার হওয়া: বৈদেশিক চক্রান্তের ফাঁদে পড়ে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশলের পরিবর্তে সংঘাতের পথ অনুসরণ, বিশ্বব্যাপী হতাশা ও মুসলিমদের ব্যর্থতা, অধিকার বঞ্চনা, অনৈক্য-বিভাজন, সংকীর্ণ মানসিকতা, ব্যক্তিপূজা সহ বিবিধ কারণে গোঁড়ামি, চরমপন্থা ও উগ্রবাদের উদ্ভবে দায়ী।[২০]

চরমপন্থা দমন বা প্রতিকারের উপায়:

চরম ও উগ্রপন্থা প্রতিকারের মৌলিক ও বৈষয়িক কিছু উপায় সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হল:

১. দ্বীনের তথা কুরআন-হাদীসের বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করা।
২. সহীহ আক্বীদার প্রচার-প্রসার ঘটানো।
৩. সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অমীয় বাণী তথা শৃংখলা ও সাম্যের বাণী পৌছে দেয়া।
৪. খোদায়ী জীবন বিধান অনুসারে দেশ পরিচালনা করা।
৫. প্রত্যেককে স্বীয় অধিকার প্রদান করা ও ন্যায্য অধিকার অর্জনের পথে বাঁধা সৃষ্টি না করা।
৬. প্রকৃত মানুষ গড়ার লক্ষ্যে কর্মমুখী ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা।
৭. অন্যায়ভাবে কোন দেশ আক্রমণ বা ভূমি জবর দখল থেকে বিরত থাকা।
৮. অহেতুক হয়রানি, নির্যাতন, জুলুম ও হত্যা বন্ধ করা।
৯. পরস্পর সীমালংঘন না করা।
১০. মিথ্যা অপপ্রচার বন্ধ করা।
১১. অস্ত্র-সংঘাতের পথ এড়িয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশলের আশ্রয় নেয়া।
১২. ইসলাম প্রচারে রাষ্ট্রকর্তৃক দমন-পীড়ন নীতি বন্ধ করা।
১৩. শিরক, কুফরী ও বিদআত পরিহার করা।
১৪. ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামি পরিহার করে মধ্যম পন্থায় উদার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যাওয়া।
১৫. প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সভা-সেমিনার, বক্তৃতা-লেখনি ইত্যাদির মাধ্যমে উগ্রপন্থা ও গোঁড়ামির উৎস, কুফল ও প্রতিকার সম্পর্কে জাতিকে অবগত করা।
১৬. সর্বোপরি সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ইঙ্গ-মার্কিন-ইহুদী সন্ত্রাস, আগ্রাসন ও দখলদারিত্ব বন্দ করা।[২১]

এসবের ব্যত্যয় ঘটলে হাজারো মুসলিম/অমুসলিম ধর্মান্ধ, গোঁড়া ও চরমপন্থী জন্ম নিবে, আর তথাকথিত (!) শ্রীলংকার্ তামিল টাইগারদের মতো, নেপালের মাওবাদীদের মতো, ভারতের ত্রিপুরা-মনিপুর রাজ্যের স্বাধীনতাকামীদের মতো, ল্যাটিন আমেরিকার ভেনিজুয়েলা ও কিউবার মতো এসব সংগঠন, দেশ ও জাতি নিশ্চয় শোষণ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আপোষহীন নীতি ও চরমপন্থা অবলম্বনে বাধ্য হবে। অন্যদিকে ফিলিস্তিনের মুক্তিকামী হামাস, সিরিয়ার হিজবুল্লাহ, পাকিস্তানের জাইসুল্লাহ, আফগানিস্তানের তালেবান, নাইজেরিয়ার আল শাবাব, লেবাননের নসরুল্লাহ ইত্যাদি সংগঠন ও তাদের মুক্তি সংগ্রাম, ইসলাম রক্ষা ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়ে যাবে আজীবন। ফলে Result দাড়াবে উল্টো। গোঁড়ামি ও চরমপন্থা দমনের বিপরীতে বেড়ে যাবে স্বাধীনতাকামী, মুক্তিকামী, আগ্রাসন বিরোধী ও দখলদার বিরোধীর সংখ্যা। সৃষ্টি হবে আরও অনেক চরম ও উগ্রপন্থী ত্রিমুখী লড়াইয়ে আরও অশান্ত হয়ে উঠবে পৃথিবী।

শেষ কথা:

দুনিয়াজুড়ে শান্তি ও সাম্যের একমাত্র চিরন্তন গ্যারান্টি হল Islam. ইসলাম শান্তি, সত্য, সুন্দর, সঠিক ও উদার পন্থার কথা বলে। গোঁড়ামী ও চরমপন্থার স্থান ইসলামে নেই। ইসলামের বিধান নিয়ে বাড়াবাড়ি ও গোঁড়ামি করতে হাদীসে স্পষ্ট নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে- (لا تغلوا في الدين)

ইসলাম মধ্যম পন্থাকে সর্বোত্তম পন্থা বলে ঘোষণা দিয়েছে। ইসলামী জ্ঞানের স্বল্পতায় গোঁড়ামি, মজ্জাগত গোঁড়ামি, অবৈধ স্বার্থের জন্য চরমপন্থা ও উগ্রপন্থা অবলম্বন, বেআইনী ও নিষিদ্ধ কার্য সম্পাদনের জন্য গোঁড়ামি, ধর্মের ব্যাপারে গোঁড়ামি সবই ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। কিন্তু ইসলামের, ইসলামী রাষ্ট্রের এবং মুসলমানদের বৈধ অধিকার কেউ হরণ করার জন্য নগ্ন হস্তক্ষেপ করলে তা অবশ্যই প্রতিহত করতে হবে। কোন অপশক্তি কারো বৈধ টুঁটি চেপে ধরার চেষ্টা করলে, মাতৃভূমি কেড়ে নেয়ার দুঃসাহস দেখালে, আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এলে এবং বৈধ অধিকার ও স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়ার অপচেষ্টা চালালে তা প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার নাম চরমপন্থা ও উগপন্থা নয়; বরং বেঁচে থাকার তথা টিকে থাকার সংগ্রাম। বুঝতে হবে- আগ্রাসী, হুমকিদাতা, আক্রমণকারী এবং উগ্রভাবে নির্বিচারে পৃথিবীব্যাপী মুসলমান নিধনকারীরা গোঁড়া ও চরমপন্থী ? নাকি জান নিয়ে বেঁচে থাকার ন্যুনতম অধিকার রক্ষার প্রয়াসীরা গোঁড়া ও চরমপন্থী ? আসলে এ দুটি শব্দের বিকৃত রূপের ব্যবহার এতই বেশী বিস্তার লাভ করেছে যে- "চোর এখন গেরস্থ এবং গেরস্থ এখন চোর।"

তথ্য নির্দেশিকা:

১ আল-কুরআন- সুরা আল ফাতেহা : ৬

২ সীরাতুন্নবী-আল্লামা শিবলী নুমানী, খন্ড-২, ঢাকা।

৩ Islam the best way- Sayed Subhan Nadwi- India

৪ সংসদ বাংলা অভিধান- কলকাতা, প্রকাশ: ১৯৯০ইং

৫ English-Bengali Dictionary, Bangla Academy- June 1993 Page : 173

৬,৭ Bangali-English Dictionary, Bangla Academy- June 1994 Page : 534
Oxford Dictionary- Oxford University 1992 Page : 933

৮ England History- L.K Mukharji 1989 Page : 129, 132, 133

৯ ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস ক্যালেন্ডার, H.M Aminul Hoque- CU- 1999.

১০ Muhammed The Final Messengar- Dr. Majid Ali khan. Page : 337

১১ মাসিক আল হক, মার্চ '০৯ইং, প্রবন্ধকার ড. আ.ফ.ম খালেদ হোসেন-চট্টগ্রাম। পৃ: ১২

১২ Mercy for the worlds: Sayyid Abul Hassan Ali Nadwi AIRP Series No-101. Page : 15

১৩ আর রাহীকুল মাখতুম- খাদীজা আকতার রেজায়ী, অনুদিত আল কুরআন একাডেমী, লন্ডন।

১৪ ইসলামের ইতিহাস, কে. আলী, আ.বুক ডিপো, ঢাকা, পৃ: ১৬৮, ১৭১।

১৫ মাসিক আল হক, জুন-জুলাই '০৯, প্রবন্ধকার: মা: ফুরকানুল্লাহ খলীল, চট্টগ্রাম, পৃ: ১০।

১৬ আত তারীখুল ইসলামী, আল্ ফাতাহ পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৯ পৃ: ২০১, ২০৪।

১৭ আল কুরআন, সূরা আল মায়েদা।

১৮ আত তারীখুল ইসলামী, আল ফাতাহ পাবলিকেশন, ঢাকা-২০০৯। পৃ: ২০১, ২০৪

২০ আল কুরআন (সুরা নিসা : ৭৬)।

২১ ইসলাম ও মৌলবাদ (নির্বাচিত)। ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, ঢা.বি.।

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 103-110)

"সমকালিন বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট ও আল-কোরআনের সমাধান"

মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ*

ভূমিকা ঃ

সম্প্রতি বিশ্ব অর্থনীতিতে বিরাজ করছে অর্থনৈতিক মহামন্দা। এ মহামন্দার ক্ষতিকর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে ইউরোপ ও এশিয়াসহ বিশ্বময়। বিশ্ব অর্থনীতিতে আরো বিপর্যয়ের অশনিসংকেত লক্ষ্য করেছেন দূরদর্শী অর্থনীতিবিদগণ। এ মহামন্দা মূলত পুঁজিবাদের ব্যর্থতাকেই প্রমাণ করেছে। মহামন্দা পুঁজিবাদের অনিবার্য পরিনতি। কৃত্রিম মুনাফা, ফটকাবাজারি, সম্পদের কেন্দ্রীকরণ, সেচ্ছাচারী ভোগবিলাস, স্বার্থপরতা, নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদির কারণে বার বার হোঁচট খাচ্ছে পুঁজিবাদ। মহামন্দায় আক্রান্ত হয়ে বার বার সর্বশান্ত হয়েছে বিপুল সংখ্যক সাধারন মানুষ। এই মহামন্দার কবল থেকে পুঁজিবাদের ডুবোজাহাজকে টেনে তোলার জন্য বারবারই গ্রহণ করা হয়েছে নানা পদক্ষেপ। কিন্তু প্রতিষেধক দিয়ে সাময়িকভাবে কিছুটা উপকার পাওয়া গেলেও দীর্ঘ মেয়াদে এর কোনো প্রভাব নেই। অর্থনীতির শরীরে যদি বিপর্যয় প্রতিরোধকারী উপাদান না থাকে তাহলে বাহির থেকে কিছু প্রবেশ করিয়ে অর্থনীতিকে বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখা যায় না। মহামন্দাকে চিরতরে নির্মূলের জন্য প্রয়োজন অর্থনীতির পদ্ধতিগত পরিবর্তন।

কেন কোরানিক সমাধান?

বিশ্ববাসীর জন্য আল-কোরআন সর্বশেষ হেদায়েত। আল্লাহ তায়ালা বলছেন "যখন তোমাদের কাছে আমার হেদায়েত আসবে তখন যারা সে হেদায়াতের আনুগত্য করবে তাদের কোন ভয় নেই তারা চিন্তিত হবে না" (সুরা আল বাকারা:৩৮)। সুতরাং যে কোন সংকটে কোরানিক সমাধানই সবচেয়ে স্থিতিশীল, নিরাপদ সমাধান। এ সমাধান মেনে না নিলে যে সংকট আসবে সেকথাও বলা হয়েছে। "যে আমার এ কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জন্য রয়েছে সংকীর্ণতার জীবন" (সূরা ত্বাহা : ১২৪)। আল-কোরআন মানুষকে জাহিলিয়্যতের তিমির অন্ধকার থেকে বের করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেছে। আল-কোরআনের ভবিষ্যৎবাণী, তার রচনাশৈলী, তার বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত সমূহ এবং তার বিধি-বিধান সমূহের অলৌকিকতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। এই অলৌকিকতার চ্যালেঞ্জ আলাহ্ তায়ালা কেয়ামত পর্যন্ত দিয়ে রেখেছেন "তোমাদের যদি আমার বান্দর উপর নাযিলকৃত কোরআনে সন্দেহ হয় তাহলে এর মত একটি সূরা তৈরি করে আনো এবং এতে তোমাদের প্রাপ্ত সকল শক্তির সহযোগীতা নাও। যদি তোমরা না পার এবং তোমরা কখনও পারবেওনা তাহলে ঐ আগুন কে ভয় কর যার ইন্দন হবে মানুষ ও পাথর" (আল বাকারা:২৩-২৪)। অদ্যবধি এ চ্যালেঞ্জকে ভেদ করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। এটি সমকালিন বিশ্বের সকল চিন্তাবিদদের জন্য চ্যালেঞ্জ। আজকের পুঁজিবাদের ব্যর্থতা ও অর্থনৈতিক সংকটের কাছে তার অসহায় আত্মসমার্পণ এবং দুদশক পূর্বে সমাজতন্ত্রের অসহায় আত্মসমার্পন কোরানিক চ্যালেঞ্জের যথার্থতা প্রমাণ করছে। এ কারণে বর্তমান সংকটের যত বিকল্প অনুসন্ধান করা হোকনা কেন, কোরআনের ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক সমাধানই শ্রেষ্ঠ বিকল্প হিসাবে প্রমাণিত হবে ।

পুঁজিবাদের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের সাথে ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলোর তুলনা

ক) জীবন দর্শনের পার্থক্যঃ

পুঁজিবাদের জীবন দর্শন হলো জড়বাদী বা বস্তুবাদী জীবন দর্শন যেখানে এই নশ্বর জীবন পুরোপুরি ভোগের বস্তু বলে স্বীকৃত। ভোগের পরিমানও লাগামহীন ও অপরিমেয়। সেখানে প্রকাশ্যে 'জোর যার মুলুক তার' নীতি ঘোষিত না হলেও বাস্তবতা তাই-ই। ভোগের সামগ্রী অহরণের জন্যে, ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থতার জন্যে হালাল-হারাম বৈধ-অবৈধ ও ন্যায় -অন্যায়ের বাছ বিচার করা হয়না। জীবনটা যেহেতু স্বল্প দিনের এবং কবে তার সমাপ্তি তা জানা নেই তাই কত অল্প সময়ে কত বেশী ভোগ করা যায়, কত কম ব্যয়ে কত বেশী উপার্জন করা যায় সেই প্রতিযোগিতাই এখানে তীব্র।

---

* সহকারী অধ্যাপক, কোরানিক সাইন্সেস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

জীবন দর্শন সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান ইসলামের। ইসলামী জীবন দর্শনের মূল ভিত্তিই হলো তাওহীদ, রিসালত ও আখিরাত। মানুষের স্রষ্টা আলাহই তার রব এবং তিনিই তার ইহকাল ও পরকালের জীবনের মালিক। ইহকালের এই জীবনে চলার পথ দেখাবার জন্যে তিনি যুগে যুগে নবী-রাসুলদের প্রেরণ করেছেন, তাঁদের মাধ্যমে মানব জাতির কাছে পাঠিয়েছেন হোদায়েতের বাণী। এ বাণী অনুসারে মানুষকে চরম ভোগ লিপ্সা ইন্দ্রিয় লালসা থেকে মুক্ত হতে হবে। সে আলোকে চললে জীবন হবে সত্য ও সুন্দরের, কল্যাণ ও মঙ্গলের। পরিণামে আখিরাতে তার জন্যে রয়েছে অনন্ত পুরস্কার ও শান্তি। এরই ব্যত্যয় ঘটাতে মরদুদ শয়তান সদা সচেষ্ট। শক্তিশালী ঈমানই তাকে এ বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করতে পারে। মুমিনের কাছে এই দুনিয়া পরকালের জন্যে কর্ষণক্ষেত্র। সুতরাং, তার কাছে জড়বাদীতা যেমন গ্রহণযোগ্য নয় তেমনি গ্রহণযোগ্য নয় দ্বান্দিক বস্তুবাদ। বরং আলাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস, তাঁরই প্রেরিত ঐশী বাণী আল-কোরআন ও রাসূলে করীমের (স.) সুন্নাহ হলো তার জীবনের ধ্রুবতারা।[১]

খ) ধর্মীয় বিশ্বাস

বিভিন্ন ধর্মে ব্যক্তিজীবন, এমনকি পারিবারিক জীবনের আচরণবিধি থাকলেও সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনদর্শন কারোরই নেই। অর্থনৈতিক সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক-কোনো ক্ষেত্রেই এসব ধর্মের কোন নীতি নির্দেশনা নেই, কোনো বিধি বিধান নেই। পুঁজিবাদে সব ধর্মই সহঅবস্থান করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অসুবিধা না ঘটিয়ে, পুঁজিবাদী উৎপাদন চক্রের কোনোও রকম বিঘ্ন না ঘটিয়ে বা রাষ্ট্র ক্ষমতায় হস্তক্ষেপের কোনো আশংকা সৃষ্টি না করে ব্যক্তি তার আপন গৃহে অথবা উপসনালয়ে ধর্ম চর্চা করতে পারে। সেটুকু স্বাধীনতা তার আছে।

ইসলামের অবস্থান এর বিপরীতে। ব্যক্তিজীবন হতে শুরু করে পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন সকল ক্ষেত্রেই ধর্মের অনুশাসন বাস্তবায়ন অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে আলাহ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত বিধি-নির্দেশ বাস্তবায়ন ইসলামের দাবী। এই লক্ষ্যেই নবী-রাসুলরা সংগ্রাম করে গেছেন আজীবন। ব্যক্তি পূজা, মুর্তি পূজা, ইন্দ্রিয় পূজা সকল কিছুর বিরুদ্ধেই ইসলামের অবস্থান। মানুষ একমাত্র তার ইলাহ বা রব ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করবে না, আর কারো হুকুম মান্য করবে না এ শিক্ষা ইসলামের।

গ) ব্যক্তি স্বাধীনতা

পুঁজিবাদে ব্যক্তির স্বাধীনতা নিরংকুশ; পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থায় একজন লোকের নিজের খেয়াল খুশী মতো যেকোন কিছুই করার স্বাধীনতা রয়েছে। তার এই স্বাধীনতা খর্ব করতে পারে শুধু তারই তৈরি আইন অর্থাৎ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত পার্লামেন্ট অথবা স্বৈরাচার শাসক, ক্ষেত্র বিশেষে সামরিক জান্তা। শুধু ভোগই নয়, বিনিয়োগ বন্টন, উৎপাদন, পারিবারিক জীবন, সাংসারিক জীবন- সর্বত্রই তার এই স্বাধীনতা স্বীকৃত ও কাজে-কর্মে প্রতিফলিত। ইন্দ্রিয়পরায়ণতাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ইসলামের দাবী খুবই যৌক্তিক। ইসলামে আলাহ ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দিয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত অবাধে চলাফেরার, স্বাধীনভাবে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনার। সেক্ষেত্রে তার নিয়ন্তা হবে তারই বিবেক, তার ধ্রুবতারা হবে আল-কুরআন ও সুন্নাহ। বিবেক কখনই মানুষকে অশুভ বা অন্যায়ের দিকে ধাবিত হতে রায় দেয় না। সেই রায় আরও সুন্দর, কল্যাণমুখী ও সমাজের জন্যে সর্বৈব মঙ্গলের হয়ে দাঁড়ায় যখন তা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বান্দা যখন তার রবের রঙে রঙীত হয় তখন তার সমগ্র কর্মকাণ্ডই হয়ে ওঠে পূত পবিত্র ও কল্যাণময়। শরীয়াহ মানুষের প্রবৃত্তিগুলোকে সঠিক পথে পরিচালিত করে তার নিজের ও সমাজের কল্যাণেই নিশ্চিত করে। এখানে না আছে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ, না আছে ব্যক্তি মানুষের মনগড়া আইনের নিগড়ে বন্দী হওয়ার আশংকা। ব্যক্তি এখানে না প্রবৃত্তির দাস, না এখানে অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইসলামে ব্যক্তি স্বাধীনতা তাই একাধারে যেমন খুবই মূল্যবান তেমনি সমাজের কল্যাণ ও অগ্রগতিতে তার ভূমিকা অসাধারণ।[২]

ঘ) অর্থনৈতিক দর্শন

জড়বাদী জীবন দর্শনের অর্থনৈতিক মতাদর্শ পুরোপুরিই ভোগবাদী ও ব্যক্তির ইচ্ছা-আকাঙ্খা নির্ভর। সমাজের কল্যাণ বা রাষ্ট্রীয় মঙ্গলের প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে গৌণ। বাজার অর্থনীতির নামে অবাধ ও অসম প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরিতেও রাষ্ট্র উৎসাহ ও মদদ যুগিয়েছে। এভাবেই তৈরী হয়েছে দেশের বিচার ও আইন কাঠামো। নিজ দেশের সম্পদ যখন পর্যাপ্ত মনে হয়নি তখন ছলে-বলে-কৌশলে অন্যের সম্পদ আহরণে তৎপর হয়েছে। অসম প্রতিযোগিতা ও অসীম মুনাফার জের ধরে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভুত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। এরাই অর্থনীতির নিয়ামক শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবার পুঁজিবাদী বিশ্বের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ

করে চলেছে। ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য ফাইন্যন্সিং প্রতিষ্ঠানকে এরা কুক্ষিগত করে রেখেছে। ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলোয় বারবার আবির্ভাব হয়েছে মন্দার, কখনও তার রূপ হয়েছে মহামন্দার।

ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন ঃ

ইসলাম ব্যক্তিগত উদ্যোগকে অবাধ স্বাধীনতা দেয়নি আবার তার পায়ে শিকল পরিয়ে বেঁধেও রাখেনি। বরং হিসবাহ ও হিজর-এর দ্বারা ইসলামী সরকার ব্যবসা বাণিজ্যসহ সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর নজরদারী করে; শরীয়াহ সীমা লংঘনকারীকে শাস্তি দেয়। সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য অর্জন এই অর্থনীতি তথা জীবন দর্শনের অন্যতম দাবী। ব্যক্তির উৎপাদন ও উপার্জনে সমাজের অধিকার এখানে স্বীকৃত। যাকাত ও উশর আদায় ছাড়াও ইনফাক ফি সাবিলিলাহ এই অর্থনীতির অন্যতম ভিত। সর্বক্ষেত্রে হালাল অর্জন ও হারাম বর্জন পরিমিতি এই অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য[৩]।

ঙ) সম্পদের মালিকানা ঃ

পুঁজিবাদে ব্যক্তি তার অর্জিত ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের নিরংকুশ মালিকানা ভোগ করে। এই সম্পত্তি সে ইচ্ছামতো ব্যবহার ও ব্যয় করতে পারে। চূড়ান্ত ভোগবিলাসের জন্যে ব্যক্তি তার সম্পদের পুরোটাই ব্যবহার করলে তাকে বাধা দেবার কেউ নেই। আত্মীয়-স্বজনকে বঞ্চিত করে কুকুর বিড়ালকে সম্পদ দিয়ে গেলেও বলার কেউ নেই। এ ব্যবস্থা ইনসাফ ও ইহসানের বরখেলাপ।

ইসলামে ব্যক্তি মানুষ আলাহ প্রদত্ত সম্পদের জিম্মাদার বা ট্রাস্টি। সে এই সম্পদ ভোগ-দখল করতে পারবে, ব্যবহার করতে পারবে কিন্তু তার অপচয় ও অপব্যবহার করতে পারবে না। উপরন্তু তার মৃত্যুর সাথে সাথেই তা বন্টিত হয়ে যাবে ওয়ারিশদের মধ্যে। জায়গা জমি ভোগ দখলের অধিকার ও স্বাধীনতা না থাকলে যেমন উৎপাদন বাড়েনা, সমাজের অগ্রগতি ঘটে না তেমনি এর অবাধ, অসীম ও নিরংকুশ মালিকানা লাভের উদগ্র লালসা সমাজে রক্তপাত, জিঘাংসা ও সংঘাতকে অনিবার্য করে তোলে। ইসলাম এ প্রতিবিধানের জন্যেই বাস্ত বমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে; সম্পত্তির মালিকানা, বন্টন ও উত্তরাধিকারিত্বের ক্ষেত্রে আদল ও ইহসানের যৌথ নীতি গ্রহণ করেছে।[৪]

- এ যাবত বর্ণনাকৃত তুলনাগুলোর মাধ্যমে সমকালীণ অর্থনৈতিক দর্শনগুলোর দূর্বলতা ও অসামঞ্জস্যতা ফুটে উঠেছে। সমকালীন অর্থনৈতিক সংকটের পেছনে উলেখিত আদর্শিক দুর্বলতাগুলো ছাড়াও বড় বড় কয়েকটি কারণ দায়ী । যেমন সুদ, মুক্ত বাজারের নৈতিকতাহীন অবাধ স্বাধীনতা, অন্যায় যুদ্ধ ব্যয় ইত্যাদি। নিম্নে কয়েকটি বিষয়ের পর্যালোচনা তুলে ধরা হচ্ছে।

ক) সুদ : সুদ সম্পর্কে কোরআনের নির্দেশনা

- "্ এবং আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল ও সুদকে করেছেন হারাম।" (সূরা আল-বাকারাহঃ ২৭৫)
- আল্লাহতায়ালা কালাম-ই-পাকে এই দ্যর্থহীন ঘোষণার মাধ্যমে সর্বকালের ও সকল বনি আদমের জন্যে একদিকে যেমন ব্যবসাকে বৈধ ঘোষণা করেছেন অন্যদিকে সুদ ও সুদভিত্তিক সকল কার্যক্রমকে চিরতরে হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন। অর্থনীতিতে শোষণের অবসান ও যুলুমতন্ত্রের বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান যে মোক্ষম আঘাতটি ইসলাম হেনেছে তা হচ্ছে সুদের উচ্ছেদ।
- আল্লাহ সুদকে নিশ্চিত করে দেন এবং সাদকাকে বৃদ্ধি করেন (সুরা আল বাকারা ২৭৬) ।
- যে সুদ তোমরা দিয়েছো এ উদ্দেশ্যে যে মানুষের ধন বৃদ্ধি পাবে আলাহর নিকট তার সাহায্যে ধন বৃদ্ধি হয় না। (আর-রুম ঃ ৪)
- আল্লাহকে ভয় কর আর লোকদের নিকট তোমাদের যে সুদ পাওনা বাকি রয়ে গেছে সেগুলো ছেড়ে দাও, যদি তোমরা ঈমান রেখে থাক। আর যদি তোমরা এমনটি না কর তাহলে আলাহ তার রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা গ্রহণ কর। (সুরা আল বাকারা ২৭৮-২৭৯)

সুদের সাথে জড়িত হওয়াকে আলাহর সাথে যুদ্ধে শামিল হওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। কোরআনের এ ঘোষণার কারণে আমরা বুঝতে পারি যে, সুদ সর্বদাই সংকট সৃষ্টি করে।

সুদ কিভাবে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে?

১. সুদ সমাজ শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম বা উপায়। একদল লোক বিনাশ্রমে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসায় সুদের সাহায্যেই। ঋণ গ্রহীতা যে কারণে টাকা ঋণ নেয় সে কাজে তার লাভ হোক বা না হোক তাকে

সুদের অর্থ দিতেই হবে। এর ফলে বহু সময়ে ঋণ গ্রহীতাকে স্থাবর - অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করে হলেও সুদ সহ আসল টাকা পরিশোধ করতে হয়। সুদ গ্রহীতারা বিনাশ্রমে অর্থলাভের ফলে সমাজের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের কোন অবদান থাকেনা।

২. সুদ মানুষকে স্বার্থপর ও কৃপণ করে। অর্থলিপ্সা, কার্পণ্য ও স্বার্থপরতা সুদখোরদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বিনাশ্রমে উপার্জনের আকাংখা ও অর্থলিপ্সা হতেই সুদ প্রথার জন্ম। সুদখোরদের মধ্যে লোভ ও *কৃপণতা ক্রমে ক্রমে এতদূর প্রসার লাভ করে, তাদের আচার আচরণের এতখানি পরিবর্তন ঘটে যে,* তারা হয়ে ওঠে সমাজে ঘৃণিত জীব। ইংরেজী সাহিত্যের অবিসংবাদী সম্রাট সেক্সপীয়রের অমর সৃষ্টি শাইলকের (The Merchant of Venice) নাম কে না জানে?

৩. সুদভিত্তিক বিনিয়োগের ফলেই সামাজিক শোষণ সার্বিক ও সামষ্টিক, দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক হওয়ার সুযোগ হয়েছে। সুদভিত্তিক ব্যাংক ও বীমা ব্যবসার কারণে ছোট ছোট সঞ্চয় সামবেশ ও সঞ্চালনের সুযোগে বিরাট পুঁজি গড়ে উঠছে। বীমা ও ব্যাংক ব্যবসায়ে নিযুক্ত মুষ্টিমেয় ব্যক্তি এই পুঁজি চড়া সুদে ঋণ দিয়ে বিপুল অর্থ উপার্জন করছে। একই সাথে ঋণ দেবার ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্রের বাছ-বিচারের কারণে সৃষ্টি হচ্ছে ব্যাপক শ্রেণী বৈষম্য।

৪. সুদের পরোক্ষ ফল হিসেবে একচেটিয়া কারবারের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। বড় বড় ব্যবসায়ীরা যে শর্তে ও যে সময়ের জন্যে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ পেতে পারে ছোট ব্যবসায়ীরা সেভাবে ঋণ পায় না। এজন্যে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও তারতম্য ঘটে। সে প্রতিযোগিতায় অসম সুবিধা ভোগের সুযোগ নিয়ে বড় কারবারী বা ব্যবসায়ী আরো বড় হয়। ছোট কারবারীবা ব্যবসায় টিকতে না পেরে ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে বড় শিল্পপতিরা প্রতিযোগিতাহীন বাজারে একচেটিয়া কারবারের সমস্ত সুযোগ লাভ করে। পরিণামে সামাজিক বৈষম্য আরো প্রকট হয়।

৫. সুদের জন্যে দ্রব্যমূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। সুদবিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী উৎপাদন খরচের উপর পরিবহন খরচ,শুল্ক (যদি থাকে), অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং স্বাভাবিক মুনাফা যোগ করে পণ্যসামগ্রীর বিক্রি মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে দ্রব্যের এই স্বাভাবিক মূল্যের উপর উপর্যুপরি সুদ যোগ করে দেওয়া হয়। দ্রব্য বিশেষের উপর তিন থেকে চার বার পর্যন্ত, ক্ষেত্রবিশেষে তারও বেশীবার সুদ যুক্ত হয়ে থাকে।

৬. সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ও ব্যাবসা-বণিজ্যের কারণে ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়াত্বের বোঝা চাপে সমগ্র জাতির ঘাড়ে। ধনী ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিরা নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদানের অঙ্গীকারে ব্যাংক হতে তাদের দেওয়া জামানতের বিপরীতে দশগুণ বা তারও বেশী পরিমান ঋণ পেয়ে থাকে অর্থাৎ, নিজেদের দশ লক্ষ টাকা থাকলে তারা এককোটি টাকা ঋণ পায়। কোটি টাকারও বেশী এই অর্থের ব্যবসা বা শিল্পে যে মুনাফা হয় তার সবটুকুই ভোগ করে ঐ ঋণ গ্রহণকারী উদ্যোক্তা। ব্যাংকে অর্থ আমানতকারীরা সুদ পেলেও মুনাফার কোন অংশই তারা পায় না। অথচ লোকসানের কারণে ঐ প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হলে তার দায়ভার চাপে গোটা জাতির উপর। জনগণের সঞ্চয় তখন আর ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা।

৭. সুদ অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতার অন্যতম মূখ্য কারণ। একথা সর্বজনবিদিত যে পুঁজিবাজারে মূলধনের চাহিদা হ্রাস পেলে সুদের হার হ্রাস পায়, আবার মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সুদের হারও বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন দেশের সুদের হারের ওঠা নামার কালীন সারির তথ্য বিশেষণ করে দেখা গেছে কোন দেশে সুদের হার দীর্ঘকাল স্থিতিশীল থাকতে পারেনা। এভাবে সুদের হারের ঘনঘন ওঠানামা কারণে বিনিয়োগ কারীরা নিক্ষিপ্ত হয় অনিশ্চয়তার মধ্যে। এরই ফলে বিনিয়োগ, শেয়ার, পণ্য ও মুদ্রাবাজারে দারুণ অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। মারত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার শিকার হয় দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।[৫]

সুদের এসব কুফলই চলমান সংকটের জন্য অন্যতম দায়ী। সুতারাং অর্থনীতিকে বাঁচাতে হলে সুদ মুক্ত অর্থনীতির প্রবর্তন করতে হবে। এর সাথে সাথে আল কোরআনের ঘোষিত অন্যান্য নৈতিক ছাকনিও থাকতে হবে। শুধুমাত্র সুদমুক্ত অর্থনীতি দ্বারা সংকট মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

মুক্তবাজারের নৈতিকতা দরকার ঃ

পুঁজিবাদী শোষণের অন্যতম হাতিয়ার মুক্তবাজার অর্থনীতি। পুঁজিবাজার অর্থ ব্যবস্থায় ধরে নেয়া হয়েছে যে, পূর্ণ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার চলবে। এডাম স্মীথের তত্ত্ব অনুসারে অদৃশ্য হাত সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু

ভোগবাদী জীবন ব্যবস্থায় অদৃশ্য হাতই শোষণের হাতিয়ার হয়েছে।[৬] মুক্তবাজারের নৈতিকতার অভাবে এখন আমরা কেবল ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানগুলোর ধসে পড়াই দেখছি না, অবাধ অর্থনীতির নিষ্ফলা তত্ত্বের পতনও প্রত্যক্ষ করছি। পাশ্চাত্যের রাষ্ট্র নায়ক এবং বুদ্ধিজীবীগণ এখন নৈতিকতার কথা জোরেশোরে উচ্চারণ করছেন। ফিদেল ক্যাস্ট্রো মুক্তবাজারকে জঙ্গলের আইন বলে অভিহিত করেছেন। বিখ্যাত লেখক ও বুদ্ধিজীবী জোসেফ স্টিগলিট্জ এটাকে রহঃবৎহধষ নষববফরহম বা আভ্যান্তরীণ রক্তক্ষরণ বলে অভিহিত করেছেন।[৭]

বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন বলেছেন গত কয়েক মাসের বিভিন্ন ঘটনা একটি সহজ সত্যের সাক্ষ্যই দিচ্ছে যা আমার জীবনের আর এতটা দেখিনি। তা হলো, বাজারের নৈতিকতা দরকার। " লোভেই লাভ" নীতি একটা ভালো সমাজের জন্য কোনো প্রেসক্রিপশন হতে পারে না। ভালো অর্থনীতির বেলায়ও এটা সত্যি। কঠিন পরিশ্রমের পুরস্কার, সহযোগিতা, দায়িত্বশীলতা, সীমা লঙ্ঘন ও বেপরোয়া ঝুঁকি নেয়ার শাস্তি, প্রভৃতি প্রগতিশীল মূল্যবোধ বাজার অর্থনীতির দক্ষতা ও ন্যায়নীতি সুনিশ্চিত করবে।[৮]

সুতরাং নৈতিক মূল্যবোধের মাধ্যমে বাজার পরিচালিত না হলে সংকট উত্তরণ সম্ভব নয়। আল কোরআন উন্নততর মূল্যবোধের জীবনদর্শন দিয়েছে যার অধীনে বাজার পরিচালিত হলে সংকট উত্তরণ সম্ভব হবে।

সংকট উত্তরণে আল কোরআনের নীতিমালাঃ

১. অর্থসম্পদ উপার্জনে হারাম হালাল ও বৈধ অবৈধ পন্থা বিবেচনা করা :

এ উদ্দেশ্যে কোরআন বিধিনিষেধ আরোপ করে বলে দিয়েছে, অর্থসম্পদ শুধু মাত্র বৈধ পন্থায় অর্জন করতে হবে, আর অবৈধ পন্থা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে ঃ

• "হে লোকেরা, যারা ঈমান এনেছো! তোমরা নিজেদের মধ্যে অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করোনা। তবে পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে তিজারত[৯] করতে পারো। আর নিজেকে নিয়ে [কিংবা পরস্পরকে] তোমরা হত্যা করোনা। আলাহ অবশ্যই তোমাদের প্রতি কৃপাময়।" [আন নিসাঃ ২৯]

রাসূলে করীমের (সা) হাদীসে এবং ফকীহ্গণ কর্তৃক ফিকাহ গ্রন্থাবলীতে অর্থোপার্জনের অন্যায় অবৈধ পন্থাসমূহের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু কিছু কিছু অন্যায় অবৈধ পন্থার কথা কুরআনেও সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে ঃ

ক. "তোমরা নিজেদের পরস্পরের অর্থসম্পদ অন্যায় অবৈধভাবে ভক্ষণ করোনা। আর জেনে বুঝে অপরাধমুলক পন্থায় অপরের সম্পদের কিছু অংশ ভক্ষণ করার উদ্দেশ্যে তা শাসকদের কাছে উপস্থাপন করোনা।[১০] [আল বাকারা ঃ ১৮৮]

খ. "আর যে আত্নসাত [জনগণের অর্থসম্পদের খিয়ানত] করবে, কিয়ামতের দিন সে অবশ্যই এ আত্নসাৎসহ হাযির হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সেখানে তার কৃতকর্মের পরিপূর্ণ প্রতিফল প্রদান করা হবে।" [আলে ইমরান ঃ ১৬১]

গ. "চোর পুরুষ এবং চোর নারী উভয়ের হাত কেটে দাও।" [আল মায়িদা ঃ ৩৮]

"যারা আলাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটায় তাদের দণ্ড হলো তাদের হত্যা করে ফেলা কিংবা শূলে চড়ানো....।" [আল মায়িদা ঃ ৩৩]

ঘ. " যারা অন্যায়বাবে এতীমের অর্থসম্পদ ভক্ষণ করে তারা মূলত নিজেদের পেটে আগুন ভর্তি করে। অচিরেই তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।" [আন নিসা ঃ ১০]

ঙ. "ধ্বংস সেইসব ঠকবাজদের জন্যে, যারা অপর লোকদের কাছ থেকে গ্রহণ করবার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের ওজরন বা পরিমাপ করে দেবার সময় কম দিয়ে থাকে।" [আল মুতাফফিফীন ঃ ১-৩]

চ. বৈষয়িক স্বার্থে নিজেদের দাসীদেরকে বেশ্যাবৃত্তির জন্যে বাধ্য করোনা, যখন তারা নিজেরা এরূপ কাজ থেকে আত্নরক্ষা করতে চায়।" [আন নূর ঃ ৩৩]

• "ব্যভিচারের কাছেও যেয়োনা। এ এক চরম অশীলতা আর নোংরা নিকৃষ্ট পথ।" [বনী ইসরাঈল ঃ ৩২]

ছ. "হে মুমিনরা" মদ, জুয়া, আস্তানা ও পাশা এসবই নোংরা শয়তানী কাজ। অতএব তোমরা এসব পরিত্যাগ কর।"[১১] [আল মায়িদা ঃ ৯০]

জ. "আলাহ ব্যবসায়কে বৈধ করেছেন আর সুদকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।[১২] [আল বাকারা ঃ ২৭৫]

এভাবে কোরআন অর্থসম্পদ লাভের যেসব উপায় পন্থাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নরূপ ঃ

১. কারো অর্থসম্পদ তার ইচ্ছা ও বিনিময় ছাড়া গ্রহণ করা, কিংবা বিনিময় দিয়ে রাজি করিয়ে অথবা বিনিময় ছাড়া রাজি করিয়ে নেয়া। এমনভাবে রাজি করিয়ে নেয়া, যে রাজি করানোর পিছে থাকে দমন পীড়ন এবং চাপ প্রয়োগ।
২. ঘুষ।
৩. জবরদখল, লুণ্ঠন ও আত্মসাত।
৪. খিয়ানত, চাই তা ব্যক্তির অর্থসম্পদ হোক, কিংবা জনগণের অর্থসম্পদ।
৫. চুরি, ডাকাতি।
৬. এতীমের অর্থসম্পদের বল্গাহীন ভোগ ব্যবহার।
৭. মাপ ও ওজনে কমবেশী করা।
৮. অশ্লীলতা প্রসারকারী উপায় উপকরণের ব্যবসা।
৯. গান বাজনার পেশা।
১০. পতিতাবৃত্তি ও ব্যভিচার।
১১. মদ উৎপাদন, তার ব্যবসা ও পরিবহণ।
১২. জুয়া এবং এমনসব উপায় পন্থা, যেসবের মাধ্যমে কিছু লোকের অর্থ অন্যদের হাতে কেবলমাত্র ভাগ্য বা ঘটনাচক্রের মাধ্যমে চলে যায়।
১৩. মূর্তি তৈরী, মূর্তির ক্রয় বিক্রয়।
১৪. সুদ, পরিমাণ বেশী হোক কিংবা কম; ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ নেয়া হয়ে থাকুক কিংবা ব্যবসা, শিল্প বা কৃষি কাজের জন্য ঋণ নেয়া হোক সর্বাবস্থায় সুদ নিষিদ্ধ।

চলমান বিশ্বঅর্থনৈতিক সংকটের পিছনে যে, এসব অবৈধ ও অনৈতিক কাজগুলো দায়ী, এটা সুস্পষ্ট। তাই আল কোরআনের নীতিমালাই সংকট উত্তরণের শ্রেষ্ঠ সমাধান।

২. কার্পণ্য ও পুঞ্জিভূত করার উপর নিষেধাজ্ঞা

অর্থসম্পদ লাভের ভ্রান্ত উপায় পন্থা নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে কোরআন বৈধ পন্থায় অর্জিত অর্থসম্পদ পুঞ্জিভূত করে রাখাকেও তীব্রভাবে নিন্দা করেছে। কোরআন বলেছে কার্পণ্য এক জঘন্য মন্দ কাজঃ

- "ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তি জন্যে, যে মানুষের দোষ প্রচার করে এবং গালাগাল করে। যে সম্পদ পুঞ্জিভূত করেছে এবং গুণে গুণে রেখেছে। সে মনে করে তার অর্থসম্পদ চিরদিন তার কাছে থাকবে। কখনো নয়। সে তো চুর্ণবিচূর্ণকারী স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে।" [আল হুমাযা ঃ ১-৪]
- "সেইসব লোকদের কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি সুসংবাদ দাও, যারা সোনারূপা পুঞ্জিভূত করে রাখে, অথচ তা আল্লাহর পথে খরচ করেনা।" [আত-তাওবা ঃ ৩৪]

পুঁজিবাদী দর্শনে কৃপণতা রোধে কোন নৈতিক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা নেই। ফলে সেখানে নতুন নতুন সংকট তৈরি হয়েছে।

৩. অর্থপূজা ও লোভ লালসার নিন্দা

এ প্রসংগে কুরআন আমাদের এ শিক্ষাও দেয় যে, অর্থপূজা, বৈষয়িক অর্থসম্পদের প্রতি আসক্তি এবং প্রাচুর্যের কারনে গর্ব অহংকার মানুষের পথভ্রষ্টতা এবং অবশেষে তার ধ্বংসের অন্যতম বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায় ঃ

- "তোমাদেরকে অধিক অধিক অর্থসম্পদ সঞ্চিত করার চিন্তা চরমভাবে নিমগ্ন করে রেখেছে। কবরে পা দেয়া পর্যন্ত এ চিন্তায় তোমরা বিভোর থাক। কখনো নয়, অতি শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।" [আত তাকাসুর ঃ ১-৩]
- "এমন বহু জনপদকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি, যার অধিবাসীরা নিজেদের জীবিকার গর্বে অহংকারী হয়ে পড়েছিল। এখন দেখ, তাদের বসতবাটিগুলো বিরান হয়ে পড়ে আছে। তাদের পরে খুব কম লোকই সেখানে বসবাস করেছে। শেষ পর্যন্ত আমিই তাদের উত্তরাধিকারী হয়েছি।" [আল কাসাস ঃ ৫৮]

অর্থপূজা ও সীমাহীন লোভ লালসা মানুষকে মনুষ্যত্বহীন হিংস্র জানোয়ারে পরিনত করেছে সে কারণে অর্থনীতি আজ মহাসংকটে নিপতিত হয়েছে।

৪. অপব্যয়ের নিন্দা

কোরআন মজীদ বৈধ পন্থায় অর্জিত অর্থসম্পদ অবৈধ কাজে উড়িয়ে দেয়া, কিংবা বিলাসিতা, আমোদ প্রমোদ ও আনন্দ উপভোগে ব্যয় করা এবং দিন দিন জীবন যাপনের মান বাড়ানোর একমাত্র ধান্দায় বল্গাহীন অর্থ ব্যয় করাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছে ঃ

- "অর্থ ব্যয়ে সীমালংঘন করোনা। আলাহ অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেননা।" [আল আন'আম ঃ ১৪১]
- "অপব্যয় করোনা। অপব্যয়কারীরা শয়তানদের ভাই। আর শয়তান তার মনিবের চরম অকৃতজ্ঞ।" [বনী ইসরাঈল ঃ ২৬-২৭]
- "পানাহার কর, কিন্তু সীমালংঘন করোনা। আলাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেননা।" [আল আ'রাফ ঃ ৩১]

কোরআনের দৃষ্টিতে মানুষের সঠিক কর্মনীতি হলো এই যে, সে নিজের জন্যে এবং নিজের পরিবার পরিজনের জন্যে ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে। তার অর্থসম্পদের উপর তার নিজের এবং তার সাথে যারা সম্পর্কিত তাদের অধিকর রয়েছে। এই অধিকার প্রদান করার ক্ষেত্রে কৃপণতা করা যাবেনা। কিন্তু তাই বলে আবার কেবল এই এক অধিকার প্রদান করতেই অন্যান্যদের বঞ্চিত করে সব অর্থসম্পদ উজাড় করে দেয়াও যাবেনা। ঃ

- "আর নিজের হাতকে [কৃপণতা করে] গলায় বেধে রেখোনা, আবার সম্পূর্ণ প্রসারিতও করে দিওনা। এমনটি করলে তোমরা তিরস্কৃত হবে এবং খালি হাতে বসে পড়বে।" [বনী ইসরাঈল ঃ ২৯]
- "[এবং আলাহর প্রিয় বান্দা তারাই] যারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে সীমালংঘনও করেনা, আবার কৃপণাতাও করেনা, বরঞ্চ তারা উভয় চরম পন্থার মধ্যবর্তীতে অবস্থান করে।" [আল ফুরকান ঃ ৬৭]
- "আলাহ তোমাকে যে অর্থসম্পদ দান করেছেন, তার মাধ্যমে পরকালের ঘর অন্বেষণ কর। তবে তোমার পার্থিব অংশের কথাও ভুলে যেয়োনা আর [আলাহর সৃষ্টির প্রতি] অনুগ্রহ কর, যেমন আলাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহণ করেছেন। [অর্থসম্পদ দ্বারা] পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করোনা।" [আল কাসাস ঃ ৭৭]

অপব্যয় সৃষ্টি হয় দায়িত্বহীনতা থেকে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ইসলামের মৌলিক দর্শন। এ দর্শনের আলোকে পরিচালিত হলে যে কোন সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব।

৫. সৎকাজে অর্থ ব্যয় করার নির্দেশ ঃ

তাদের অর্থ সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে। [আয যারিয়াত আয়াত ঃ ১৯]

এখানে এসে ইসলাম ও পুঁজিবাদের দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়। বিত্তবান মনে করে অর্থ ব্যয় করলে দরিদ্র হয়ে যাবে এবং সঞ্চয় করলে বিত্তশালী হবে। কিন্তু ইসলাম বলে ব্যয় করলে অর্থ কমে যাবেনা বরং এতে বরকত হবে এবং বৃদ্ধি হবে।

- "শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং কার্পণ্যেও ন্যায় লজ্জাকর কাজের হুকুম দেয়; কিন্তু আলাহ তোমাদের নিকট মাগফেরাত ও অতিরিক্ত দানের ওয়াদা করেন।" (আল বাকারা ঃ ২৬৮)
- বিত্তবান মনে করে কোনো কিছু ব্যয় করা হলে তা নষ্ট হয়ে যায় । কিন্তু ইসলাম বলে না, তা নষ্ট হয়ে যায়নি বরং তার সর্বোত্তম লাভ তোমাদের নিকট ফিরে আসবে।
- " সৎ কাজে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তা তোমরা পুরোপুরি ফেরত পাবে এবং তোমাদের উপর কোনক্রমেই যুল্ম করা হবেনা। (আল বাকারা ঃ ২৭২)
- "যারা আমার প্রদত্ত রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারা এমন একটি ব্যবসায়ের আশা রাখে যাতে কোন কারণেই লোকসানের সম্ভবনা নেই। আলাহ তাদেরকে এর বিনিময়ে পুরোপুরি ফল প্রদান করবেন এবং মেহেরবাণী করে তাদেরকে আরও বেশী করে দান করবেন। (ফাতির ঃ ২৯-৩০)

বিত্তবান মনে করে সম্পদ আহরণ করে সুদী ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে সম্পদ বেড়ে যায়। কিন্তু ইসলাম বলে সৎকাজে অর্থ বিনিয়োগ করলেই সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এটি আর একটি নতুন মতবাদ। ব্যয় করলে অর্থ বেড়ে যাবে এবং ব্যয়িত অর্থ নষ্ট হবেনা। ইসলাম পুঁজিবাদী মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক মানসিকতা সৃষ্টি করে। পুঁজিবাদী এ কথার কল্পনা ও করতে পারেনা যে সুদ ছাড়া একব্যক্তি অর্থসম্পদ আরেক ব্যক্তিকে কেমন করে দিতে পারে।

পুঁজিবাদী কখনও কোন সৎকাজে অর্থ ব্যয় করলে নেহায়োত লোক দেখানোর উদ্যেশ্যেই তা করে থাকে। কারণ সে মনে যে, অর্থ ব্যয়ের বিনিময়ে কমপক্ষে সুনাম ও সুখ্যাতি তার অবশ্যই প্রাপ্য। কিন্তু ইসলাম বলে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করা উচিত নয়। "এমনভাবে ব্যয় কর যাতে তোমার বামহাত না জানে ডানহাতে কি ব্যয় করেছ।"

এসব নীতিমালার মাধ্যমে আল কোরআন অর্থনৈতিক সংকটের বিকল্প সমাধান দিয়েছে। এসব উলেখিত মৌলিক নীতিমালা ছাড়াও একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থনীতির রূপরেখা আল কোরআনে দেয়া হয়েছে । আলাহ প্রদত্ত রূপরেখা অনুসারে মানুষের মুক্তি সম্ভব। আসলেই মানুষের মনগড়া মতবাদে কোনো কল্যাণ নেই, নেই আপামর জন সাধারণের সার্বিক স্বাধীনতা, নেই সার্বজনীনতা তথা বিশ্বজনীনতা। মানুষের তৈরি দু-দুটো ভিন্নধর্মী ও বিপরীতমুখী রাষ্ট্রদর্শনের যাঁতাকলে পড়ে অগণিত মানুষের নিষ্পিষ্ট হওয়ার কাহিনীতে ইতিহাস ভরপুর। ইসলামের পরামর্শভিত্তিক শাসনব্যবস্থা বা শুরা পদ্ধতি এ দুয়ের প্রত্যেকটির চেয়েই উত্তম ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় হযরত আবু বকরের (রা.) সময় হতে। মহান খুলাফায়ে রাশিদূনের (রা.) যুগের শেষে শুরু হয় রাজতন্ত্র যা ইসলামে আদৌ কাম্য ছিলো না। অবশ্য সুলতান ও আমীররা (যাদের অনেকেই খলীফা পদবী ব্যবহার করতেন) রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে দেশের গুণীজনদের মধ্যে থেকে লোক বাছাই করে তাদের পরামর্শ সভার সদস্য করতেন। ইসলামের দাবী হলো তাকওয়া (খোদাভীতি) ও পরহেজগারীর ভিত্তিতে সর্বোত্তম লোকেরাই হবে সরকারের পরামর্শ সভা বা শুরার সদস্য। দেশ শাসনের জন্যে আল-কুরআন ও সুন্নাহই হবে আইনের উৎস। সকল ক্ষমতা, শক্তি ও আইনের উৎস হবেন মহান আলাহ রাব্বুল আলামীন। এ পথে না এগুবার কারণেই বিশ্বে আজ সংকট বিরাজ করছে। আল কোরআনের সমাধান মেনে নেয়াই একমাত্র পথ।

তথ্যসূত্র

১ শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতিঃ নির্বাচিত প্রবন্ধ, দি রাজশাহী ওয়েল স্টুডেন্স ওয়েল ফেয়ার ফাউন্ডেশন, ৪র্থ সংস্করণ ২০০৫। পৃঃ ২৯৫

২ Afzalur Rahman M.A. Economic Doctrines of Islam, Islamic publication, Lahor 1980 Page 3-5

৩ এম, ওমর চাপরা, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ঢাকা বাংলাদেশ ২০০০। পৃঃ ২২৫-২২৭

৪ Irfanul Haq,. Economic Doctrines of Islam, International Institute of Islamic Thought USA 1996 Page 154-58

৫ সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী, সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, আধুনিক প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ঢাকা- ২০০০।

৬ এম, ওমর চাপরা, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ,বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ঢাকা বাংলাদেশ ২০০০। পৃঃ ৫৭-৬০

৭ দৈনিক নয়াদিগন্ত ১৮/১০/২০০৮

৮ দৈনিক নয়াদিগন্ত ২০/১০/২০০৮ ইং

৯ এখানে কুরআনে.....তিজারত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ আদান প্রদানের ভিত্তিতে দ্রব্যসামগ্রী এবং সেবা বিনিময় করা [দ্রষ্টব্যঃ জাসসাসঃ আহকামুল কুরআন, ২য় খণ্ড ২১০ পৃষ্ঠা, আলবাহীয়া সংস্করণ মিশর ১৩৪৭ হিজরী। ইবনুল আরবী ঃ আহকামুল কুরআন প্রথম খণ্ড ১৭০ পৃষ্ঠা, আস সায়াদা সংস্করণ মিশর ১৩৩১ হিজরী] 'পারস্পরিক সন্তুষ্টি'র শর্তারোপ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, এই বিনিময়ে কোনো প্রকার দমনপীড়ন, ধোঁকা প্রতারণা কিংবা ছলচাতুরী থাকবেনা, যা অপর পক্ষের গোচরীভূত হলে সে অসন্তুষ্ট হবে।

১০ শাসকদের সামনে উপস্থাপন করা মানে অপরের অর্থসম্পদের মিথ্যা মালিকানা দাবী করে শাসকদের দ্বারস্থ হওয়াও হতে পারে, আবার শাসকদেরকে ঘুষ দিয়ে অন্যদের মালিকানাধীন অর্থসম্পদ অবিচারমুলকভাবে কবজা করে নেয়াও হতে পারে। [আলূসী ঃ রূহুল মুয়ানী, ২য় খণ্ড, ৬০ পৃষ্ঠা]।

১১ কুরআনে যেসব জিনিস নিষিদ্ধি ঘোষিত হয়েছে, সেগুলোর উৎপাদন এবং ব্যবসাও নিষিদ্ধ। কেননা, কোনো জিনিস নিষিদ্ধ হবার দাবিই হলো, সে জিনিস দ্বারা কোনোভাবেই লাভবান হওয়া যাবেনা। [আল জাসসাস ঃ আহকামুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড ২১২ পৃষ্ঠা।]

১২ এ থেকে বুঝা গেলো, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি মূলধনের উপর যে মুনাফা অর্জন করবে, কিংবা যৌথ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অংশহারে যে মুনাফা অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করা হবে, তা বৈধ। কিন্তু ঋণের ক্ষেত্রে ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে মূলের চেয়ে কিছু বেশী আদায় করে, তবে তা হারাম। এটাকে আলাহ তা'আলা ব্যবসায়িক মুনাফার মতো বৈধ মুনাফা বলে ঘোষণা করেননি।

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 111-114)

ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় যাকাত

জিনাত রেহেনা*

অর্থনীতি মানব জীবনের একটি মৌলিকও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুনিয়ায় জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আহরণ, সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে এর সুষম বন্টন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটানোর জন্য প্রয়োজন একটি বলিষ্ঠ ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা। প্রশ্ন হচ্ছে, ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা বলতে আমরা কি বুঝি? যে অর্থব্যবস্থা নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে পেট ভরে খাবার, লজ্জা ঢাকার বস্ত্র, ঝড়-তুফান, রোদ-বৃষ্টি আর পথিকের শানিত-উষ্ণ দৃষ্টি হতে রক্ষণকারী একটি আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিতে সক্ষম হবে, সক্ষম হবে নানাবিধ রোগ-ব্যাধি, রক্তহীনতা ও অপুষ্টি হতে মুক্তি দিতে; যে অর্থব্যবস্থায় ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার পার্থক্য আকাশ ছোঁয়া হবে না, সেই অর্থব্যবস্থাই মূলত ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা।[১]

একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, দুনিয়ার সব মানুষ সামাজিক মর্যাদা এবং অধিকারের দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে সমান হতে পারে না। কারণ, সব মানুষের বুদ্ধি-প্রতিভা, কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতা এবং পরিবেশগত প্রয়োজন মোটেই সমান নয়। কাজেই এসব গুনের দৌলতে যে অর্থসম্পদ উপার্জিত হবে তার পরিমাণও সমান হতে পারে না।[২] প্রকৃতপক্ষে, ভারসাম্যপূর্ণ স্বাভাবিক সাম্যের অর্থ- সর্বসাধারণের মৌলিক ও অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা প্রদান করা। "কেউ থাকবে পাঁচতলায়, আর কেউ থাকবে গাছতলায়"- এ নীতিতে সাম্য আনয়ন মানে এই না যে, দু'জনকে একই কাতারে নিয়ে আসা। এর মানে- গাছতলায় অবস্থানকারীর ন্যুনতম একটি মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দেয়া।

চলুন দেখা যাক, আধুনিক বিশ্বে বর্তমান অর্থব্যবস্থা সমূহ কতটা ভারসাম্যপূর্ণ। বর্তমান পৃথিবীতে তিনটি অর্থ-ব্যবস্থার বহুল প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। যথা- পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থা।

'ব্যক্তি মালিকানার সীমাহীন অধিকারের ভিত্তিতে অবৈধ ও বল্গাহীন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ইচ্ছেমত সম্পদ আহরণ ও ভোগের সৃষ্টিকারী ব্যবস্থাই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা।[৩] এখানে, পুঁজিপতিরাই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। এ ব্যবস্থায় অসম বন্টনের কারণে কিছু সংখ্যক লোক সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে এবং বিলাসবহুল জীবন যাপন করে। অন্যদিকে, অধিকাংশ লোক নিঃস্ব হয়ে পড়ে যাদের জীবন ধারণের ন্যুনতম প্রয়োজনটুকু ও জোটে না। বাঙালীর প্রাণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম এসব পুঁজিপতিদের কটাক্ষ করতে ভুলেননি-

"ভোগ আর লোভ চাহে যারা, নাই তাদের ধর্ম্মজাতি,
তাহাদের শুধু এক নাম আছে, রাক্ষস বলে খ্যাতি।" [এ কি আল্লাহর কৃপা নয়?}[৪]

ধর্মীয় অনুশাসন উপেক্ষা করে অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্য রচনার মাধ্যমে ভোগবাদের প্রতি অত্যুৎসাহ সৃষ্টিই এর মূল বৈশিষ্ট্য। শোষণ ও প্রতারণার নিত্য নতুন কলা-কৌশল উদ্ভাবনই এর মূল লক্ষ্য। তাই, এটাকে "Exploitation of masses by a handful cotarie" বা "মুষ্টিমেয় কতিপয় কর্তৃক ব্যাপক জনগোষ্ঠীর শোষণ বলা যায়।[৫]

অন্যদিকে যে অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন-উপকরণ সমূহের মালিকানা সমাজের বা রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত থাকে, তাকে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার পুরাতন ভিত্তির উপন নতুন প্রাসাদ গড়ে তোলা হয়েছে সমাজতন্ত্রের নামে। এ যেন নূতন বোতলে পুরাতন মদ পরিবেশন করা।

মূলত, এ অর্থব্যবস্থা 'সাম্যবাদের' আওয়াজে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে, মুখরোচক ও চিত্তহারী শ্লোগান তুলে, দুনিয়ার একশ্রেণীর শোষিত ও বুভুক্ষ মানুষকে আলোড়িত ও উত্তেজিত করা ভিন্ন আর কোন সুফল

---

* ৬ষ্ঠ সেমিষ্টার, ইংরেজী ভাষা সাহিত্য বিভাগ। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

দেখাতে অক্ষম হয়েছে। এখানে শোষিত জনগোষ্ঠীকে বুঝ দেওয়া হয়েছে যে, ব্যক্তিগত মালিকানাই সকল বিপর্যয়ের মূল কারণ এবং এর উচ্ছেদই সকল অশান্তি-নির্যাতনের অবসান।

এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে সমস্ত উৎপাদন উপকরণ জাতীয় মালিকানা বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ জাতীয়করণ দ্বারা মুষ্টিমেয় শাসক-গোষ্ঠীই নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছে। মূলত, এটি শাসক ও আমলাদের চাপিয়ে দেয়া মানব প্রকৃতি পরিপন্থী ব্যক্তি স্বাধীনতাবিহীন একটি অর্থব্যবস্থা সেখানে ব্যক্তির আশা-আকাঙ্খার মূল্য দেওয়া হয় না বিধায় ব্যক্তির কর্মস্পৃহা থাকে না, থাকে না সুস্থ প্রতিযোগিতার অবারিত সুযোগ।

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জর্জ অরওয়েলের লিখা "অ্যানিমেল ফার্ম" এ ব্যবস্থার স্বরূপ উৎঘাটনের এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এখানে "All are equal, but some are more equal" – বাক্যটি থেকেই সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, শাসকশ্রেণী more equal.

বস্তুত, "ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র"- এ দু'ব্যবস্থায় যে মানুষ কোনক্রমেই সুখী হতে পারে না, তা উভয় ব্যবস্থার আদর্শিক বিশ্লেষণ হতেই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। এসব অর্থব্যবস্থার প্রবক্তাদের স্বরূপ উন্মোচিত হয় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের নিম্নোক্ত পংক্তিদ্বয়ে:-

"যাহারা বুদ্ধিজীবী, সৈনিক হবেনা তাহারা কভু,
তারা কল্যাণ আনেনি, কখনো, তারা বুদ্ধির প্রভু।"(৬)
[আল্লাহর রাহে ভিক্ষা দাও]

জনৈক মুসলিম কবি যথার্থই বলেছেন-

"পুঁজিবাদ, সেতো অভিশাপ
সমাজতন্ত্র, সেতো আত্মার বন্দীশালা
হে মানুষ, বাঁচতে চাও কি?
আল-কুরআন তোমায়
হাতছানি দিয়ে ডাকছে।" (৭)

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সর্বগ্রাসী নিষ্পেষণে পুরো পৃথিবী আজ অতিষ্ঠ, বিশ্বমানবতা আজ অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য নিঃসীম আকুলতায় উদগ্রীব। বিশ্ব মানবতা যখন হাহাজার করছে শান্তি-ন্যায় ও ইনসাফের অন্বেষায়, শোষণ-বঞ্চনা ও অত্যাচারে মানবতার সূর্য যেখানে অস্তমিত প্রায়; একমাত্র ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী অর্থব্যবস্থাই দিতে পারে বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশা।

আল্লাহপাকের সৃষ্টজীবের কল্যাণের লক্ষ্যে সর্বাধিক উৎপাদন, ন্যায়-নীতি ভিত্তিক বন্টন ও ন্যায়সঙ্গত ভোগ-বিশ্লেষণই হল ইসলামী অর্থনীতি। মূলতঃ ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সকলের সার্বিক কল্যাণ নিহিত। মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহঃ) বলেন- "সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের গতিকে অব্যাহত রেখে মানবজীবনের মৌলিক প্রয়োজন যথাযথভাবে পূরণ করার ব্যবস্থা করা এবং সমাজস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির যোগ্যতা ও প্রতিভা অনুযায়ী আপন সত্তার বিকাশ ও পূর্ণতা অর্জনের অবারিত সুযোগ সৃষ্টি করাই মূলতঃ ইসলামী অর্থনীতি।"(৮)

মূলতঃ ইসলাম যেরূপ সুষম বন্টন ব্যবস্থার ভিত্তিতে অর্থব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে, আধুনিকতা ও প্রগতির নামধারী বর্তমান বিশ্ব সভ্যতায় এমন নজির দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। 'ইসলামই মানুষকে দিয়েছে একটি সুষ্ঠ, সুন্দর, ভারসাম্যপূর্ণ, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সুখ-সমৃদ্ধিপূর্ণ অর্থব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় পুঁজিবাদের মত ব্যক্তিকে সম্পদের 'একচ্ছত্র অধিপতি' মনে করা হয় না; আবার সমাজতন্ত্রের মত ব্যক্তি মালিকানাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকারও করা হয় না।'(৯) বরং, এ'দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করে।

ইসলামী রেঁনেসার কবি, সাম্যবাদ ও মানবতার কবি কাজী নজরুলের কবিতায়ও খুঁজে পাওয়া যায় অভিন্ন সুর:-

"ইসলাম বলে, সকলের তরে মোরা সবাই,
সুখ-দুখ সমভাগ ক'রে নেব সকলে ভাই,
নাই অধিকার সঞ্চয়ের।
কারো আঁখি জলে, কারো ঝাড়ে কিরে জ্বলিবে দ্বীপ?

দু'জনার হবে বুলন্দ নসিব, লাখে লাখে হবে বদনসীব?
এ নহে বিধান ইসলামের" ।(১০)
[ঈদ মোবারক]

প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম উদার মানবতাবোধ সম্পন্ন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান; যা সমাজের যাবতীয় সংকীর্ণতার গন্ডি এবং কৃত্রিমতার বাধা চূর্ণ করে মানবতার ঐক্য ঘোষণা করে এবং সর্বসাধারণের মধ্যে আর্থিক ভারসাম্য স্থাপন করে।

আমরা জানি, বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল একটি দেশ যেথায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। এ দেশের দারিদ্র্যতাকে অবলম্বন করে কাজ করে যাচ্ছে অনেক NGO। বর্তমানে NGO সমূহের কার্যক্রমের ব্যাপকতা দেখে প্রশ্নজাগে মনে, আদৌ কি তারা সমর্থ হয়েছে দারিদ্র্যে ঘরে কপাট লাগাতে? নাকি, দারিদ্রবিমোচন তথা সেবা ও অনুদানের ছদ্মবেশে অভিশপ্ত সুদ-ব্যবসা ভিত্তিক অর্থ করে এ দারিদ্রপীড়িত জনগোষ্ঠীর রক্ত ও অস্থিমজ্জা চুষে নেয়ার অভিসন্ধি নিয়ে মাঠে নেমেছে তারা?!

আমাদের বিদ্রোহী কবি যেন এসব মুখোশধারী সেবকদের উদ্দেশ্যেই আগুনঝরা কণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছিলেন-
"প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্তলেখায় তাদের সর্বনাশ!"(১১)
[আমার কৈফিয়ত]

বাংলাদেশ ক্ষুদ্রঋণ প্রদানে মডেল হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বেশ স্বীকৃতি ও বাহবা কুড়ায়েছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্যকে সমূলে উৎপাটিত করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, NGO সমূহের ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা কি সত্যিই পেরেছে হতদরিদ্র মানুষের জন্য স্বস্তি বয়ে আনতে? নাকি চড়া সুদের ঋণগ্রহণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার হুমকি হয়ে দাড়ায়েছে?

NGO সমূহ যদি ৩০% হার সুদে ৩ মাসের জন্য ঋণ দেয়, তবে তাদের বার্ষিক সুদের পরিমাণ প্রায় ১০০% দাঁড়ায়। এ চড়াসূদের ঋণ কখনো দারিদ্র্যবিমোচনে ভূমিকা রাখতে পারে না; বরং তাদেরকে আরো সর্বহারা করে তুলছে। অন্যদিকে, ইসলাম সুদপ্রথাকে হারাম করেছে এবং দারিদ্রপীড়িত জনগোষ্ঠীর সুন্দর জীবনের নিশ্চয়তা দিতে 'যাকাত' ব্যবস্থার প্রণয়ন করেছে।

ইসলাম প্রবর্তিত 'যাকাত' ব্যবস্থার মাধ্যমে ধনীদের থেকে সম্পদ গরীবদের কাছে স্থানান্তরিত হয় এবং এই স্থানান্তর কোন শ্রেণী সংগ্রাম বা সংঘাতের মাধ্যমে নয়; বরং স্বতস্ফুর্ত ও শান্তিপূর্ণভাবে।

আমাদের সমাজে এমন অনেক ধনী আছে- তাদের কাছে যে সম্পদের কোন মুল্যই নেই, যে সম্পদের হিসেব ব্যক্তি নিজেও রাখেনা; সে সামান্য সম্পদে কোন দারিদ্রের প্রাণ বেঁচে যেতে পারে, স্বনির্ভর হয়ে একটি সুন্দর আগামীর স্বপ্ন দেখতে পারে।

মুলত, যাকাত ব্যবস্থা অভাবী মানুষকে স্বনির্ভর করতে এবং দ্বিতীয়বার যাকাত প্রার্থী না হবার অবস্থায় আনয়ন করতে চায়। সর্বনিম্ন একবছর সচ্ছলভাবে চলার পর ব্যতিক্রম ছাড়া সকল ব্যক্তিই স্বনির্ভরতা অর্জনে সক্ষম হয়।

সমাজের বেকারত্ব দূরীকরণ এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তথা আর্থসামাজিক উন্নয়নে যাকাতের ভূমিকা অপরিসীম। স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করে দেয়ার উপায় হচ্ছে- প্রয়োজনীয় কৃষি জমি ক্রয় করে, অথবা কলকারখানা শপিংমল প্রভৃতি স্থাপন করে কয়েক বছরের জন্য শর্তস্বাপেক্ষে নির্দিষ্ট সংখ্যক পরিবারের জন্য বরাদ্দ দিয়ে তাদেরকে অভাব-দারিদ্র্যের কবল থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর দেখা যাবে, প্রায় প্রতিটি পরিবার (কিছু সংখ্যক ব্যতিক্রম ছাড়া), নিজেদের দারিদ্রের কষাঘাত থেকে মুক্তি দেয়ার পাশাপাশি স্বনির্ভরতা লাভ করেছে। এভাবে, পরবর্তীতে তা আরো নির্দিষ্ট সংখ্যক নূতন পরিবারকে দেয়া যেতে পারে। (১২)

মূলত, দারিদ্র্যবিমোচনের লক্ষ্যে যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কেন এর দ্বারা কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে না?- এটি আজ এক বড় প্রশ্ন হয়ে দাড়িয়েছে। একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আমাদের অনেক বিত্তশালী মুসলমানই যাকাত দেয়না, দিলেও তা বন্টন করা হয় বিচ্ছিন্ন ও অপরিকল্পিতভাবে। ফলে তা দ্বারা সমাজের কোন উল্লেখযোগ্য উপকার সাধিত হয়না, দারিদ্র্য সমস্যার ও কোন সূরাহা হয়না। তাছাড়া আমাদের সমাজে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে যাকাত ব্যয় ও বন্টন করা হয় না।

রাষ্ট্রীয় বা সামষ্টিক উদ্যোগে না হলেও ব্যক্তি উদ্যোগেও যদি পরিকল্পিতভাবে এলাকার দুঃস্থ, বিধবা, সহায়-সম্বলহীন পরিবারের মধ্য থেকে বাছাই করে প্রতিবছর অন্তত ৩/৪টি পরিবারকে সাবলম্বী করার জন্য রিক্সা, নৌকা, সেলাই মেশিন, গাভী-ছাগল, বা এজাতীয় উপকরণ কিনে দিত, তাহলে দেখা যেত, ব্যক্তির একার প্রচেষ্টাতেই পাঁচ বছরে তার এলাকার অন্ততঃ ২০/২৫টি পরিবার সাবলম্বী হয়ে যেত। (১৩)

এক শ্রেণীর লোক 'যাকাত' ব্যবস্থাকে মধ্যযুগীয় খয়রাতি ব্যবস্থা মনে করে এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। আবার, অনেকে যাকাতের অর্থনৈতিক মূল্য স্বীকার করতে নারাজ। তারা মনে করেন, শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে যাকাত আদায় করলে শতকরা নব্বইজন অভাবগ্রস্থ ও দারিদ্রপিষ্ট সমাজের কিইবা কল্যাণ হতে পারে। (১৪) এটি মূলত 'যাকাত' ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের প্রকৃত ধারণার অভাব। কারণ যাকাত ব্যবস্থা তার প্রকৃত স্বরূপ থেকে সরে গিয়ে সম্মান প্রতিপত্তি ও সুখ্যাতি লাভের নগ্নছোঁয়ায় কলুষিত হতে বসেছে। কাজেই, যাকাতের সুফল পেতে হলে, আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) নির্দেশিত ও প্রদর্শিত যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তবেই ধনী-গরীবের মধ্যকার আকাশছোঁয়া ব্যবধান দূরীভূত হবে, নিশ্চিত হবে অর্থনৈতিক সুবিচার আর এ ধুলীর ধরায় নেমে আসবে স্বর্গীয় সুখ-সমৃদ্ধির ফলুধারা।

তথ্যপঞ্জিঃ

১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৫৬, পৃষ্ঠা ৫,১৯৯।

২. এ.বি.এম. আব্দুল মান্নান মিয়া, উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা, হাসান বুক হাউস, ২০০২, পৃষ্ঠা-১৭৯।

৩. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম ইসলামী কবিতা, পৃষ্ঠা-২২১।

৪. বি.এম. মফিজুর রহমান আল-আয্হারী, ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসঃ কারণ ও প্রতিকার, ইউনিক লাইব্রেরী, ২০০৬ইং, পৃষ্ঠা-১৪৯।

৫. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম ইসলামী কবিতা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা-১৯

৬. বি.এম. মফিজুর রহমান আল-আয্হারী, ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসঃ কারণ ও প্রতিকার, পৃষ্ঠা-১৫২

৭. এ.বি.এম. আব্দুল মান্নান মিয়া, উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা, পৃষ্ঠা-১৭৯।

৮. বি.এম. মফিজুর রহমান আল-আয্হারী, ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসঃ কারণ ও প্রতিকার, ২০০৬ইং, পৃষ্ঠা-১৫১।

৯. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম ইসলামী কবিতা, পৃষ্ঠা-৭২

১০. কাজী নজরুল ইসলাম, সঞ্চিতা, ডি.এম.লাইব্রেরী, ১৪১১ বাংলা, পৃষ্টা-৭৩।

১১. মুহাম্মদ রুহুল আমীন ও মুহাম্মদ আবদুল লতিফ, দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৬৫, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৯৯।

১২. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা -৯২, ৯৩।

১৩. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, পৃষ্ঠা ২৯৫।

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 115-121)

কালপরিক্রমায় ইসলামী আন্দোলনঃ পরীক্ষা ও মোকাবিলা

রোকেয়া বেগম*

প্রারম্ভিকাঃ

মহান আল্লাহ এ বিশ্ব জগত সৃষ্টি করে অতঃপর সৃষ্টি করেছেন তার অতি প্রিয় সৃষ্টি মানুষকে। সৃষ্টিকুলের একমাত্র মানুষকেই তিনি প্রদান করেছেন পরস্পর বিপরীতমুখী পথে চলার স্বাধীনতা ও স্বাধীন চিন্তাশক্তি। কিন্তু ঐ স্বাধীনতা দিয়ে তিনি মানুষকে অন্ধকারে ছেড়ে দেননি। বরং সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্য অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। ইসলাম তথা রাসূল (সঃ) এর পয়গাম দুনিয়ার এক বিরাট সংস্কার মূলক আন্দোলন। সৃষ্টির আদিকাল হতে আল্লাহ প্রেরিত নবীগণ এই একই আন্দোলনের পয়গাম নিয়ে এসেছেন। এ কেবল একটি আধাত্মিক আন্দোলনই নয়, বরং এটি মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে পরিব্যাপ্ত এক অভূতপূর্ব সংস্কার আন্দোলন। এটি একাধারে আধাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, ইত্যাদি সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একটি ব্যাপক ও সর্বাত্মক আন্দোলন। মানব জীবনের কোন দিকই এ আন্দোলনের গন্ডির বহির্ভূত নয়।[১] মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বারবার মানুষকে ইসলামী আন্দোলনের নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহর হেরার রশ্মির তেজস্বিত দ্যোতনা নির্দেশের আকারে ফুটে উঠে এভাবেই-

(قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (سورة يوسف: ١٠٨).

ইসলামী আন্দোলনের পরিচয়ঃ

আন্দোলনের পরিচয়ঃ আন্দোলনের ইংরেজী শব্দ Movement আরবীতে.... বর্তমানে এটি রাজনৈতিক পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর সাধারণ অর্থ হল- কোন দাবী দাওয়া প্রতিষ্ঠা এবং বাতিল করার জন্য কিছু লোকের সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ। পরিভাষায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পরিচালিত সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা বা সংগ্রাম সাধনার নাম হল আন্দোলন।[২]

ইসলামের পরিচয়ঃ ইসলাম অর্থ আনুগত্য করা, কোন কিছু মাথা পেতে নেয়া। পরিভাষায়- "একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সঃ) প্রদর্শিত জীবন-পদ্ধতি অনুসরণ করা এবং এর বিপরীত সমস্ত মত ও পথ পরিহার করে চলাকে ইসলাম বলে।

পবিত্র কুরআনে ইসলামকে আদ-দ্বীন হিসেবে ঘোষণা করে শেষ করে দেয়নি। বরং সেই সাথে ঘোষণা দিয়েছে যে, দ্বীন এসেছে তার বিপরীত সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী লাভ করার জন্য। কোন বিপরীত শক্তির উপর বিজয়ী হওয়ার স্বাভাবিক দাবী হল এটা একটি সর্বাত্মক আন্দোলন। মহান আল্লাহ স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেন।

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)(سورة الصف: ٩).

ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্বঃ ইসলামী আন্দোলন গুরুত্বের দিক হতে সর্বোচ্চ স্থান দখল করে আছে। যা স্পষ্ট হয় নিম্নোক্ত কথা গুলোর মাধ্যমে।

১. দুনিয়ার সংস্কার মুলক আন্দোলন বহুবার দানা বেঁধে উঠেছে; কিন্তু ইসলামী আন্দোলন তার নিজস্ব ব্যাপকতা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দরুণ অন্যান্য সকল আন্দোলনের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। কারণ ইসলামী আন্দোলন বলতে মানস পটে এমন একটি আন্দোলনের চিত্র ভেসে উঠে যা, মানব জীবনের প্রতিটি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে সক্ষম।[৩] মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে রহমতের বারিধারায় সিক্ত করে ঘোষণা করেনঃ

(وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ)(سورة النحل: ٨٩).

২. এ আন্দোলন মানুষকে তার প্রকৃত লাভ-ক্ষতি বাতলে দেয়। এ পার্থিব জীবনের জন্য এ আন্দোলন এমন একটি নির্ভূল ও সুসামঞ্জস্য কর্মনীতি পেশ করে, যা অনন্ত জীবনকে সফল করে তুলবার সাথে সাথে এই পার্থিব

---

* ৪র্থ সেমিস্টার, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

জীবনকেও চমৎকার ভাবে সুবিন্যস্ত করে দেয়। মহান আল্লাহ মুমিনদের তৃষ্ণার্ত আত্মাকে প্রশান্তির আবরণে সিক্ত করার পথ নির্দেশনা দিয়ে ঘোষণা করেন:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ)(سورة الصف: ১০-১৩).

৩. দুনিয়ার বিপ্লবাত্মক আন্দোলন গুলোর কিছুকাল পর অবসান ঘটে। কিন্তু ইসলামী আন্দোলন কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। হাদীসে রাসূল (সঃ) স্পষ্ট ঘোষণা করেন।

ইসলামী আন্দোলনের সূত্রপাতঃ

মহান আল্লাহ তাঁর নিরুপম হাতের ছোঁয়ায় এ পৃথিবীকে অনুপম সাজে সজ্জিত করে মানুষকে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। মহান আল্লাহ দ্যার্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন:-

(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) (سورة البقرة: ৩০).

মানুষের সুখ শান্তি, আরাম, আয়েশের জন্য মহান আল্লাহ সব কিছুর ব্যবস্থা করেছেন। মানুষ এসব কিছু ভোগ করবে আর আল্লাহর বিধান মেনে চলবে এবং পৃথিবীতে চালু করবে আল্লাহর বিধান।[৪] মহান আল্লাহ বলেন-

(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)(سورة الذاريات: ৫৬).

বহুকালের এক অধ্যায়ে এসে ঘনঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে মানুষ। তারা লা-শরীক আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দিয়ে নিজেদের মনের ইচ্ছা-কামনাকে ইলাহ বানিয়ে নেয়। আল্লাহর অবতীর্ণ জীবন বিধান ভুলে গিয়ে মন গড়া বিধি বিধানের মাধ্যমে নিজেদের ব্যক্তিজীবন ও সমাজ জীবন নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নেয়। এই অবস্থায় আল্লাহ মানুষকে নতুন ভাবে সঠিক পথের দিশা দেবার জন্য নবী পাঠালেন। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন:

(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ)(سورة النحل: ৩৬).

মহান আল্লাহ আবার অন্যত্র ঘোষণা করেন:

(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ)(سورة الحديد: ২৫).

নবীদের আন্দোলনের গতিধারাঃ

মহান আল্লাহ প্রত্যেক জাতির নিকট সতর্ককারী প্রেরণ করেছেন। তাঁরা মানুষদেরকে এক আল্লাহর দাসত্ব করার জন্য আহবান করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন-

(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ)(سورة النحل: ৩৬).

নবীদের ইসলামী আন্দোলনের গতিধারা গুলো নিম্নে প্রদত্ত হল:

হযরত নূহ (আঃ):

হযরত নূহ (আঃ) সর্বপ্রথম শরীয়ত প্রাপ্ত রাসূল ছিলেন। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

"يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض" (رواه مسلم) অর্থাৎ, হে নূহ! তুমি এ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম রাসূল।

তিনি ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করে মানুষদেরকে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহের দাওয়াত দেন-

১. মানুষের দাসত্ব পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কর।

২. সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ, মানুষ নয়।

৩. আইন মানতে হবে আল্লাহর, মানুষের নয়।

৪. শাসকদের আনুগত্য পরিহার করে, একমাত্র নবীর পথ অনুসরণ কর।

৫. শিরক, বিদয়াত, মুর্তি পুঁজা ত্যাগ কর।

হযরত নূহ (আঃ) তার জাতির নিকট দীর্ঘ দিন ধরে আল্লাহর দীনের দাওয়াত দেন। দাওয়াতের ফলে মাত্র ৮০ জন পুরুষ ৩৮০ জন মহিলা ঈমান আনে। বাকী সবাই তার বিরোধীতা করে।[৫]

হযরত ইব্রাহীম (আঃ):

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হযরত আদম (আঃ) এর দুই হাজার বছর পর দুনিয়ায় আগমন করেন। সুরিয়ানী ভাষায় এর অর্থ হল দয়ালু পিতা। তাঁর পিতা আযর বিখ্যাত মুর্তি পূজক ও নির্মাতা ছিল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মূর্তির বিরোধীতা করলে নমরুদ তাঁকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সাথে নমরুদ আল্লাহর তাওহীদ নিয়ে বির্তক করে। মহান আল্লাহ বলেন-

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)(سورة البقرة: ٢٥٨).

হযরত মূসা (আঃ)ঃ

হযরত মূসা (আঃ) বনী ইস্রাঈলের একজন প্রসিদ্ধ রাসূল ছিলেন। তিনি ইয়াকুব (আঃ) এর বংশের লোক ছিলেন। বনী ইস্রাঈল যখন এক আল্লাহকে ভুলে জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত হল তখন ফিরাউন তাদেরকে শাসনের নামে শোষণ করত। বনী ঈস্রাঈলদেরকে ফিরাউনের কবল হতে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ হযরত মূসা (আঃ) কে প্রেরণ করেন।[৬] মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-.(اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى)(سورة طه: ٢٤)

হযরত মূসা (আঃ) ফিরাউনের নিকট দা'ওয়াত নিয়ে গেলে সে মূসা (আঃ) কে পাগল বলে আখ্যায়িত করে ও আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং তাঁদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলে তাকে বনী ইস্রাঈলসহ মিশর ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। হযরত মূসা (আঃ) সদল বলে নীল নদ দিয়ে মিশর ত্যাগ করে, আর ফিরাউন তার দলবলসহ নীল নদে ডুবে মারা যায়।

হযরত ঈসা (আঃ)ঃ

হযরত ঈসা (আঃ) পিতা ছাড়া আল্লাহর কুদরতে মায়ের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। মহান আল্লাহ তাকে বনী ইস্রাঈলের সর্বশেষ নবী হিসেবে প্রেরণ করেন এবং তাকে ইনজিল কিতাব দান করেন। তিনি বনী ইস্রাঈলকে আল্লাহর দ্বীন প্রচার করেন। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন-

(إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ)(سورة آل عمران: ٥١).

তিনি বনী ইস্রাঈলদেরকে পরবর্তীতে রাসূল (আঃ) এর উপর ঈমান আনার জন্য আহ্বান করেন। মহান আল্লাহ এরশাফ করেন-

(وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ)(سورة الصف: ٦).

ইয়াহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ) এর ডাকে সাড়া না দিয়ে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। আল্লাহ তাঁকে তাদের হাত হতে রক্ষা করেন এবং বলেনঃ- (وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (157) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ)(سورة النساء: ١٥٧).

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর যুগে ইসলামী আন্দোলনঃ

ইসলামী আন্দোলনের চেষ্টায় যিনি সর্বাধিক ও পূর্ণতম সাফল্যের অধিকারী, তিনি হলেন সরওয়ারে কায়েনাত, সাইয়্যেদুল মুরসালিন মুহাম্মদ মোস্তাফা (সঃ)। মহান আল্লাহ তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন-

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)(سورة الصف: ٩).

তারুণ্যের প্রভাত হতে জীবনের শেষ বেলা পর্যন্ত দাওয়াতের সংগ্রামে তাঁর ছিল সুদৃঢ় কর্মনীতি। প্রথমতঃ তাঁর জীবন ধারার অন্তর্নিহিত বৈপ্লবিক আদর্শ। যার ছোঁয়ায় মানব জাতির সমাজ ও সভ্যতায় এসেছে বৈপ্লবিক রুপান্তর। দ্বিতীয়তঃ সে আদর্শের সুষ্ঠু রুপায়নের জন্য তার নির্দেশিত বৈপ্লবিক কর্মনীতি, যার সফল অনুস্মৃতির মাধ্যমে একটি অসভ্য জনগোষ্ঠী পেয়েছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিরোপা।[৭]

* **আন্দোলনের সূচনাঃ** মহান আল্লাহ সূরা আল মুদ্দাসসির এর মাধ্যমে রাসূল (সঃ) কে মানুষের নিকট দা'ওয়াত দানের নির্দেশ দেন। মহান আল্লাহ বলেন- (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ) (سورة المدثر: ١-٣).

এখান হতেই রাসূল (সঃ) এর আন্দোলনী পর্যায় শুরু হয়। এ পর্যায়কে দুই ভাগ করা যায়।

এক : মক্কী পর্যায়। এ পর্যায় ১৩ বছর অতিক্রান্ত হয়।

দুই : মাদানী পর্যায়। এ পর্যায় ১০ বছর অতিবাহিত হয়।

মক্কী পর্যায়ঃ এ পর্যায়েই ইসলামের ক্ষেত্র বর্ধিত হয়। এই পর্যায়ে মানবতার এমন সব উন্নত নমুনা তৈরী হয়, যাদের কল্যাণে উত্তরকালে ইসলামী আন্দোলন সারা দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে পড়ে।

মাদানী পর্যায়ঃ হিজরতের পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল কাফিরদের কাছে। কিন্তু হিজরতের পর মদীনার ইহুদীদের মাঝে দাওয়াত দিতে হয়েছে। ইহুদীরা আল্লাহর একাত্মবাদ সম্পর্কে জানত এবং রাসূল (সঃ) সম্পর্কে জানত কিন্তু তারা তাদের আক্বীদাকে বিকৃতি করেছে। রাসূল (সঃ) মদীনায় আগমন করে মদীনার ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মাঝে ঐক্য, সংহতি, ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য মদীনা সনদ প্রণয়ন করে যা পৃথিবীর ১ম লিখিত সংবিধান। রাসূল (সঃ) মদীনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। মদীনায় হিজরতের পর মহান আল্লাহ কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দেন। রাসূল (সঃ) কাফিরদের বিরুদ্ধে ২৫/২৭/২৯ টি যুদ্ধ করেন। আর এভাবেই ইসলাম সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তৃতি ঘটে।

সাহাবীদের যুগঃ মহান আল্লাহ বলেন-

(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)(سورة آل عمران: ١٠٤).

ইসলামী আন্দোলনের পথে সাহাবীদের ত্যাগ-কুরবানী সর্বোচ্চ চুড়ায় অবস্থান করে। সাহাবীগণ ইসলামী আন্দোলনের পথে নিজেদের ধন-সম্পদ মেধা, শ্রম, যোগ্যতা, সময় সকল কিছু অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাবুক যুদ্ধে রসূল (সঃ) সাহাবীদেরকে আল্লাহর পথে দান করার জন্য বললে হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর ঘরের সকল সম্পদ নিয়ে আসেন, রাসূল (সঃ) এর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন পরিবারের জন্য তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) কে রেখে এসেছেন। হযরত ওমর তার সকল সম্পদের অর্ধেক আল্লাহর পথে দান করেন।

বর্তমান যুগে ইসলামী আন্দোলনঃ

ইসলামী আন্দোলন মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এক বড় নিয়ামত। ইসলামী আন্দোলন করাকে মহান আল্লাহ উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য আবশ্যকীয় করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন-

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) (سورة آل عمران : ١١٠).

পাশ্চাত্য শক্তির আধিপত্য। ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও মুসলমানদের ধর্মচ্যুতি সত্ত্বেও পৃথিবীর বুকে আজো একদল মানুষ ঘোষণা করছে আল্লাহর একাত্মবাদ, রিসালাতের সুউচ্চ আর শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে আল-কুরআনের বাস্তবিক প্রয়োগ বিধির কথা। তারা ধীরে ধীরে সকল মুসলিমকে ইসলামের পতাকাতলে একত্রিত করতে বদ্ধ পরিকর। ফিরিয়ে আনতে চায় হারানো সালতানাত। তাই গঠন করছে ১০০টিরও বেশী সংগঠন। মুসলিম দেশেতো বটেই অমুসলিম দেশেও রয়েছে তাদের পদচারণা। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে ইসলামী আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য সংগঠনগুলো হলো:-

১. ভারতে মুসলিম ছাত্রদের নিয়ে কাজ করছে-"Students Islamic Organization of India (SIO)".[৪]
২. ১৯৭১ সালে সিঙ্গাপুর বাসীদের ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে গড়ে তোলা হয় Umpulan Saudara Baru নামক একটি সংগঠন যার ইংরেজী নাম হল "The New Brothers Group".
৩. শ্রীলংকাতে সংঘঠিত সংগঠনের নাম- "Srilanka Islamic Movement"
৪. মালায়েশিয়া- "National Union of Malaysian Muslim student"
৫. কোরিয়ায়- "Korea Muslim Federation"
৬. থাইল্যান্ড- "Young Muslim Association of Thailand"
৭. নেপাল- "Islamic yawa songh Nepal"
৮. নর্থ আমেরিকায় দু'টি ইসলামী সংগঠনের নাম হল- "Islamic circle of North America (ICNA)" ও Islamic society of North America (ICNA)"
৯. যুক্তরাজ্যে- "The Muslim council of Britain, Islamic Forum Europe" তাদের মুল লক্ষ্য পানে এগিয়ে চলছে।

"আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তার কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম যে মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে আমি একজন আজ্ঞাবহ।" (হা-মীম আস মাজদাহ-৩৩)

এ আয়াতের সাড়া দিতে গিয়ে ১৯৮০ সালে যুক্তরাজ্যে শুধু নারীদের নিয়ে "Muslimmat UK" নামক একটি একক সংগঠন গঠিত হয়। এর লক্ষ্য হল- To bring an Islamic change and the native women of Britain. [9]

* "World Assembly of Muslim Youth" বিশ্বের মুসলিম যুবকদের পূণগর্ঠনে কাজ করে যাচ্ছে।

ইসলামী আন্দোলনের পরীক্ষাঃ ইসলামী আন্দোলনের পথ বরাবরই রক্তসিক্ত, ঈমানী পরীক্ষায় ভরপুর এক রক্তাক্ত ইতিহাস। দুর্গম গিরি, কান্তার মরু সমুদ্রের তর্জন, গর্জন ও বিশাল তরঙ্গমালা পেরিয়ে জালিমের রক্তচক্ষু ও শত-শত উন্মুক্ত কৃপানকে উপেক্ষা করার পর এ পথের যাত্রীদের সাফল্যের সোনালী মনজিলে পৌছতে হয়। এটিই সৃষ্টিকর্তার দেয়া অমোঘ নিয়ম, কারণ ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠা ও একে ধরে রাখার জন্য এ পথের যাত্রীদের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতেই মহান আল্লাহ স্পষ্ট ঘোষণা করেন-

(أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ)(سورة العنكبوت: ২-৩).

(أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ)(سورة آل عمران: ১৪২).

পরীক্ষা শুরুর সময়ঃ মহান আল্লাহ দুই ক্যাটাগরিতে মানুষকে পরীক্ষা করবেন।

ক. সাধারণ মু'মিন খ. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের।

মহান আল্লাহ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে কর্মী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর হতে পরীক্ষা শুরু করেন। সংগ্রামের মাধ্যমে তাকে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। তার এ পরীক্ষা আসে তার নফস, পরিবার ও সমাজ হতে।[১০]

পরীক্ষার মাধ্যম ঃ পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন-

(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ)(سورة البقرة: ১৫৫).

আল্লাহ আরো বলেন-

(لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)(سورة آل عمران: 186).

"নিশ্চয়ই জান মালের মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে। তোমাদের পূর্ববর্তী সম্পদায় যাদেরকে আল্লাহর কিতাব দেয়া হয়েছে এবং যারা শিরক করে তাদের পক্ষ হতে কষ্টদায়ক কথা শুনবে। এ অবস্থায় যদি তোমরা ধৈর্য্য ধারণ করো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো তা হবে বড় ধরনের এক সাহসিকতার কাজ"।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে ৬টি পরীক্ষা বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হল-

১. ভয় ২. ক্ষুধা ৩. প্রাণের ক্ষতি ৪. সম্পদের ক্ষতি ৫. উপার্জন ও আমদানির হ্রাস ৬. কষ্টদায়ক কথাবার্তা।

মহান আল্লাহ পরীক্ষা সম্পর্কে সূরা তওবায় বলেন-

(قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)(سورة التوبة: ২৪).

পরীক্ষার মোকাবিলাঃ

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে পরীক্ষা মোকাবিলার ৩টি মাধ্যমের কথা উল্লেখ করেছেন।

১. নামাজ, ২. ধৈর্য্য ৩. আল্লাহর ভয়

নামাজঃ পরীক্ষা মোকাবিলার প্রধান মাধ্যম হল নামাজ। সকল নবী রাসূল নামাজের মাধ্যমে নিজেদের পরীক্ষায় সফল হয়েছেন। নবুয়তের কঠিন পরীক্ষা মোকাবিলায় মহান আল্লাহ রাসূল (সঃ) কে নামাজ আদায়ের জন্য বলেছেন-

- (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ)(سورة المدثر: ১-৩).
- (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ)(سورة البقرة: ৪৫).
- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)(سورة البقرة: ১৫৩).

যয়নব আল- গাজ্জালী মিশরের কারাগারের কঠিন পরীক্ষায় নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ সেই কঠিন পরীক্ষা মোকাবিলায় সাহায্য করেছিলেন।

ধৈর্য্য ঃ ধৈর্য্য এক দুর্লভ গুনের নাম। এটি এমন এক গুণ যা মুসলমানদের চারিত্রিক সৌন্দর্যকে বহুলাংশে বিকশিত করে। সকল নবী রাসূলগণ পরীক্ষা মোকাবিলায় ধৈর্য্য ধারণ করেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন-

(فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ)(سورة الأحقاف: ٣٥).

সবর শব্দের অর্থ হল বাঁধা দেয়া। বিরত রাখা, বেঁধে রাখা, সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী বলেন- মজবুত ইচ্ছা, অবিচল সংকল্প, ও প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে এমনভাবে শৃংখলাবদ্ধ করা, যার ফলে কোন ব্যক্তি প্রবৃত্তির তাড়না ও বাইরের সমস্যাবলীর মোকাবিলায় নিজে মন ও বিবেকের পছন্দনীয় পথে অবিরত এগিয়ে যেতে পারে। ধৈর্য্যের মাধ্যমে মানুষ সত্যের পথে সুদৃঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার এক বিশেষ ক্ষমতা লাভ করে।[১১] মহান আল্লাহ বলেন-

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)(سورة آل عمران: ٢٠٠).

আল্লাহর পথের যাত্রীদের স্মরণ রাখতে হবে আল-কুরআনের দৃষ্টিতে এ পথ বিপদ সংকুল। আর এ পথে তারাই চলতে পারে যারা সৌভাগ্যের অধিকারী। আর সৌভাগ্যবান হচ্ছে ধৈর্য্যশীলরাই। মহান আল্লাহর ঘোষণা-

(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33) وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ)(سورة فصلت: ٣٣-٣٥).

(إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ)(سورة الأنفال: ٦٥).

রাসূল (সঃ) ধৈর্য্য সম্পর্কে বলেন- "একজন নবীকে তার কওম আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত করেছিল। তিনি মুখমন্ডল হতে রক্ত মুছে ফেলেছিলেন আর বলেছিলেন ঃ আয় আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, কারণ তারা জানে না" (বুখারী, মুসলিম)।

আল্লাহর ভয় ঃ ইসলামী আন্দোলনের পথে পরীক্ষা অবধারিত। জান-মালের ক্ষতি ও কষ্ট অনস্বীকার্য। এক্ষেত্রে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, সংকল্পের দৃঢ়তা ও আল্লাহর ভয় মুমিনের অপরিহার্য মূলধন। ইসলামী আন্দোলনের পথ জান্নাতের পথ-জান্নাত কষ্টের জিনিস দ্বারা আবৃত। আর দোযখের চার পাশে রয়েছে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা। তাই এ কামনা বাসনা ও পরীক্ষা মোকাবিলা করতে হলে আল্লাহর ভয় আবশ্যিক। মহান আল্লাহ বলেন-

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)(سورة آل عمران: ٢٠٠).

এছাড়া পরীক্ষা মোকাবিলার অন্যতম মাধ্যম হল পরীক্ষাকে পরীক্ষা হিসেবে মনে করা। সকল বিপদকে আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে বলে মনে করা। মহান আল্লাহ বলেন-

(مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)(سورة التغابن: ١١)

পরীক্ষা মোকাবিলায় নবীগণ ঃ

ইসলামী আন্দোলনের পথে নবীগণ অনেক বেশী পরীক্ষার মুখো-মুখি হয়েছেন। নিম্নে তাদের পরীক্ষা মোকাবিলার কিছু চিত্র তুলে ধরা হল-

১. হযরত ইব্রাহীম (আঃ)ঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে আল্লাহ তা'য়ালা সারা পৃথিবীর নেতৃত্ব দেয়ার আগে অনেক কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে নেন। সকল পরীক্ষায় তিনি ধৈর্য্যের সাথে উত্তীর্ণ হন। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন-

(وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)(سورة البقرة: ١٢٤).

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কৃত পরীক্ষার সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হল আগুনে নিক্ষেপের পরীক্ষা। তিনি ধৈর্য ও আল্লাহর ভয়ের মাধ্যমে এ পরীক্ষা মোকাবিলা করেন। সাহায্যের উদ্দেশ্যে প্রসারিত ফেরেশতাদের হাতকে তিনি আল্লাহর সহযোগিতার আশায় প্রত্যাখ্যান করেন। আর তখনই আল্লাহ বলেন-

(قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ)(سورة الأنبياء: ٦٩).

২. হযরত ইসমাঈল (আঃ) ঃ ধৈর্যের পরাকাষ্টা প্রদর্শনকারী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এক উত্তরসূরী হযরত ইসমাঈল (আঃ) ধৈর্য্যশীলদের অন্যতম। যখন ইব্রাহীম (আঃ) তাকে আল্লাহর আদেশের কথা শুনালেন তখন তিনি যা বলেছিলেন তা আল্লাহ কুরআনে তুলে ধরেন- "হে পিতা, আল্লাহর আদেশ আপনি কার্যকর করুন, আপনি আমাকে আল্লাহর ইচ্ছায় ধৈর্য্যশীলদের অন্তর্ভূক্ত পাবেন।"(সাফ-ফাত-১০২) তাদের উভয়ের কুরবানী ও ধৈর্য্যের মহিমা দেখে আল্লাহ এতই খুশী হন যে, তার খুশীর বহিঃপ্রকাশ আমরা কুরআনে এভাবে দেখতে পাই-

(فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (108) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (109) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ)(سورة الصافات: ١٠٣-١١٠).

৩. হযরত আইয়ুব (আঃ) ঃ পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারায় ১৫৩-১৫৭ আয়াতে ঘোষিত সবগুলো পরীক্ষার মুখো-মুখি হয়েছিলেন হযরত আইয়ুব (আঃ)। এই কঠিন পরীক্ষা তিনি ধৈর্য্যের মাধ্যমে মোকাবিলা করেন। তার পরিবার পরিজন তাঁকে ত্যাগ করেছিল। ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তার সারা শরীরে পচন ধরে দুর্গন্ধযুক্ত হয়েছিল। শরীরে পোকা ধরে গিয়েছিল। পোকা যখন তাঁর জিহ্বায় ধরে গিয়েছিল তখন তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন। মহান আল্লাহ তার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন-

(وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ)(سورة الأنبياء: ٨٣).

৪. হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ঃ শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর সংগ্রামী জীবনের পুরোটাই ছিল অগ্নি পরীক্ষায় পরিপূর্ণ। মুহুর্মুহু পরীক্ষায় তিনি কখনো এক মূহুর্তের জন্যও ধৈর্যের বাঁধে স্পর্শ করেননি। সাহাবায়ে কিরামও অত্যাচার ও নির্যাতনে এতটাই অতিষ্টি হয়ে পড়েছিলেন যে, কোন এক সময় তারা রাসূল (সঃ) এর দিকে প্রশ্নের তীর নিক্ষেপ করে বলেন, আপনি কি আল্লাহর রাসূল নন? কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? আপনি কি দোয়া করেন না? আল্লাহর রাসূল ধৈর্য্য সহকারে শোনেন, ধৈর্য্য সহকারে উত্তর দেন এবং তার উত্তর ছিল নসিহতে পরিপূর্ণ। তিনি বলেন অতীতের নবী ও উম্মতদের তুলনায় এটি তো তুচ্ছ এক বিপদ। ধৈর্যধারণ করো দেখবে হাজরা মাউত হতে সান'য়া পর্যন্ত সুন্দরী নারী, মূল্যবান সব গহনা পরিহিতা মহিলা একাকী রাতে ও দিনে পথ চলবে। কেউ তকে প্রশ্নতো দূরের কথা চোখ তুলেও তাকাবে না। কিন্তু তোমরা বড্ড তাড়া-হুড়ো করছ।

ইসলামী আন্দোলনের কাজ কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। ইসলামী আন্দোলনের কাজকে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সর্বোত্তম কাজ বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন-

(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)(سورة فصلت: 33)

মহান আল্লাহ ঈমানদারদের পৃথিবীর রাজত্ব দেয়ার ওয়াদা করেছেন। আর আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে পরীক্ষা না করে রাজত্ব দেবেন না। পরীক্ষার মাধ্যমে ঈমানদারদেরকে খাঁটি রূপে তৈরী করে তাকে দায়িত্ব দিবেন।[১২] মহান আল্লাহ বলেন-

(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا)(سورة النور: ٥٥).

মহান আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের জন্য কবুল করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র ঃ

---

১ আবু সলীম মুহাম্মদ আব্দুল হাই ঃ "রসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন" ২০ তম সংস্করণ, মার্চ ২০০৯ইং, পৃষ্ঠা- ৭

২ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ঃ "ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন",.....

৩ আবু সলীম মুহাম্মদ আব্দুল হাই ঃ "রসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন", পৃষ্ঠা- ৭

৪ অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশিদ খানঃ "নবীদের রাজনীতি" জানুয়ারী ২০০২ ইং, পৃষ্ঠা- ১৭

৫ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪২

৬ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৭

৭ আবু সলীম মুহাম্মদ আব্দুল হাই ঃ "রসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন", পৃষ্ঠা- ১

৮ মোহাম্মদ আবদুল ওহাব ঃ "এশতকে ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও সংগঠন"। প্রকাশকাল, ডিসেম্বর ১৯৯৭ইং, পৃঃ ৮২

৯ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৭

১০ অধ্যাপক গোলম আযম ঃ "রুকনিয়াতের দায়িত্ব ও মর্যাদা" প্রকাশকাল, জুলাই ১৯৮৭ ইং, পৃষ্ঠা- ৩৭

১১ আবদুস শহীদ নাসিম ঃ "ইসলামী আন্দোলন সবরের পথ", প্রকাশকাল, ডিসেম্বর ১৯৯৯ ইং, পৃষ্ঠা- ১২

১২ অধ্যাপক গোলম আযম ঃ "রুকনিয়াতের দায়িত্ব ও মর্যাদা", পৃষ্ঠা- ৩৯

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 122-126)

ইসলামের রাষ্ট্রদর্শন

মোঃ শাহজালাল*

১. ভূমিকাঃ

রাষ্ট্র ও সরকার মানব জীবনের দুটি অপরিহার্য বিষয়। মানুষের স্থিতি, বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্র ও সরকারের কোন বিকল্প নেই। দার্শনিক প্লেটোর মতে- "রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনতা ছাড়া উন্নত মানের জীবন লাভ করা ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় তৎপরতার দিকে। মানুষ তার এ স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে কখনো মুক্ত হতে পারে না।[১] অন্যদিকে মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধজীব রাষ্ট্র ও সরকার ছাড়া চলতে পারে না। প্রখ্যাত দার্শনিক এরিস্টেটল রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেছেন: "রাষ্ট্র একটি স্বভাবগত কার্যক্রম। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক। যে মানুষ সমাজ বহির্ভূত জীবন যাপন করে, যার জীবন কোনো নিয়ম শৃঙ্খলার অধীন নয়, নিঃসন্দেহে বলা যায়, সে হয় মানবেতর জীব, না হয় মানব প্রজাতির উর্ধ্বে কোন সত্তা।"[২] অতএব যে ব্যক্তি রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজনবোধ করে না, তার মধ্যে মানবীয় প্রকৃতির কোন অস্তিত্ব নেই।

২. ইসলামের স্বরূপঃ

ইসলাম মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা। এর বিধি-নিষেধ মানুষকে কতিপয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি বরং মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনের জন্যও দিয়েছে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা। এই দিক নির্দেশনাতেই স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠেছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্তার স্বরূপ। এতে সামাজিক আইন-কানুন, ন্যায়বিচার সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও দেশকাল নির্বিশেষে সকল কল্যাণকর ও প্রগতিশীল রাষ্ট্র ও সরকারের এক অনবদ্য চিত্র। ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মূল পার্থক্য এখানেই। ধর্মের বিধিবিধান, নির্দিষ্ট কিছু প্রথা, আচার-আচরণ, পূজা-অর্চনা ও বিশ্বাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ইসলামের বিধি-বিধান গুটি কয়েক ইবাদত-বন্দেগীতে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের জীবনের সকল শাখা-প্রশাখায় এর সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের এই মৌলিক পার্থক্যের পিছনে রয়েছে এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। আর তা হচ্ছে এই যে, ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়েছিল পরাধীন রাষ্ট্রে যেখনে শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর ঐ সরকার তাদের প্রবর্তিত অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক কোন বিধান প্রণয়ন বা প্রসাবের কোন সুযোগ রাখেননি। উদাহরণ স্বরূপ আমরা খৃষ্টান ধর্মের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে পারি। খৃষ্টান ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল বর্তমান ফিলিস্তিনে। আর ফিলিস্তিন ছিল তখন রোমান সম্রাজ্যের অধীনস্ত একটি পরাধীন রাষ্ট্র। রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে যায় এমন কোন কিছুই প্রচার করা ঈসা (আঃ) এর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অতএব ঈসা (আঃ) তার ধর্ম প্রচার আধ্যাতিকতা ও নৈতিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তিনি যদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হতেন, তাহলে তার দা'ওয়াত অংকুরেই মূলোৎপাটিত হয়ে যেত। অপর দিকে ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল আরবের হেজাজ অঞ্চলে। এখানে কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না। বরং তারা ছিল গোত্রে গোত্রে বিভক্ত। বিদেশী কোন শক্তির অবস্থানও সেখানে ছিল না। অতএব ঐতিহাসিক এ প্রেক্ষাপট ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসাবে উপস্থাপন করতে সহায়তা করেছে।[৩]

৩. ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গুরুত্বঃ

ইসলামে ধর্ম ও রাষ্ট্র একই সুত্রে গাঁথা। নাগরিকদের নিরাপত্তা, ন্যায় বিচার, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, শিষ্টের পালন, অপরাধ দমন ইত্যাদি রাষ্ট্র ছাড়া সম্ভব হয় না। ইমাম গাজ্জালী (র.) বলেছেন ঃ

" الدنيا مزرعة الآخرة، ولا يتم الدين إلا بالدنيا، والملك والدين توءمان، فالدين أصل، حارس، وما لا أصل فهو مهدوم، وما لا حارس له فهو ضائع، ولا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان".

---

* সহকারী অধ্যাপক, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

"দুনিয়া পরকালের খামার বা শষ্যক্ষেত। দুনিয়া ছাড়া ধর্ম পরিপূর্ণ হতে পারে না। রাষ্ট্র ও ধর্ম যমজ সন্তানের মত, ধর্ম হল মূল ভিত্তি। আর রাষ্ট্র তার পাহারাদার। যার ভিত্তি নাই তা ভেঙ্গে পড়ে। এবং যার পাহারাদার নেই, তা নষ্ট হয়ে যায়। রাষ্ট্র ও ক্ষমতা সরকারব্যবস্থা ছাড়া সম্ভব নয়।[৪]

অতএব ইসলাম বিভিন্ন ভাবে তার অনুসারীদেরকে একটি সক্ষম ও শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তাগাদা দিয়েছে।

ক. **নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য** ঃ আল্লাহ তায়ালা নবী (সঃ) কে দুটি উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন। এর প্রথমটি হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর জ্ঞান লাভ করা এবং মানুষের মধ্যে তা প্রচার ও প্রসার করা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ওহীর জ্ঞানকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা এবং সে আলোকে রাষ্ট্র ও সমাজ পচিালনা করা। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

(وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا يتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك)

"আল্লাহ আপনার প্রতি যা প্রেরণ করেছেন, আপনি সে অনুযায়ী তাদের মধ্যে বিচার ফয়সালা (রাষ্ট্র পরিচালনা) করুন, আপনি তাদের চাওয়া পাওয়ার অনুসরণ করবেন না, তাদেরকে এড়িয়ে চলুন, যাতে করে তারা আপনাকে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান থেকে কিয়দাংশ হলেও ফিরাতে না পারে ।"[৫]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

(لقد أرسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس)

"আমি রাসুলদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শণসহ প্রেরণ করেছি। তাদের সাথে নাযিল করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্টা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার।"[৬]

রাসুলুল্লাহর প্রথম দায়িত্বটি তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে গেছে। অতএব কেউ আর এখন ওহী লাভের দাবী করতে পারে না। কিন্তু দ্বিতীয় দায়িত্বটি তার মৃত্যুর পরও তার উম্মতের উপর বর্তায়। আর এজন্যই সাহাবাগণ তাঁর মৃত্যুর পর দাফন কাফন সম্পন্ন হওয়ার আগেই পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[৭]

খ.**রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য** ঃ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ইসলামের দৃষ্টিতে একটি ফরয কাজ। এমন কি রাষ্ট্রের প্রতি যার আনুগত্য নেই, এমন লোকের মৃত্যুতে ইসলামে জাহিলিয়াতের মৃত্যু হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসুল (সাঃ) বলেছেন ঃ "من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية"

"যে ব্যক্তি কোন রাষ্ট্র বা সরকারের হাতে আনুগত্যের বাইয়াৎ ছাড়া মারা যায়, সে জাহেলী যুগের মৃত্যুবরণ করে।"[৮]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যের পরই রাষ্ট্রের আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)

"হে ইমানদার লোকেরা, আল্লাহর আনুগত্য কর, আর আনুগত্য কর তাঁর রাসুলের এবং তোমাদের কর্মকর্তাদের। অতপর তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে তা আল্লাহ ও রাসুলের দিকে ফিরিয়ে দাও।[৯] হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন যে, "উলুল আমর" অর্থ ঐ সমস্ত লোক যাদের হাতে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত ।

গ. **ইসলামী বিধি-বিধানের বাস্তবায়ন** ঃ ইসলামের সামগ্রীক বিধি-নিষেধের বাস্তবায়ন ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া সম্ভব নয়। অন্যায়ের প্রতিরোধ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, জিহাদ ও সীমান্ত রক্ষা, ঈদ, জুমা ও হজ্জের অনুষ্ঠানাদির বাস্তবায়ন, হুদুদের (حدود) প্রয়োগ, যাকাত আদায় ও বিতরণ, দরিদ্র ও অসহায় মানুষের সাহায্য প্রদান ইত্যাদি ইসলামের মৌলিক বিধান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া বাস্তবায়ন সম্ভব নয় ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেনঃ

"يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتها إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد عند الاجتماع من رأس"

এটা জানা আবশ্যক যে, মানুষের নেতৃত্ব দেওয়া দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নেতৃত্ব ছাড়া দ্বীন দুনিয়া কোনটিই টিকে থাকতে পারে না। কারণ মানুষ একে অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী, সমাজ বদ্ধ হওয়া ছাড়া তাদের কোন স্বার্থ অর্জিত হতে পারে না আর যখনই মানুষ সমাজ বদ্ধ হবে তখনি নেতৃত্বের প্রয়োজন হবে।[১০] তিনি আরো বলেন ঃ "আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর সৎকাজের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করা ফরয করে দিয়েছেন। আর রাষ্ট্র ও সরকার ছাড়া এ কাজ পুরোপুরি আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়।"[১১]

মূলতঃ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এই তাগাদা থেকেই রাসুল (সাঃ) মদীনায় হিজরত করার পর একটি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। একজন রাষ্ট্র প্রধান ও রাষ্ট্র পরিচালকের যাবতীয় রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে পালন করেছেন ।

৪. **ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতিঃ** ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র প্রকৃতি ও বৈশিষ্টের অধিকারী। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনে আজকের দিনে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপরেখা অনেক মুসলমানের কাছেও অস্পষ্ট ও ম্লান হয়ে গেছে। আমরা এখানে ইসলামী রাষ্ট্রের সাধারণ কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করব:-

ক) সাংবিধানিক রাষ্ট্রঃ ইসলামী রাষ্ট্র একটি সাংবিধানিক রাষ্ট্র। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ এ সংবিধানের প্রতিনিধিত্ব করে। অতএব কোন অবস্থাতেই এমন কিছু করা যাবে না যা কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্নভাবে এ বিষয়টির বর্ণনা দিয়েছেন।

১. (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)
"যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা কাফির"[১২]

২. (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)
"যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা অত্যাচারী।"[১৩]

৩. (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون)
"যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা পাপিষ্ঠ।[১৪]

মূলতঃ এই সাংবিধানিক আনুগত্যই ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের আনুগত্যের মূলভিত্তি। যখন কেউ কুরআন ও সুন্নাহর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায়, তখন জনগণ তার অনুগত হতে বাধ্য নয়। রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেন:

"السمع والطاعة حق المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"
"মুসলমানের উপর অবশ্য কর্তব্য যে, সরকারের কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে, -চাই তার পছন্দ হোক কিংবা না হোক- যতক্ষণ না তাকে কোন গুনাহের কাজের আদেশ দেওয়া হয়। অতএব, তাকে যখন কোন গুনাহের কাজে আদেশ দেয়া হবে, তখন সে তা শুনবেও না, মানবেও না।[১৫]

খ. আল্লাহর সার্বভৌমত্বঃ ইসলামী রাষ্ট্রের আরেকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য এই যে, এই রাষ্ট্রে একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত। অতএব এই রাষ্ট্রে সরকার ও জনগনের দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর আইনকে বাস্তবায়ন করা। আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তা হারাম করার অধিকার কারো নেই, তিনি যা হারাম করেছেন, তা হালাল করার ক্ষমতাও কারো নেই। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: "إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين"
"চূড়ান্ত হুকুম দেয়ার সার্বভৌমত্বের অধিকার একমাত্র আল্লাহর। তিনি পরম সত্য কথা বলেন, আর তিনি হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী"[১৬]। তিনি আরো ইরশাদ করেন: "إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه"
"হুকুম করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর; তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমরা একমাত্র তাঁর আনুগত্য করবে।[১৭]

যদিও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। কিন্তু মানব সমাজে এই সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ হবে মানুষের মাধ্যমেই। কারণ আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব (খিলাফত) করার দায়িত্ব তিনি নিজেই মানুষের উপর অর্পণ করেছেন। এই প্রয়োগীয় সার্বভৌমত্ব বা প্রশাসনিক কর্তৃত্বের অধিকারী সাধারণ ভাবে সমস্ত মানুষ। কিন্তু সমস্ত মানুষের পক্ষে এ সার্বভৌমত্বের প্রয়োগ একসাথে কখনো সম্ভব হতে পারে না। সেজন্য মানুষের মধ্য থেকে কতিপয় লোক বাছাই করে নিতে হবে এ কর্তৃত্ব পালন ও প্রয়োগ করার জন্য। আর এখানেই নির্বাচনের প্রশ্ন। তারা তাদের মধ্য থেকে অপেক্ষাকৃত অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে বাছাই করে তাদেরকে এ কাজের দায়িত্ব দিবে। সেই সাথে বাস্তব সমর্থন ও সহায়তা দিয়ে তাদেরকে তাদের দায়িত্ব পালনে অবাধ ও নির্বিঘ্ন সুযোগ করে দেবে। জনগন যেসব গুণাবলীর বিবেচনায় তাদেরকে নির্বাচিত করবে, নির্বাচিত হওয়ার পর তারা যদি সে গুণাবলী হারিয়ে ফেলে কিংবা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তাহলে জনগণ তাদের দেয়া খেলাফতের দায়িত্ব ফিরিয়ে নিতে পারবে এবং তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে[১৮]।

গ. ইসলামী রাষ্ট্র বিশ্বরাষ্ট্রঃ ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার বিশেষ কোন দেশ বা ভূখন্ডে প্রতিষ্ঠিত হলেও তার কার্যক্রম বিশেষ কোন জাতি, বর্ণ, কিংবা ভাষাভাষী লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাই স্বভাবতই ইসলামী রাষ্ট্র একটি বিশ্বরাষ্ট্রের দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে। মুলতঃ পৃথিবীতে যত যুদ্ধ-সংগ্রাম-সংঘাত সংঘটিত হয়েছে তার

পিছনে কাজ করেছে সংকীর্ণ ভৌগলিক, ভাষাভিত্তিক ও বর্ণভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। অতএব এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র বিশ্বমানবতার শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না।

ইসলামের আহ্বান ব্যক্তি ও সামষ্টিকভাবে সমস্ত বিশ্ব মানবতার প্রতি। মানবতা তাদের পারস্পরিক সব পার্থক্য, তারতম্য ও বিভেদ-বিবাদ সম্পূর্ণরূপে ভূলে যাক এবং তাদের মাঝে কাল্পনিক ভাবে যেসব পার্থক্যের প্রাচীর দাড় করানো হয়েছে তা ধ্বংস হোক এবং নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলুক তাই হচ্ছে ইসলামের কামনা। সমস্ত মানুষকে এক ও অভিন্ন নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করে একটি মাত্র রাষ্ট্রের পতাকা তলে সমবেত করাই ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য। কেননা এ ছাড়া জাতিতে জাতিতে বিভক্ত এ মানবতাকে রক্ষা করা ও মানুষের মর্যাদাকে অক্ষুন্ন ও স্থায়ী করে তোলা অন্য কোন ভাবেই সম্ভব নয়। অথচ যদি ইসলামের কাম্য ও লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করা হয়, তাহলে অকারণে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠা এবং লক্ষ কোটি অসহায় মানুষের রক্তের বন্যা আর বয়ে যাবে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم)

"হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রভূক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি লাভ করতে পার। প্রকৃত কথা হচ্ছে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানীত ব্যক্তি হচ্ছে সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু"[১৯]

বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম ও মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে সমগ্র মানুষের মৌলিক একত্ব। আর পবিত্র কুরআন তা অকাট্য ও চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ঘ. শুরা ভিত্তিক রাষ্ট্র: ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যক্রম জনমতের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। কোন অবস্থাতেই যেন স্বৈরতন্ত্রের প্রচলন না ঘটে কিংবা এক ব্যক্তির মর্জিমত লোকেরা চলতে বাধ্য না হয় সেজন্য সর্বক্ষেত্রে পরামর্শ ভিত্তিক কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এমন কি কুরআন মজীদের একটি পূর্ণাঙ্গ সুরার নাম রাখা হয়েছে "আশ-শূরা" বা পরামর্শ। এ থেকে পরামর্শ বা জনমতের কি গুরুত্ব তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। ইসলামে সমাজের লোকদের গুণ পরিচিতি স্বরূপ সুরা আশ-শুরাতে এ ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে:

(والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون)

"আর তারা (ঈমানদারেরা) বড় গুনাহ ও নির্লজ্জতার যাবতীয় কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাকে এবং ক্রোধ হলে তা ক্ষমা করে দেয়। আর তারা তাদের বরের হুকুম পালন করে এবং সালাত কায়েম করে। তারা তাদের সামষ্টিক ব্যাপারাদি পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে"[২০]।

অতএব ইসলামে রাজতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র কিংবা স্বৈরতন্ত্রের কোন স্থান নেই। জনগনের পছন্দের ভিত্তিতেই এখানে সরকার নির্বাচিত হয় এবং তাঁদের পরামর্শের ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়। এ অর্থে ইসলামী রাষ্ট্র একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কিন্তু এ গণতন্ত্র পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্র নয়। যেখানে মানুষকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তারা যা ইচ্ছা তাই করবে। ইসলাম একটি সাংবিধানিক রাষ্ট্র হওয়ার কারণে কোন অবস্থাতেই কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কিছু করার অধিকার কারো নেই।

ঙ. সকল নাগরিকের সমাধিকার: ইসলামী রাষ্ট্রে আইনের দৃষ্টিতে সমস্ত নাগরিক সমান। নাগরিকদের অধিকার ও মর্যাদা এবং অপরাধের দন্ডদানের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য না করাই ইসলামের শাশ্বত নীতি ও আদর্শ। ইসলামী আইনের কাছে ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সুকৃতকারী ও দুস্কৃতকারী সকলেই সমান। সকলের প্রতিই অভিন্ন আচরণ গ্রহণ করা হয় এবং যার যতটুকু প্রাপ্য তাকে তা-ই এবং ততটুকু দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

(يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وعلى أنفسكم)

"হে ঈমানদার লোকেরা তোমরা আল্লাহর স্বাক্ষী হিসাবে সুবিচার প্রতিষ্ঠার পক্ষে শক্ত হয়ে দাড়াও যদিও সেটা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে হয়।[২১]

এমনকি সংখ্যালঘু অমুসলিম নাগরিকদের অধিকারও ইসলামী রাষ্ট্রে সুনিশ্চিত করা হয়েছে। মানুষ হিসাবে একজন মুসলমানের মত সব ধরনের সুযোগ সুবিধা সে ভোগ করবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 127-132)

মানব শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড

মুহাম্মদ মাহমুদুল্লাহ*

ভূমিকা

মহান আল্লাহর নামে লেখা সূচনা করছি যিনি মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সে আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি যার আনুগত্য করে সকল সৃষ্টি। জীব জগত, জড় জগত সকল কিছুই আল্লাহর দাসত্বে নিবিষ্ট। প্রকৃত অর্থে, মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব করা হয়েছে আল্লাহর দাসত্বের বিচারে। আল্লাহর দাসত্বকে মেনে নিয়ে যে জীবনের সর্বাঙ্গ বিন্যাস করতে পারে সেই শুধু শ্রেষ্ঠ জীব। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে নিতে পরে এরকম মানুষ যদি পৃথিবীর ৬০০ কোটি মানুষের ভিতর ১০০ জনও হয় তাহলে সে একশত জন মানুষ যে মর্যাদা বহন করবে তা ৬০০ কোটি মানুষের চেয়ে শ্রেয়। এটা খুবই যৌক্তিকভাবে বিবেচিত। পক্ষান্তরে, মানুষকে বলিষ্ঠ বিবেচনা শক্তি দেওয়ার পরও সে যদি প্রকৃত স্রষ্টাকে ভুলে যায়, তার মর্যাদা পৃথিবীর নিকৃষ্ট প্রাণীর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ে চলে যায়।

মানুষ একটি যুক্তিবোধ সম্পন্ন জাতি

আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টির ভিতর মানুষই একমাত্র বুদ্ধিসম্পন্ন জাতি। মানুষ এমন এক সৃষ্টির নাম যে তার সকল কর্মকান্ড যুক্তিবোধ দ্বারা সম্পাদন করে। সে তার সকল তৎপরতা যুক্তির কষ্টি পাথরে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে যাচাই বাছাই করার সক্ষমতা রাখে, যা অন্য কোন প্রাণীর বৈশিষ্ট্য নয়। মানুষকে দেওয়া হয়েছে উন্নত মস্তিষ্ক। আল্লাহ তায়ালার বিস্ময়কর এ সৃষ্টি যার অনুকরণে আবিষ্কৃত হয়েছে কম্পিউটার। বিজ্ঞানের সর্বশেষ তথ্যে প্রকাশ করা হয়েছে যে, মানুষের মস্তিষ্কে ১৪ বিলিয়ন নিউরণ (স্নায়ুকোষ– Nurve cells) আছে। প্রত্যেক কোষ-এর পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারণ রয়েছে। মানুষ কোন কিছু শেখার সময় স্নায়ুবিক উদ্দীপনায় কোষসমূহ সক্রিয় হয় এবং প্রতিবর্তী (Reflex) ক্রিয়ার সাহায্যে শিক্ষা শুরু হয়।

পৃথিবীর সব কিছুই আল্লাহ তায়ালা মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন ঃ

পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই মানুষের জন্য উপকারী। মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য আল্লাহ তায়ালা সকল সৃষ্টিকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন– হে দুনিয়ার মানবমন্ডলী তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের উপাসনা কর, যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা স্বরূপ করেছেন আর আকাশকে করেছেন ছাদের মত, আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসেবে। অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে সমান মনে করনা। বস্তুতঃ তোমরা তা জান।১

তারা কি দেখেনা, তাদের জন্য আমি আমার নিজ হাতের তৈরী বস্তুর দ্বারা চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তারাই এগুলোর মালিক।২

আমি জন্তুগুলোকে তাদের জন্য অসহায় করে দিয়েছি। ফলে এদের কতক জন্তু তাদের জন্য বাহন আর কতক তারা ভক্ষণ করে।৩

চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে অনেক উপকারিতা তাদের জন্যে আছে আর সুপেয় পানীয় রয়েছে। তারপরও কেন তারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ নিজেদের জীবনে পালন করার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেনা?৪

স্থলভাগের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রাণী হচ্ছে হাতি। এত বিরাট দেহসম্পন্ন এবং শক্তিমত্তার দিক থেকে খুবই শক্তিশালী এ প্রাণীকেও মানুষ বশে আনতে পারে। এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এমন শক্তি-কৌশল দান করেছেন ঐ শক্তি-কৌশল ব্যবহার করে এত বিরাট প্রাণীকেও মানুষ করায়ত্ব করতে পারে। তবে চিন্তাশীল জাতিকে এটা অবশ্যই বুঝে নেওয়া কর্তব্য যে, এটা মানুষের নিজস্ব কোন শক্তি নয় বরং এটা হচ্ছে তার একক প্রতিপালক আল্লাহর অনুগ্রহ মাত্র। আমাদের অবশ্যই বুঝে নিতে হবে যে, মানুষের সকল প্রকার শক্তি আপেক্ষিক, নিরংকুশ নয়। নিরংকুশ শক্তির অধিকারী হতে পারেন শুধু আল্লাহ আর কেউ নয়। এ

---

* ২য় সেমিস্টার, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ক্ষেত্রে মানুষের সমুদয় শক্তি, চিন্তা, মেধা, মনন, বিবেচনা, যুক্তিবোধ, কর্ম-কৌশল, গবেষণা, দর্শন, তথ্য প্রযুক্তির উন্নত এ যুগে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল তৎপরতা সবই আপেক্ষিক। মানুষ বলতেই আপেক্ষিক শক্তির বৈশিষ্ট্যমন্ডিত জীব। অন্যান্য প্রাণীর তা বলার অপেক্ষাই রাখেনা।

যেহেতু যৌক্তিকভাবে বিবেচিত হল (Characterised by deliveration) এবং বাস্তবতায় প্রমাণিত হল যে, মানুষ তার সার্বিক তৎপরতার জন্য স্রষ্টার উপর নির্ভরশীল। মানুষকে দেয়া হয়েছে নির্ধারণের স্বাধীনতা তার যাবতীয় কর্মকান্ডে। কোন্‌টি ভাল আর কোন্‌টি খারাপ তা বিবেচনা করার বলিষ্ঠ শক্তি। ঐশি জ্ঞানের মাধ্যমে পথ নির্দেশনাও তাকে দেয়া হয়েছে। এবার মানুষ গ্রহণ করুক যেটি ইচ্ছা।

মানুষের ভিতর সব সময় দু'টি বোধ শক্তি জাগ্রত। একটি হচ্ছে মনুষ্যত্ববোধ (Sense of humanity) আর অন্যটি হচ্ছে পশুত্ব বোধ (Sense of brutality) । এ দু'টি বোধ শক্তি থেকে মানুষের উচিৎ মনুষ্যত্ব বোধের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করা। মানুষ যেহেতু বুদ্ধিভিত্তিক একটি উন্নত জাতি তাই তার জীবনের সামগ্রিক কর্মকান্ড নিজের ভিতর মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করে সে প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে জীবন পরিচালনা করা অনিবার্য বিবেকের দাবী। এ দাবীর বিপক্ষে যদি কোন মানুষ অবস্থান গ্রহণ করে নিজ ইচ্ছায় তাহলে তার পরিণতি ভয়ংকর হবেনা, কেউ যদি এরকম মনে করে তাহলে তাকে একজন নির্বোধ বলতে হবে।

মানুষ কোন প্রাণী থেকে বিবর্তন হয়নিঃ পৃথিবীতে মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অগ্রহণযোগ্য এবং বিজ্ঞান বহির্ভূত মতবাদ হচ্ছে চার্লস ডারউইনের 'মানব বিবর্তনবাদ' তত্ত্বটি। এতে ডারউইন বলেছে প্রতিটি জীব বিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বলে বর্তমানে আধুনিক মানব প্রজাতি বিবর্তনের অন্তর্ভূক্ত এবং আদি এর একটি শাখার উন্নত সংস্করণই আজকের এ মানব। বহুকোষী কার্ডাটা পর্বের মেরুদণ্ডী ও স্তন্যপায়ী চার পা বিশিষ্ট বানর, গরিলা, শিম্পাঞ্জি এবং মানুষ প্রাইমেট এর অন্তর্ভূক্ত। আদি প্রাইমেট এর বিবর্তনের বিভিন্ন শাখায় কেউ হয়েছে বানর, কেউ হয়েছে গরিলা, কেউ শিম্পাঞ্জি এবং সর্বাধিক বিবর্তনের সহায়ক প্রজাতির একটি শাখা মানুষে পরিণত হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দির বিজ্ঞানীরা ডারউইনের উক্ত মতবাদটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার সামনে টিকছেনা বিধায় বাতিল করে দিয়েছেন। বাস্তবাদী বিজ্ঞানীরা ডারউইনের এ তত্ত্বের অবাস্তবতা প্রমাণ করতে গিয়ে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, যদি বানর কিংবা শিম্পাঞ্জির বিবর্তনের ফলে মানুষ সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে মানুষের বিচার ক্ষমতা, প্রজ্ঞা, বিবেক, বুদ্ধিমত্তা, আত্মশক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি, বিশ্লেষণী শক্তি, চিন্তাশক্তি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য কি বিবর্তনের ফল? যা বানর কিংবা শিম্পাঞ্জির মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

সকল সৃষ্টির ভিতর শুধু মানুষই কথা বলতে পারে। প্রয়োজনীয় কথা তৈরীর জন্য সংশ্লিষ্ট অঙ্গ থেকে স্নায়ু তন্তুর মাধ্যমে সংকেত প্রেরিত হয় মস্তিষ্কের একটি কেন্দ্রে, যার নাম Speech center অধিকন্তু কথা বলার সাথে জড়িত অঙ্গসমূহের নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের যে অঙ্গ, তার নাম "ব্রোকার জোন"। বিজ্ঞানীরা বলেন মস্তিষ্কের "ব্রোকার জোন" মানুষকে বাকশক্তি সম্পন্ন করেছে। অন্য কোন প্রাণরি মস্তিষ্কে "ব্রোকার জোনের" সন্ধান মেলেনি। তাই অন্যান্য প্রাণী কথা বলতে পারে না। যদি গরিলা, শিম্পাঞ্জি কিংবা বানরের বিবর্তন থেকে মানুষ সৃষ্টি হত তাহলে অবশ্যই ঐ সব প্রাণীর মস্তিষ্কে ব্রোকার অঞ্চলের সন্ধান পাওয়া যেত। অতএব, কথা বলার বিশেষ শিল্প নৈপুণ্যতা শুধু মানুষের মস্তিষ্কে এবং স্বরযন্ত্রে সম্পৃক্ত রয়েছে। মানুষের কথা বলা আল্লাহই শিক্ষা দিয়েছেন। (৫) আল্লাহ বলেন– তিনিই (আল্লাহ) মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং কথা বলার কৌশল দান করেছেন।৬

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে একটি দায়িত্বানুভূতি সমৃদ্ধ জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেনঃ

আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে দান করেছেন দায়িত্ববোধ (Sense of responsibility) । তাকে বল্গাহীনভাবে পৃথিবীতে ছেড়ে দেননি। দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতা মানুষকে দেয়া হয়েছে। যদি কোন বুদ্ধিমান মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করে তাহলে তাকে যথোপোযুক্ত প্রতিদান দেওয়া হবে, আর যিদি পালন না করে তাহলে তাকে লেলিহান অগ্নি শিখায় (Flame of fire) প্রবেশ করানো হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন– কখনো নয় তাকে (মানুষ) যা আদেশ করা হয়েছে তা সে মোটেও পালন করেনি। সে কোন যুক্তিতে আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালন থেকে, বিরত থাকবে? মানুষ তার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি দান করুক, আমি আশ্চর্য উপায়ে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি, এরপর আমি ভূমিতে বিদীর্ণ করেছি। অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর, শাক, সবজি, যয়তুন, খেজুর, ঘট উদ্যান, ফল এবং ঘাস তোমাদের এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে। ৭ এসব নিয়ামত আল্লাহ তায়াল মানুষের জন্য তৈরী করেছেন যার মাধ্যমে মানুষ জীবিকা আহরণ করে জীবন নির্বাহ করতে পারে। এ জিনিষগুলোর স্রষ্টা কি মানুষ না কি আল্লাহ, তাহলে কোন অজুহাতে মানুষ তার স্রষ্টার দেয়া দায়িত্ব থেকে বিমুখ

হচ্ছে? বিমুখ হওয়ার কোন কারণ নেই। তাহলে দায়িত্ব পালন না করার জন্য তাকে শাস্তি দেবে না কেন। সে অকৃতজ্ঞ হয়ে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার অধিকার তাকে কে দিয়েছে?

আল্লাহ তায়ালা বলেন– আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন তোমরা কিছুই জানতে না, তিনি তোমাদের কান, চক্ষু ও চিন্তা করার মত অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।৬

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন খলিফা হিসেবে খলিফা শব্দটি আরবী, এর বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে প্রতিনিধি আর ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে Viceregent আর Viceregent বলা হয় One acting in place of a superior অর্থাৎ কোন উর্ধ্বতন ক্ষমতার স্থানে স্থলাভিষিক্ত হয়ে দায়িত্ব পালন করা। যেহেতু মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে তাই তাকে এ দায়িত্ব পালন করতেই হবে। এ দায়িত্ব পালন করা মানে আল্লাহর দাসত্ব করা। প্রতিনিধিত্ব মানে দাসত্ব। আর এ দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ মত চলা এবং দুনিয়ার মানব সমাজকে আল্লাহর নির্দেশ মত চলার জন্য আহবান করা। যদি কেউ এ মহান দায়িত্ব থেকে এড়িয়ে চলে তাহলে সে তার অর্পিত দায়িত্ব পালন করলনা এবং আত্ম প্রবঞ্চনার শিকার হল। সে জাহান্নামের উপযোগী হয়ে গেল, অতি শীঘ্রই তা সে বুঝতে পারবে।

মানুষ একটি চিন্তাশীল জাতিঃ মানুষকে বলা হয় চিন্তাশীল জাতি। চিন্তিত মানসিকতায় সে জীবন অতিক্রম করে। কোন না কোন চিন্তা তার থাকবেই। হয় ভাল চিন্তা না হয় খারাপ চিন্তা। হয় বিবেক সিদ্ধ চিন্তা না হয় প্রবৃত্তিমূলক চিন্তা।

এখানে বিবেক শব্দটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ মনে করি। বিবেক কি? বিবেক শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে Conscience পরিভাষাগত অর্থে বলতে পারি The faculty by which we distinguish right from wrong (8) অর্থাৎ এমন মনোবৃত্তি যার মাধ্যমে আমরা সঠিক ও ভূলের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে বিচার করতে পারি। আরো বিস্তৃতভাবে বলা যায়, ভাল ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়, সত্য ও মিথ্যা, সততা ও অসততা, কল্যাণ ও অকল্যাণ, ক্ষতিকর ও উপকারী, ঠিক ও বেঠিক ইত্যাদি ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে যে চেতনাবোধ দিয়েছেন এরই নাম বিবেক। এটাই মানুষের নৈতিক সত্ত্বা। এটাকেই আসল মানুষ বলা হয। দেহ মানুষের বস্তুসত্ত্বা। বস্তু জগতের প্রতি তার প্রবল আকর্ষণ। বস্তু জগতকে ভোগ করার তীব্র চাহিদা দেহের রয়েছে। বিবেক ও নৈতিক সত্ত্বার নিয়ন্ত্রণ না থাকলে মানুষ পশুর চেয়েও অধম হতে পারে। (৯) মানুষের চিন্তা শক্তিকে উদ্দীপ্ত করার লক্ষ্যে আল্লাহ বলেন–

তারা কি উষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেনা, তা কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? আকাশের প্রতি কি তাকায়না, তা কিভাবে উচ্চে স্থাপন করা হয়েছে? এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে? তারা কি পৃথিবীর দিকে তাকায়না তা কিভাবে বিছানো হয়েছে? অর্থাৎ তারা যদি এ সৃষ্টিগুলোর দিকে দৃষ্টি দিয়ে বিবেচনা করে তাহলে অবশ্যই চিন্তার সঠিক পথ তারা পাবে। (১০)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন– নিশ্চয়ই আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নির্দশন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্য।

যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা ও গবেষণা করে আসমান ও যমীন সৃষ্টির বিষয়ে– তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক এগুলো তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদেরকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। (১১)

নিশ্চয়ই আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং পাহাড় সদৃশ জাহাজসমূহ সমুদ্রে চলাচলের মধ্যে মানুষের জন্য প্রভূত কল্যাণ রয়েছে। আর আকাশ থেকে আল্লাহ তায়ালা যে পানি বর্ষণ করেন যা দ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করেন এবং তাতে (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন হরেক রকমের জীব-জন্তু। আর হাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালায় যা আল্লাহর আদেশে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে নিঃসন্দেহে সে সকল বিষয়ের মধ্যে নিদর্শন (Allatis sovereignty) রয়েছে বুদ্ধিমান মানব সম্প্রদায়ের জন্য। (১২)

মানব শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি ঃ

প্রত্যেক কিছুরই শ্রেষ্ঠত্বের বৈশিষ্ট্য রয়েছে ঐ বৈশিষ্ট্যাবলীর মাধ্যমে তাকে উন্নতির উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করা যায়। তদ্রূপ মানুষকেও শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে বিবেচনা করা যাবে যদি সে মানবতা বোধের জাগ্রত করণের মাধ্যমে নিজের জীবনকে রঞ্জিত করতে পারে। অন্যথায় সে পৃথিবীর নিম্ন থেকে নিম্নতর প্রাণীর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যায়। কুরআন শরীফের এ আয়াত মানুষের উত্তমতা ও অধমতার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন– শপথ আঞ্জীর ও যায়তুনের, সিনাই প্রান্তরস্থ তুর পর্বতের এবং নিরাপদ নগরীর (মক্কা শরীফ)। আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতর অবয়বে অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর অবস্থানে

শপথ সূর্যের এবং তার কিরণের, শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পিছনে পিছনে আসে, শপথ দিবসের যখন সে সূর্যকে প্রখরভাবে প্রকাশ করে, শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আবৃত করে, শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁর, শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন তাঁর, শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর, তারপর তাকে তার সৎকর্ম ও অসৎকর্ম করার জ্ঞান দান করেছেন। নিঃসন্দেহে এ মানুষটি সফলকাম (Indeed successful) যে নিজের জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে সকল অপবিত্রতা, নোংরামী, অশ্লীলতা, অপসংস্কৃতি, বিবেক বিরুদ্ধ ইসলাম দিক-নির্দেশনা বহির্ভূত কর্মকান্ড থেকে নিজের জীবনকে (যেহেতু তাকে উন্নত মস্তিষ্ক দেয়া হয়েছে) শোধরাতে পারল। আর নিশ্চিত রূপে সত্য যে, ঐ মানুষটি ব্যর্থ মনোরথ হল, যে নিজের জীবনকে কলুষতা, পঙ্কিলতা, অনৈতিকতা, অমানবিকতা, চরম আদর্শহীনতা (Absence of ideology) যিনি তাকে রক্তের পিন্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন সে আল্লাহর নির্দেশ বিবর্জিত মানসিক– তৎপরতার মাধ্যমে দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন (Momentary life) বরবাদ করে দিল, তাকে উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন জীব করা সত্ত্বেও। (২১)

উপসংহার : লেখার সমাপ্তিতে বলতে চাই আমরা মানুষ, সৃষ্টির সেরা জীব। আমাদের এ শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে অনুগ্রহ করে দিয়েছেন। আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে এটা অনুগ্রহ, কারণ নয়। যিনি অনুগ্রহ করেছেন বিশ্ববাসীকে, তার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং যাবতীয় আদেশ-নিষেধ পালন করাই আমাদের জীবনের প্রথম ও প্রধান চিন্তার বিষয় হওয়া উচিৎ। জীবনের সার্বিক পদক্ষেপে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার পথই প্রসারিত করা উচিৎ। কিন্তু আমরা কি তা করছি? আমাদের শিক্ষা-দীক্ষায় কি তার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার কোন অমোঘ ব্যবস্থা আছে? আমরা কি আল্লাহর নিখাঁদ খাঁটি বান্দা হওয়ার জন্য ২৪ ঘন্টার মধ্যে একটি ঘন্টাও পড়াশোনা করতে পারিনা? যদি না পারি তাহলে আমরা আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা কিভাবে হব? যিনি আকাশ, বাতাস, গ্রহ, নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন, বৃহৎ প্রাণীকে যিনি মাটির তৈরী মানুষের অধীন করে দিয়েছেন তার দেয়া জীবন ব্যবস্থাকে আমরা কোন যুক্তিতে অগ্রাহ্য করব?

তথ্যসূত্র

১. সূরা আল বাকারাহ-২২
২. সূরা ইয়াসিন -৭১
৩. সূরা ইয়াসিন - ৭২
৪. সূরা ইয়াসিন - ৭৩
৫. বিজ্ঞানময় কুরআন, ৪র্থ সংস্করণ, প্রকাশ আগস্ট, ২০০৬, প্রকাশক, মো: সাহেব আলী, মদিনা একাডেমী, পৃ: ১২২
৬. সূরা আল রহমান - ৩-৪
৭. সূরা আবাসা ২৩-৩৩
৮. সূরা নাহল - ৭৮
৯. Students Favourtie Dictionary, AT DEV, New Editior, August, 1994
১০. সূরা পা... ১৭-২০
১১. সূরা আল ইমরান ১৯০-১৯১
১২. সূরা বাকারা ১৬৪
১৩. সূরা আত্ তিন ১-৬
১৪. সূরা আল বায়্যনাহ ৬-৭
১৫. সূরা আল অরোফ ১৭৯
১৬. সূরা আল ফাতির - ৪১
১৭. সূরা আলাক ১৪-১৮
১৮. সূরা আল মূলক ৮-৯
১৯. সূরা আশ শামস ১-১০
২০. আল্লাহর খিলাফত কয়ামের দায়িত্ব ও পদ্ধতি– অধ্যাপক গোলাম আযম, প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ: ২৩

হচ্ছে মানুষের কাছে সুচিন্তিত ও সুপ্রমাণিত কোন আদর্শ নেই (Ideology)। পৃথিবীতে Total quality person শুধুমাত্র একজনই দেখা যায় যিনি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। আল্লাহর রসুলের অনুসরণ ব্যতীত সভ্যতার বিপর্যয় বিরাম হবেনা। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বিশ্ব মানবমন্ডলীকে লক্ষ্য করে বলেন–

দুনিয়ার মানুষেরা কি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের পরিবর্তে অন্য কোন জীবন বিধান অনুসন্ধান করছে? আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে স্বেচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, তারই (আল্লাহরই) আনুগত্য মেনে নিয়েছে। সকলকেই পরকালীন জীবনে ফিরে যেতে হবে। (১৭)

সে (মানুষ) কি জানেনা যে, মানুষ হিসেবে যা করা উচিৎ সে তার উপর প্রতিষ্ঠিত নেই এবং আল্লাহ তা দেখে আছেন? কখনও নয় যদি সে তার প্রবৃত্তিমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত হয়ে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে না নেয় তবে আমি তার মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াবই (We will seije tim by the fare-lock) আল্লাহর আদেশ বহির্ভূত জীবন যাপনকারীর কেশগুচ্ছ অতত্রব সে তার সাহায্যকারীদেরকে ডাকুক আর আমিও (আল্লাহ) ডাকব জাহান্নামের দারোয়ানদেরকে (দেখি সে মাটির তৈরী মানুষ কত ধৃষ্টতা দেখাতে পারে) (১৮)

অপরাধীদের দেখে জাহান্নাম রাগে ফেটে পড়ার অতিক্রম হবে। যখনই তাতে কোন সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে তখন তাদেরকে জাহান্নামে নিয়োজিত প্রহরীরা জিজ্ঞাসা করবে তোমাদের কাছে কি এ ভয়ানক জাহান্নামের ব্যাপারে কোন নবী রসুল ভয় দেখায়নি? তোমাদের কাছে এ ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়ার মত কোন গ্রন্থ ছিলনা? কোন মানুষই এ বিষয়ে সর্তক করেনি? কোন অপরাধে তোমরা আজ জ্বলন্ত অগ্নি শিখার বাসিন্দা হয়েছ? অপরাধীরা উত্তরে বলবে হ্যাঁ আমাদের কাছে ভীতি প্রদর্শনকারী এসেছিল, আমাদের কাছে কুরআন ছিল কিন্তু আমরা কোন কিছুকেই গুরুত্ব দেইনি। (১৯)

জাহান্নামীরা আফসোস করে বলবে হায়! আমাদের দুর্ভোগ আমরা যদি শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তাহলে আমরা আজ জাহান্নামে যেতাম না। কিন্তু তাদের সে আফসোস কোন কাজেই আসবে না। (২০)

মানুষের সামগ্রিক চিন্তা-ভাবনা ও কর্ম তৎপরতার প্রতিপাদ্য বিষয় কি হওয়া উচিৎ:

দৈনন্দিন জীবনে মানুষ তার জাগতিক কর্ম সম্পাদন করেই চলছে। নিজ নিজ উদ্দেশ্যসমূহ নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের চিন্তা ও কর্মতৎপরতা থামিয়ে স্থির হয়ে ভাবা উচিৎ আমরা কোথায় যাচ্ছি? আমরা কোন অজানা গন্তব্যের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছি? আমাদের এ ধাবমান হওয়া কোথায় গিয়ে থেমে যাবে? আমরা কি রকম সফল হয়েছি বা সফলতার দিকে ছুটছি? আমাদের প্রত্যেকেই চায় সফলতা। পৃথিবীর বুদ্ধিজীবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, পণ্ডিত, ভাষাবিদ, সাহিত্য বিশারদ, ইতিহাসবেত্তা, পদার্থবিদ, রসায়নবিদ, প্রত্নতত্ত্ববিদ, জ্যোতির্বিদ ইত্যাদি যারা প্রভূত শুধু পার্থিব জ্ঞানের অধিকারী অপেক্ষাকৃত উন্নত চিন্তার মনীষী যারা আমাদেরকে সফলতার শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছিয়ে দিচ্ছে প্রকৃত অর্থে সফলতা কি তাই? সফলতা শব্দটি শুধু পার্থিব জীবনের জন্য সীমাবদ্ধ? যদি কেউ সফলতাকে শুধু পার্থিব জীবনকে বেষ্টন করতে চায় তাহলে তা হবে আত্মার সংকীর্ণতা (Narroness of mind)। পৃথিবীর লৌহ মানবেরা আজ কোথায়? তাদের সফলতা আজ তাদের কোন কাজে আসছে। আর বর্তমান সময়ের যারা কিংবদন্তি তাদের সফরতা কি তাদেরকে এক মেগা সেকেন্ডও জীবন বৃদ্ধি করে দিতে পারবে? আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কেউ কি এক মুহূর্তও নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারবে? আমার এসব প্রশ্নের উত্তরে সবাই নিঃসংকোচে বলবে, না। তাহলে আমরা কোন সফলতার পিছনে ঘুরপাক খাচ্ছি? Earlnightinagal সফলতার সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে– Success is the progressive realization of a worthy goal। অর্থাৎ মানুষের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছার অগ্রগতিশীল উপলব্ধিকে সাফল্য বলে। এখান Worthy শব্দটি Valuable এবং Excellent শব্দ দ্বারা অর্থ প্রকাশ করা যায় সুতরাং worthy goal বলতে এমন চমৎকার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বুঝাবে সেখানেই সফলতার নিজস্ব বিন্দুর অবস্থান। ঐ স্থানে কেউ যদি যেতে পারে তাহলে তার আর কোন কামনা, মনোবাসনা বাকি থাকবেনা। যেখানে সকল প্রকার কর্ম তৎপরতা, চেষ্টা প্রচেষ্টা, কলা-কৌশল, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, দর্শন এক কথায় মানবীয় সকল সাধনা যেখানে শেষ যাতে শুধু থাকবে want of want তাকে শুধু Worthy goal বলা যেতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে এরকম কোন বস্তু আছে না কি? উত্তরে বলা হবে অবশ্যই এরকম একটি বস্তুর অস্তিত্ব আছে তার নাম জান্নাত। মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও কর্ম তৎপরতার প্রতিপাদ্য বিষয় হওয়া উচিৎ আল্লাহর কাছে তার সকল কিছুর জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তা যদি আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হয় তাহলে সে চির সুখের স্থান জান্নাত পাবে অন্যথায় ভয়ানক শাস্তির দিকে তাকে ঠেলে নেয়া হবে। মানুষের সফলতার বিষয়ে আল্লাহ ডিডাকশন দিচ্ছেন–

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 133-142)

পরিবেশ বিপর্যয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

হাফেজ এন.এইচ.মাসুম*

পরিবেশ কি ?

"পরিবেশ" আজকের বিশ্বসমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষকে জীব ও জড় উভয় পরিবেশের আনুকূল্য নিয়েই জীবন যাপন করতে হয়। ইসলামী জীবন বিধানে মানব জীবনের অন্যান্য বিষয়ের মত পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়েও যথার্থ বাস্তব নির্দেশনা রয়েছে। শুধু তাই নয় বস্তুতপক্ষে কেয়ামত পর্যন্ত মানব সমাজের যাবতীয় প্রয়োজন ও সম্ভাব্য সমস্যাবলীর প্রকৃত সমাধান আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলাম তথা কুরআন-সুন্নাহে বিদ্যামান। সৃষ্টির শুরু থেকেই মানবজাতি সহ সকল প্রাণী তার চারপাশের পরিবেশ থেকেই বেঁচে থাকার যাবতীয় উপাদান সংগ্রহ করে আসছে। মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ কাজে লাগিয়ে ঘটিয়েছে সভ্যতার চূড়ান্ত উন্নয়ন ও বিকাশ। কিন্তু একবিংশ শতাব্দির এই পর্যায়ে এসে পরিবেশের ভারসাম্যহীনতায় আজকের আধুনিক বিশ্ব বিপর্যস্ত। নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার,সারা বিশ্ব হয়ে উঠেছে অশান্ত,পৃথিবী হয়ে পড়ছে মানব বসবাসের অযোগ্য। পৃথিবীতেই আমাদের সমাজবদ্ধ জীবন, জীবনযাত্রার পথে আমাদের অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়। চারপাশের মৌলিক উপাদান প্রাণী জগৎকে টিকিয়ে রাখে। রোদ-বৃষ্টি, পানি বাতাস, পাহাড়-পবর্ত, নদ-নদী, গাছপালা, ঘরবাড়ি, সমাজ ও পরিবার-পরিজন নিয়ে আমাদের জীবন, আর এই চারপাশের মৌলিক উপাদানগুলোই হচ্ছে সহজ ভাষায় 'পরিবেশ'। পরিবেশ শব্দটির বিষয়বস্তুগত অর্থ ও পরিধি ব্যাপক। পারিপার্শ্বিক জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতির সব উপাদান-উপকরণের যৌথ প্রভাব ও পারস্পরিক অবস্থানই হচ্ছে পরিবেশ। প্রাণী জগৎ পরিবেশ ছাড়া বাঁচতে পারে না। মানুষের সুস্থ জীবন যাপন করার জন্য সুন্দর পরিবেশ আবশ্যক। সুস্থ মানুষকে সতেজ জীবন দিতে পারে। বিশুদ্ধ ও দূষণমুক্ত পরিবেশ ছাড়া জাতীয় জীবন উন্নত ও সমৃদ্ধ করা অসম্ভব; কিন্তু আজ দূষণমুক্ত পরিবেশ পাওয়া বেশ দুস্কর হয়ে পড়েছে। আলো-বাতাস, পানি, খাদ্য সবই প্রায় দূষিত। চারিত্রিক উৎকর্ষতা নেই বললেই চলে। দূষিত পরিবেশে জীবন যাত্রা ব্যাহত হচ্ছে, থমকে দাঁড়াচ্ছে বিশ্ব, আগামী প্রজন্ম হচ্ছে বিকলাঙ্গ।

ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবেশঃ

পরিবেশ সম্পর্কে আজকের মানুষ যতটা জ্ঞান রাখে তার ছিটেফোঁটাও যখন ছিলনা,পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের মাঝে ছিলনা কোন সচেতনতা, সেই পুঁতিময় পরিবেশের আবরণ ভেদ করে ঊষার আলো ছড়ালেন বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। উম্মী নবী আল কুরআনের শিক্ষার আলোকে, নিজের অনুপম আদর্শ চরিত্রের মাধ্যমে বিশ্ব বিবেককে জানালেন পরিবেশ সংরক্ষণের কলা কৌশল,দীক্ষা দিলেন সুস্থ,সুন্দর পরিবেশ গঠন ও উন্নয়নের। বৃক্ষরোপণকে সদকায়ে জারিয়া ঘোষণা,মক্কা ও মদীনার বিশেষ এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে উদ্ভিদ,গাছপালা কর্তন,জীবজন্তু হত্যা করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় তাঁর দূরদৃষ্টির পরিচয় বহন করে। আল্লাহ প্রদত্ত গাইডবুক আল কুরআনের মাধ্যমে তিনি যে নৈতিক বিপ্লব সাধন করেছিলেন যা পরিবেশ সংরক্ষনের নিয়ামক শক্তি তা আজকাল শুধু নয়:কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতিকে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পথ নির্দেশ দানে সক্ষম। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- (هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها)

অর্থাৎ এই পৃথিবীকে তোমাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন এবং আবাদ করেছেন। (সূরা হুদ : আয়াত নং ৬১)

---

* ৪র্থ সেমিস্টার, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে পৃথিবী আবাদ হতে পারে। পরিবেশ যখন সংরক্ষিত থাকবেনা তখন পৃথিবী আবাদ হবেনা,বাসকরার যোগ্য থাকবেনা। মানুষের চারপাশে যা কিছু আছে, তার সব কিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। মানুষের পাশে আছে জীবজন্তু, পশু-পাখি, গাছ-পালা, তরুলতা। আছে নদ-নদী, সাগর, পাহাড়-পর্বত, আরো কত কি! এ গুলো সংরক্ষন করা মানুষের দায়িত্ব। অপ্রয়োজনে এ গুলোর ক্ষতি সাধন করা অন্যায়। আল্লাহ তা'আলা ঘোষনা করেছেন-নভমন্ডলে ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে, অতএব অপ্রয়োজনে আল্লাহর সৃষ্টির ক্ষতি করলেও জবাবদীহি করতে হবে। গ্রীষ্মের খরতাপে যখন পরিবেশ উত্তপ্ত হয়, মাটি শুকিয়ে ফেটে চৌচির হয়, মানুষ ও জীবজন্তু পানির জন্য কাতর হয়ে পড়ে, সবুজ বন-বনানী শুকিয়ে ম্রিয়মান হয়ে যায়। তখন আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে পানি বর্ষন করেন। সেই পানি শুদ্ধ মাটিতে সজীব করে তোলে সবুজ -শ্যামল গাছ-গাছালি তরূলতায়। শোভাময় করে তোলে সারা প্রকৃতি। এর ফলে জীব-জন্তু পশু-পাখির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন-

(إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسماءالمسخر بين السماء والأرض لآيت لقوم يعقلون)

অর্থাৎ নিশ্চয় আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকা সমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেন তা দ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব জন্তু আর আবহাওয়া পরিবর্তন এবং মেঘমালায় যা তার হুকুমের আসমান ও যমীনের মাঝে চিরণ করে নিশ্চয় সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শণ রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য।

(সুরা আল বাকারা, আয়াত নং:১৬৪)

গাছপালা,তরূলতা মানুষ ও জীবজন্তুর খাদ্য সরবারহ করে ও মাটির ক্ষয় প্রতিরোধ করে। জ্বালানি ও ঘরবাড়ির কাঠ সরবরাহ করে। অতএব বেশি করে গাছ লাগাতে হবে। শাক-সব্জির উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। বৃক্ষরোপন করা সর্বোত্তম ইবাদত। সওযাব ও সৎ কাজের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর মাধ্যমে জীবন দান করা হয় অনাবাদী ভূমির্। মানব জীবনে আসে প্রশান্তি। ফল-ফলাদি এবং ফল-মুলের দ্বারা উপকার হয়। এর মাধ্যমে মানব জাতি সহ প্রাণি জগৎ কোন না কোন ভাবে উপকৃত হয়। এ কারণে। রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যাক্তি বৃক্ষ রোপন করার পর তা থেকে ফল উৎপন্ন হলে সেই ফল আহার করার সঙ্গে সঙ্গে আমলনামায় তার প্রতিদান লেখা হবে। যদি সেই ফল চুরিও হয় তার আমলনামায় প্রতিদান লেখা হবে। ওই ব্যক্তিকে কোন উপকার করতে না পারলেও বৃক্ষরোপনের প্রতিদান কেয়ামত পর্যন্ত পেতে থাকবে।

(هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لايحب المسرفين) (سورة الأنعام : ١٤١)

এ প্রসঙ্গে-

অর্থাৎ: তিনি নানা প্রকার উদ্যান বানিয়েছেন। কিছু লতা-গুল্ম, যা কোন কান্ড ছাড়াই মাচানোর উপর তোলে রাখা হযেছে। আবার কিছু গাছ যা মাচানোর উপর তুলে রাখা হয়নি (স্বিয় কান্ডের উপর তা এমনিই দাড়িযে আছে)। তিনি আরো সৃষ্টি করেছেন খেজুর গাছ এবং বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্যশষ্য এ গুলো স্বাদ গন্ধে একরকমও হতে পারে, যখন তা ফলবান হয়, তখন তোমরা তার ফল খাও, তোমরা ফসল তোলার দিনে যে বঞ্চিত তার হক আদায় কর, কখনো অপচয় করোনা।

অন্যত্র বলা হয়েছে :

(إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا) (سورة بني إسرائيل: ٢٧)

অর্থাৎ নিশ্চয় অপচয় কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

পরিবেশের এই দূষণ, এর কারণ ও উহা থেকে উত্তরণে ইসলামী দিক-নিদের্শনা কী? তা ব্যাপক আলোচনা ও পর্যালোচনার অবকাশ রাখে। নিম্নে আমি পরিবেশ দূষনের বিশেষ বিশেষ কারণগুলি উল্লেখ করছি।

পরিবেশ দূষণের কারণ:

পরিবেশ দূষণ এক মারাত্নক ও জটিল সমস্যা। যে সব দূষণ দ্বারা পরিবেশ দূষিত হচ্ছে তা মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অর্থনৈতিক উন্নয়ন যতদ্রুত বাড়ছে, দূষণ বাড়ছে তার চেয়ে বেশি দ্রুত। জীবন সংগ্রামের চাহিদা পূরণে দূষণের ভয়াবহতা উপলব্ধি করা সত্বেও চালিয়ে যেতে হচ্ছে উন্নয়ন কার্যক্রম। আমরা নিজেরাই বাতাসকে দূষিত করছি গ্যাস ও ধুয়া সৃষ্টির দ্বারা ।এবং মাটিকে অনুর্বর করে তুলছি অতিমাত্রায় রাসায়নিক সার,কীটনাশক,ছত্রাক নাশক ইত্যাদির ব্যবহার দ্বারা। মূলত মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে পৃথিবীর সবকিছুর উপর আধিপত্য বিস্তার করছে। আর নির্বিচারে অপরিকল্পিত সবকিছুকে তার ভোগ বিলাসের উপকরণ করতে গিয়ে আঘাত হেনেছে পৃথিবীর জীবনচক্রের ভারসাম্যে দন্ডের উপর। আল্লাহ তা'আলা যখন থেকে প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই নির্দিষ্ট পরিমাণ বিভিন্ন উপাদান ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলী দিয়েই তাকে তৈরি করেছেন। আমরা পরিবেশ দূষণের মৌলিক কারণগুলো চিহ্নিত করি। পরিবেশ দূষিত হচ্ছে প্রধানত নিম্নবর্ণিত কারণে- *বায়ু দূষণ, *বৃক্ষ নিধন, *পানি দূষণ, *অপরিকল্পিত নগরায়ন, *আর্সেনিক দূষণ, *সামুদ্রিক দূষণ, * শব্দ দূষণ, * মৃত্তিকা ক্ষয় ও উন্মুক্ত স্থান হ্রাসকরণ, * পাহাড় কাটা, * প্রাকৃতিক বিপর্যয়, * পরিবহন ও সেবা সার্ভিসে ত্রুটি, * বস্তির আধিক্য, * ভোক্তার চাহিদা বৃদ্ধি, * প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিতে হিংস্র হস্তক্ষেপ, * প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, * মানুষের রুচিহীনতা, * ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুপস্থিতি। উল্লিখিত সমস্যাগুলো পরিবেশ দূষিত করছে। এ সমস্যা সংকটে যথার্থ ইসলামী নীতিমালা ও নির্দেশনা রয়েছে। পৃথিবীর অস্তিত্ব ও ভারসাম্য রক্ষাকল্পে সুস্থ পরিবেশ বাস্তবায়নে ইসলামী নির্দেশনা পালন আবশ্যকীয়। এই মহাবিশ্ব আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। প্রাকৃতিক বস্তুরাজি মানুষের উপকারার্থে দিয়েছেন। এজন্য প্রাকৃতিক উপাদান স্বাভাবিক রাখা আমাদের দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'লা বলেন,

(إنا كل شئ خلقناه بقدر)

অর্থাৎ আমি প্রত্যেক বস্তুকে নির্ধারিত মাপে সৃষ্টি করেছি। (সূরা আল কামার, আয়াত নং ৪৯)

তাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রক্ষা ও দূষণ প্রতিরোধে সবার যথোচিত দায়িত্ব পালন করা উচিত। যত্রতত্র ময়লা-আর্বজনা নিক্ষেপ ও রুচিহীনতা পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ। অথচ ইসলাম এটাকে নিষিদ্ধ করেছে। প্রিয়নবী (সা.) বলেন-

(الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)

ঈমানের ৭০ বা তার চেয়ে বেশি কিছু শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক আবর্জনা সরানো[১]। পরিবেশ দূষণমুক্ত রেখে ধরিত্রী রক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়েছিল ব্রাজিলের রাজধানী রিওরি জেনিয়াতে। ১২দিন ব্যাপী এ সম্মেলনে ১৮৫ দেশের সাড়ে তিন হাজার প্রতিনিধি ও জাতিসংঘের সাতশ" কর্মকর্তার উপস্থিতিতে বিপন্ন প্রাণী, উদ্ভিদ, মাইক্রোবায়োলজিক্যাল প্রজাতিসমূহ ও বায়ুমন্ডল রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত আবহাওয়া পরিবর্তন কনভেনশন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়[২]। অথচ ইসলাম চৌদ্দশত বছর আগে মানুষকে পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশকে দুষণমুক্ত রাখার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে। দিয়েছে এ বিষয়ের সঠিক দিক নির্দেশনা। মিশরের প্রখ্যাত গবেষক আল্লামা সৈয়দ তানতাভী বলেনঃপবিত্র কুরআনে

পাঁচশতবার পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে[৩]। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন: (هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها)

অর্থাৎ "এই পৃথিবী তোমাদের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং এই পৃথিবী তোমাদের জন্য আবাদ করেছেন- (সূরা হূদ:৬১)

এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে পৃথিবী আবাদ হতে পারে। পরিবেশ যদি সংরক্ষিত না থাকে, তাহলে পৃথিবী আবাদ হবে না, বাসযোগ্য থাকবেনা। পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য রাসূলে কারীম (স.) বাড়ী-ঘর, পরিবেশ-পরিমন্ডলকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেনঃ

(إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أنفسكم ولاتشبهوا باليهود)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র। তিনি পবিত্রতাকে ভালবাসেন। তিনি পরিচ্ছন্ন, পরিচ্ছন্নতাকে ভালোবাসেন। মহৎ মাহাত্ম্যকে ভালোবাসেন। দানশীল, দানশীলতাকে ভালোবাসেন। অতএব, তোমরা তোমাদের ঘর-দুয়ার, বাড়ীর আঙ্গীনা, পরিবেশ-পরিমন্ডলকে পরিচ্ছন্ন রাখো। ইয়াহুদীদের মত হয়ে যেওনা।[৪]

পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয় এমন কোন কাজ করা মুসলমানের জন্য অনুচিৎ। এমন কোন ক্ষতিকারক বস্তু দেখলে তাকে সরিয়ে দেয়া প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। মহানবী (স.) বলেন إماطة الأذى عن الطريق

অর্থাৎ পথ হতে ক্ষতিকর বা কষ্টকর বস্তু সরিয়ে দেয়া ঈমানের একটি শাখা"।[৫]

পানি, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা-বনলতা, পশু-প্রাণী এসব নিঃসন্দেহে পরিবেশের অন্যতম উপাদান। ইসলাম তার শাশ্বত শিক্ষায় এগুলোকে সংরক্ষণ ও দূষণমুক্ত রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। প্রকৃতির যে পরিবেশে আমরা বেঁচে আছি সে পরিবেশের ভারসাম্যের ওপরই নির্ভর করছে আমাদের জীবন ও মরণ। আমরা নির্বিচারে চিন্তা-ভাবনাশূণ্যভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশকে ইচ্ছামতো দূষিত করে চলেছি। কী কী কাজের মাধ্যমে আমরা পরিবেশ দূষিত করে ভয়ঙ্কর সর্বনাশ ডেকে আনছি সেগুলো সঠিকভাবে জানেন কেবল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক আর বুদ্ধিজীবীরা। কিন্তু কেবল তাদের নিয়েই তো আর সমাজ গঠিত হয়নি। সমাজের পনেরো আনা মানুষই সেসব অপকর্ম সম্পর্কে সচেতন নন। আর যে একআনা লোক সেগুলো জানেন তারা ও সেসব কাজ করতে মোটেই উৎসাহী বা আন্তরিক নন। লাখ লাখ পেট্রোল-ডিজেল চালিত যানবাহনের পরিত্যক্ত বিষে বাতাস বিষক্ত হচ্ছে প্রতিদিন। ছোট-বড় মিলে হাজার হাজার কলকারখানার বিষবাষ্পও বাড়াচ্ছে বাতাসে বিষের পরিমাণ। ওই সব কলকারখানার বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ দূষিত হচ্ছে মাটি ও নদী। রেফ্রিজারেটরে ব্যবহৃত বিশেষ গ্যাসের ধাক্কায় ফাটল ধরছে ওজন স্তর। সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি সোজা এসে পড়ছে পৃথিবীতে। নির্বিচারে বন ধ্বংস করে কমাচ্ছি জমির উর্বরতা, কমাচ্ছি বৃষ্টিপাত, কমাচ্ছি প্রাণধারণের অমৃত অক্সিজেন। হু হু করে বাড়ছে পৃথিবীর তাপ। ফলে গলছে মরু দেশের কোটি কোটি টন বরফ। বেড়ে যাচ্ছে সাগরের পানি। এভাবে চললে খুব তাড়াতাড়ি সমুদ্র গ্রাস করবে কোটি কোটি মানুষের ঘরবাড়ি, বাসভূমি, নগর আর দেশ। মানুষ তথা জীবের বেঁচে থাকার আসল উপাদান পানি-বাতাস-আলো আর পায়ের তলার মাটি- এ সবগুলোর ওপরই আমরা করে চলেছি নির্মম কুঠারাঘাত। পরিচ্ছন্নতা সৌন্দর্যের মূল, সুন্দর দৃশ্যের ভিত্তিতে সৌন্দর্যের প্রধান আর্কষণ হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা। নান্দনিক জীবনে পরিচ্ছন্নতা যেমন অপরিহার্য, তেমন নাগরিক জীবনেও এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ব্যক্তি ও পরিবেশের পরিচ্ছন্নতাকে ইসলাম গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। কোরআন পাকে ব্যক্তিকে পরিচ্ছন্ন থাকার নির্দেশ দিয়েছে। পরিচ্ছন্নতা শুধু যে একটি বৈষয়িক হাতিয়ার তা নয়, বরং মানুষকে তার জীবনের দায়িত্বগুলো আঞ্জামদানের বিধান ও আত্মার পরিশুদ্ধি অবলম্বনে এর প্রভাব অত্যন্ত সুগভীর। আমি নিম্নে পরিবেশ দূষণের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি ।

বাংলাদেশের পরিবেশগত প্রধান সমস্যা:

বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রানালয়ের ১৯৯০-এর দশকে পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে National Environment Management Action plan(NEMAP) তৈরি করে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের প্রতিটি Agro-Ecological zone এর জনগনের সাথে ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে দেশের বিদ্যমান এবং পরিবেশগত সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা হয় এবং অগ্রাধিকার দেওয়া সমস্যাগুলোকে বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা হয়। তা নিম্নরূপ ঃ

ক. সেক্টরাল সমস্যা, যেমন-বন, ভূমি, পানি, বায়ু, জীববৈচিত্র কৃষি, শিল্প দূষণ জ্বালানি, মৎস্য সম্পদ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশ সচেতনতা, জনসংখ্যা, দারিদ্র এবং স্বাস্থ্য সমস্যা।

খ. স্থানীয় সমস্যা, যেমন: লবণাক্ততা ও চিংড়ি চাষ, জলাভূমি, সামুদ্রিক উপকূল বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর, চর এলাকা ও পাহাড়কাটা।

গ. দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা, যেমন:আঞ্চলিক নদীসমূহের পানি বন্টন,নগরায়ন,জলবায়ু পরিবর্তন এবং

ঘ. প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা, যেমন: প্রতিষ্টান সমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, জনগনের অংশগ্রহনের অভাব এবং সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন ও এর যথাযথ প্রয়োগের অভাব।[৬]

জলবায়ু পরিবর্তন:

কিছুদিন আগেও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষযটি সাধারণ মানুষকে এতোটা ভাবাতোনা। মূলত বিশেষজ্ঞদের গবেষনা ও কথাবার্তার সীমিত পরিসরেই এ নিয়ে উদ্বেগ পরিলক্ষিত হতো। কিন্তু হঠাৎ করেই গত ক'বছরে সারা বিশ্বেই দুর্যোগ দুর্বিপাকের সংখ্যা ও ব্যাপ্তি বেড়ে যাবার কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে ভাবনার গন্ডি মনে হয় বিস্তৃত হয়েছে। মানবজাতির জন্য এটি কতটা বিপর্যয়কর হতে পারে তা যেমন আলোচিত হচ্ছে,সাথে সাথে এ থেকে পরিত্রান পাওয়ার এবং বিভাবে একে মোকাবিলা করা যায় সে সব বিষয় উঠে আসছে বিভিন্ন আলোচনায়। তা'ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুগুলোর সাথে জড়িত বৈশ্বিক রাজনীতি এবং দরকষাকষির বিষয়গুলি নিয়েও বিতর্ক হচ্ছে বিশ্বব্যাপি। বাংলাদেশের জন্য এ সব আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সম্ভাব্য দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। পৃথিবী সংরক্ষিত থাকার জন্য,বাসযোগ্য হওয়ার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্ত হলো পানি। আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে পানির কথা ৬০ জায়গায় বলেছেন- (وجعلنا من الماء كل شئ حي أفلا يؤمنون)

অর্থাৎ সারা পৃথিবীর সব বস্তু আমি পানি হতে সৃষ্টি করেছি, যতকিছু প্রাণ পেয়েছে সব পানি থেকে, আল্লাহ পাক বলেন প্রত্যেক বস্তুকে আমি জীবন দিয়েছি পানি থেকে। কাজেই পানি আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ণ নেয়ামত। সম্ভবত জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান পৃথিবীর আলোচিত শব্দগুলোর মধ্যে একটি। শুধু বিজ্ঞানীরা নয় অর্থনীতিবীদ,রাজনীতিবদি,ব্যবসায়ী সহ সমাজের সব স্তরের মানুষই জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব্ নিয়ে বেশ চিন্তিত। এই প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই মত দিচ্ছে ধর্ম বর্ন নির্বিশেষে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে হয়তো এ সমস্যাকে আমরা মোকাবিলা করতে পারবো। আর এ জন্য প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থেকে শুরু করে সামাজিক ধমীয় অর্থনৈতিক সহ সব ধরনের জ্ঞানের সুচিন্তিত সন্নিবেশ। দুভার্গ্যজনক হলেও সত্য যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বের দরিদ্ররূক হিসেবে খ্যাত মুসলিম বিশ্ব বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সিডর,পাকিস্তানের ভূমিকম্প,সুদানের দারফুরে জাতিগত দাঙ্গাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুসলিম বিশ্ব বিপর্যস্তা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর অন্যতম প্রধান কারন হচ্ছে পরিবেশ দূষণ কিন্তু ইসলাম পরিবেশ দূষনকে গর্হিত কাজ হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং এ থেকে বিরত থাকার নির্দেষ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন-

(ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون)

অর্থাৎ মানুষের কৃতকর্মের দরূণ সমুদ্র ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে,যার ফলে তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান যাতে তারা ফিরে আসে। (সুরা আররূম আয়াত: ৪১)

এ আয়াত দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট যে বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ মানুষের ভোগান্তি বৃদ্ধি কোন অলৌকিক ব্যাপার নয় এবং আমাদের কৃতকর্মেরই ফল। মহাবিপদের সামনে দাড়িয়ে মানব সম্প্রদায়। এ অবস্থার জন্য যে আমরাই দায়ী তা ইসলাম যেমনি পূর্বেই হুশিয়ারী করে দিয়েছে তেমনি বর্তমান বিজ্ঞানও মানুষের অপরিণামদর্শি কর্মকে দোষারূপ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অধিক পরিমানে গাছ লাগানো,জীববৈচিত্র রক্ষার জন্য সচেষ্ট হওয়া, ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার, পানিসম্পদের সুষ্ট ব্যবহার এবং সর্বোপরি আমাদের বর্তমান অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন ব্যবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক বলে বিজ্ঞানীরা অভিমত ব্যক্ত করেছে। অপরদিকে ইসলাম এই বিষয়গুলো সম্পর্কে ১৪০০ বছর আগেই দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন কোন মুসলিম রোপিত বৃক্ষ থেকে কোন ব্যক্তি ফল ভক্ষণ করলে তা পরোপকার হিসেবে বিবেচিত হবে,কোন পাখি যদি ঐ বৃক্ষের ফল ভক্ষন করে তা জীবনের প্রতি দয়া প্রদর্শন হিসেবে বিবেচিত হবে। অন্যদিকে বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনকে বাংলাদেশের লবণাক্ততার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী করা হয়।[৭] আমাদের দেশের ৩২ শতাংশ ভূমি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে লবণাক্ততার শিকার হবে। লবণাক্ততার জন্য অষ্ট্রেলিয়ায় ৮ লাখ ১২ হাজার ২২ হেক্টর, ভারতের ১ দশমিক ৯৩ লাখ বর্গকিলোমিটার ও পাকিস্তানের ৬ দশমিক ৩ মিলিয়ন হেক্টর ভূমি লবণাক্ত। এ কৃষি উৎপাদনে পানি উত্তোলন,ঘরবাড়ি নির্মাণসহ ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, যব দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কবলে বাংলাদেশ:

২০০৭ সনের ১৫ নভেম্বর বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে যে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জ্বলোচ্ছাস আঘাত হানে বৈজ্ঞানিকদের দেয়া তার নাম সিডর। সিডরে যে ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে তা সবার জানা। এ সবের কারণ মূলত জলবায়ু পরিবর্তনই দায়ী। কিন্তু কেন আজ জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে? এই বিষয়ে সবাই ঐক্যমত পোষন করছেন যে মানুষই প্রধান দায়ী। জলবায়ু পরিবর্তনের তারতাম্য পৃথিবীর সকল অঞ্চল সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলেও বিশেষজ্ঞদের অনুমান এশিয়া,আফ্রিকা,ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে[৮]। আবহাওয়াগতভাবে বাংলাদেশের এক একটি অঞ্চলকে ভাগ করলে দেখা যায় চট্টগ্রাম উপকূলীয় অঞ্চল এবং সুন্দরবনের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল ভূ-ভাগ খুবই ঝুকিপূর্ণ। সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত বা বিলীন হয়ে যেতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের দরূণ আমাদের এই ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ গত কয়েক দশক যাবৎ স্থানীয় আবহাওয়ায় যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে তা ব্যাপক আলোচনা ও গবেষণার দাবি রাখে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জাতীয় বাজেট: কয়েকটি প্রস্তাবনা

- জলবায়ু পরিবর্তনের বিষযটিকে উন্নয়ন পরিকল্পনার মূলধারায় নিয়ে আসার অংশ হিসেবে সকল ব্যয় পরিকল্পনা,উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি এবং রাজস্ব আয়,করারোপ করার ছাড়ের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবতনের উপর এর ভালো-খারাপ প্রভাব যাচাই করে নেয়া বাধ্যতামূলক করা।
- দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় পরিবহন,শক্তি ও শিল্পখাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিকল্প প্রযুক্তি ও জ্বালানি সরবারহ/উৎপাদন,ব্যবহার ও সম্প্রসারনে গবেষণা ও উন্নয়নে ধাপে ধাপে বাজেট বরাদ্দ দেয়া।
- জলবায়ু দরিদ্র,জলবায়ু শরণার্থীদের প্রয়োজনীয় সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান।
- জলবায়ু পরিবর্তন-সহনীয় খাদ্য উৎপাদনে গবেষনা ও প্রযুক্তি সহায়তা পেতে অধিকহারে কার্বন ও গ্রীন হাউজ গ্যাস উৎপাদনকারী উন্নত দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য চাপ দিতে হবে।[৯]

বৃক্ষরোপণ:

(ما من مسلم يغرس غرسا فأكل منه دابة أو إنسان فما هي إلا عليه صدقة)

অর্থাৎ যে ব্যাক্তি বীজ বপন করে বা বৃক্ষ রোপন করে এবং এর দ্বারা বৃক্ষের পাতা বা দানা যা কিছুই তার বিনিময় সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গন্য হবে[১০]। এর মাধ্যমে প্রাণিকুল যে উপকৃত হবে তার বিনিময়েও থাকবে স্বতন্ত্র প্রতিদান। ইসলাম বৃক্ষ রোপনের সুদূরপ্রসারী গুরূত্ব অনুধাবন করে তার অনুসারীদের এ ব্যাপারে তাগিদ প্রদান করেছে। বৃক্ষরোপন তথা বনায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবালী আল্লাহর ইবাদতের সাথে সমতুল্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এক ব্যক্তি মহানবী (সঃ) কে বললেন আমার ভাই চাষ করে খায় আর আমি জিকির করি আর খাই। রাসূল (সাঃ) বললেন তোমার চেয়ে তোমার ভাই বেশি আবেদ। একটি গাছ থেকে মানুষ,পশুপাখি ও অন্যান্য প্রাণী ছাড়াও বিশ্বপরিবেশ বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়। কিছু উপকার সাধিত হয় প্রত্যক্ষভাবে আবার কিছু উপকার সাধিত হয় পরোক্ষভাবে। মোটকথা এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার জন্য বৃক্ষের দান অপরিসীম। বৃক্ষলতা ছাড়া মরূরবিশ্বে বেচে থাকা দায় হতো। সমগ্র বিশ্বে পরিবেশ রক্ষায় ও তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখতে বিভিন্ন কর্মসূচী নেয়া হচ্ছে, এর সম্মুখভাগে রয়েছে বনায়ন। পৃথিবীকে সবুজে ঘিরে রাখতে আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ইসলাম এ ব্যাপারে বিজ্ঞানসম্মত ও সময়োপযোগী দিক নির্দেশনা দিয়ে মানবজাতি তথা প্রাণী জগতের বসবাসের অনুকূল পৃথিবী গড়ার উৎকৃষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। শুধু রোপন কিংবা বপনই নয় বরং তা রক্ষনাবেক্ষন নিয়েও ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। মানুষ সহজে মরে যায়। কিন্তু গাছ সহজে মরে যায়না। গাছকে মেরে বা কেটে ফেলা হয়। মরার আগে একজন মানুষ পৃথিবীকে অনেক কিছু দেয়। গাছও দেয় অনেক কিছু। মানুষ দেয় তার শ্রম, মেধা, চিন্তা, সাহিত্য, আবিস্কার ইত্যাদি। আরগাছ দেয় অক্সিজেন, ছায়া, খাবার, পুষ্টি, সৌরভ, ঔষধ, জ্বালানি ইত্যাদি। একটি গাছ রোপন করা মানে পৃথিবীর বুকে এক টুকরা সবুজ সৃষ্টি করা। গাছ হলো সুন্দরের প্রতীক, সজীবতার প্রতীক, ঐশ্বর্যের প্রতীক। তাই আমাদেরকে বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে, গাছের যত্ন নিতে হবে,গাছই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। এই পুষ্প এই বৃক্ষ তরূলতা,এই বিহঙ্গ আমার জীবন এমন কানায় কানায় ভরিয়ে তুলেছে, আমার মধ্যে কোন একাকীত্ব-কোন বিচ্ছিন্নতা আমি অনুভব করতে পারিনা[১১]। বর্তমানে গাছপালা থেকে ১০৯ হাজার রকমের দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত হচ্ছে,যার অধিকাংশই আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করছি[১২]। আজকে বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষের যুগেও মানুষ শরীরের পরিধেয় সমস্ত বস্ত্র এবং অন্যান্য জিনিস জুতা, চশমা, সব কিছুই গাছ থেকেই পেয়ে থাকে। গাছপালা শুধু মানুষ ও প্রাণিকুলের খাদ্য হিসেবে নয়, চিকিৎসা ক্ষেত্রেও রয়েছে এর ব্যাপক ভূমিকা। তাই বলা হয়ে থাকে From cradle to coffin tree is necessary অর্থাৎ দোলনা থেকে শবাধার পর্যন্ত গাছের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন ১৪০০ বছর আগে মহানবী (সাঃ) উপলব্ধি করেছেন বিধায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন-

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَحْوَلُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا وَلَا يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)

মদীনা শরীফের গাছপালা কর্তন করা যবেনা যে ব্যক্তি সেখানে কোন বিপর্যয় ঘটাবে তার উপর আল্লাহ,রাসূল,ফেরেস্তা ও মানবজাতির পক্ষ থেকে অভিশাপ বর্ষিত হবে।[১৩]

জীববৈচিত্র:

পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য পাখ-পাখালি,পশু এবং হিংস্র জন্তু,বিষাক্ত সাপ,বিচ্ছু আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন। এ গুলোর মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হয়। যে এলাকায় যে জঙ্গলের জন্য যে কয়টি বিষাক্ত সাপ দরকার আল্লাহ পাক সে পরিমান বিষাক্ত সাপ তৈরি করেছেন। কাজেই অযথা,অপ্রয়োজনে বিষাক্ত সাপ হত্যা করা যাবেনা। মহানবী (সাঃ)ও বলেছেন তোমরা বিনা প্রয়োজনে বিষাক্ত প্রাণীগুলো হত্যা করতে পারবেনা। কারণ

এই বিষাক্ত প্রাণীগুলোর মাধ্যমে অনেকগুলো জীবানুকে রোধ করা হয়,যে এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমান বিষাক্ত প্রাণী থাকবেনা সে এলাকায় জীবানুগুলো মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়বে।

(إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا)

অর্থাৎ নিশ্চয় আসমান ও জমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্বরণ করে এবং চিন্তা গবেষনা করে আসমান -জমিনের সৃষ্টির বিষয়ে তারা বলে হে আল্লাহ! এ সব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি। (সূরা আলে ইমরান: ১৯০-১৯২)

ইসলাম পরিবেশ নিয়ে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা প্রদান করলেও ধর্মীয় অজ্ঞতা, গবেষণার অপ্রতুলতা এবং সর্বোপরি ধর্মীয় নিয়ম কানুন সঠিকভাবে অনুসরণ না করার ফলে বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো এখন পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। ইসলাম হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পর্ক কি হবে তা ইসলাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে। মুসলমানর বিশ্বাস করে বিশ্ব জগতের সবকিছুই মহান আল্লাহর সৃষ্টি। এবং সবাইকে তার কাছে জবাবদিহিতা করতে হবে।

(سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لايعقلون)

অর্থাৎ আল্লাহ পাক বলেন-পবিত্র ও মহান তিনি যিনি উদ্ভিদ ,মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানেনা যে তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে মহান আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকার এবং ভারসাম্যপূর্ণভাবে। (সূরা ইয়াসিন-৩৬)

আল্লাহ পাক বলেন-

(والأرض قدرنها وألقينا فيها رواسئ وأنبتنا فيها من كل شئ موزون)

অর্থাৎ পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি তাতে প্রত্যেক বস্তু উদ্ভুত করেছি সুপরিমিতভাবে। (সুরা হিজর:২০)

কিন্তু ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ভুলে গিয়ে মানুষ অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করতে থাকে। যার ফলে অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণি বিলুপ্তির পথে। পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ ভারসাম্যহীনতার জন্য যে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস অনেকাংশে দায়ী তা বিজ্ঞানীরাও বিভিন্ন গবেষণায় প্রমান পেয়েছে। তাই বিজ্ঞানীরা সহ সংশ্লিষ্ট সবাই মানুষের জীবন যাত্রা পরিবর্তনের কথা বলেছেন,ধর্মীয় অনুশাসন মানার জন্য জোর দিচ্ছে। প্রকৃতিকে আক্রমন কিছুদূর পর্যন্ত সয়,তারপরে আসে বিনাসের পালা[১৪]

আমাদের করণীয়:

"আর নয় কার্বনের বিষ, চাই পরিবেশ বান্ধব অর্থনীতি" এই রকম নিত্য নতুন প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে প্রতি বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হলেও পরিবেশ দূষণের প্রকৃত সমস্যার সমাধান কিন্তু হচ্ছেনা। আবার অনেকেই এখন অভিমত দিচ্ছেন, ধর্মের মতো বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান মানুষকে আশার আলো দেখাতে পারবেন, বিভিন্ন আন্ত র্জাতিক সংস্থা এখন ধর্মীয় জ্ঞানকে পরিবেশ রক্ষার কাজে ব্যবহারের গুরুত্ব দিচ্ছে। ১৯৯৫ সালে বিশ্বব্যাংক "আধ্যাত্বিক জ্ঞান টেকসই পরিবেশ উন্নয়নের জন্য আবশ্যক" শিরোনামে সম্মেলনের আয়োজন করে বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থ (WHO) ১৯৯৬ সালে সাস্থ্য রক্ষায় ধর্মীয় জ্ঞান শীর্ষক পুস্তিকা বের করে [১৫]। এ ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পরিবেশ রক্ষায় ধর্মীয় জ্ঞানের ব্যবহার নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। তাই আমি কোন সংকোচ ছাড়াই বলতে পারি, পরিবেশ নিয়ে ইসলাম সুস্পষ্টভাবে নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণমুক্ত রাখার প্রতি ইসলামের এই দিক নির্দেশনা উপেক্ষা করে যারা যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলে, রাস্তাঘাটে জন্তু জানোয়ারের মতো প্রস্রাব-পায়খানা করে, ধুমপান কিংবা বিষাক্ত সীসাগ্যাস, রশ্মি নিঃসারক যানবাহন,কলকারখানা

চালিয়ে,পাহাড়কেটে, বৃক্ষাদি উজাড় করে, গোলা বারুদ, কামান-বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে, অপরিকল্পিতভাবে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের অবৈধ ব্যবহারের মাধ্যমে কিংবা অন্যকোনভাবে পরিবেশ দূষিত করে এর ভারসাম্য স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করছে, তাদেরকে পরিবেশ সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের বিরূদ্ধে যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, সরকারকে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। প্রতি বছর ৫ই জুন অত্যন্ত যত্নসহকারে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হলেও এই পরিবেশ সন্ত্রাসীদের বিরূদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়না। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে উন্নত বিশ্ব আজ নিজেদেরকে পরিবেশ রক্ষার দোহাই দিয়ে পরিবেশ দুশমন কল-কারখানাগুলি তৃতীয়বিশ্বে স্থানান্তরিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। কারণ তৃতীয় বিশ্বে দু'একজন ক্ষুধার্তলোক পরিবেশ দূষণে আক্রান্ত হয়ে মারাগেলে তাতে তাদের কি আসে যায়? পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে আমাদের সবাইকে নিজ দায়িত্বে সচেতন হয়ে সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে। জাতিসংঘের উদ্যোগে এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূল অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় নিউজিল্যান্ডের রাজধানী ওয়েলিংটনে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন বলেন-বিশ্ব বর্তমান কার্বন নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছে, বিষয়টি বেশ বিপদজনক, বরং এটা আমাদের নিয়ন্ত্রন করছে। ফলে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আমরা অন্ধ থেকে গেছি।[১৬] জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা, দরিদ্র, অপুষ্টি, অশিক্ষা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মানবাধিকার লংঘন,ও চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ইত্যাদি সমস্যার মতো পরিবেশদূষণের সমস্যাকে আন্ত র্জাতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে।[১৭] তাছাড়া জাতিসংঘ ২০১৫ সালের মধ্যে উন্নত বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে যে সব এজেন্ডা নিয়েছে তার মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণও একটি। পরিশেষে আমি বলতে চাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ বিপর্যয় বর্তমান সময়ের এক মারাত্মক সমস্যা। এই সমস্যা সৃষ্টির জন্য বহুলাংশই মানবীয় কর্মকান্ড দায়ী। সুতরাং শুধুমাত্র আমরাই সচেতন হলে এই সমস্যা সমাধান হবে বলে আমার বিশ্বাস। আগামী প্রজন্মের জন্য সুস্থ, সুন্দর, নির্মল পরিবেশ রচনার দায়িত্ব আমাদেরই। আমরা যেন রেখে যেতে পারি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী,সে প্রচেষ্টায় নিরন্তর লেগে থাকাই হোক আমাদের সাধনা। আমারা যেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই হতাশার বাণী আর না শুনি - "বিধাতার যা কিছু কল্যানের দান,আপনার কল্যাণে বিস্মৃত হয়ে মানুষ তাকেই নষ্ট করছে"[১৮]।

তথ্যসূত্র

১ বুখারী ও মুসলিম, কিতাবুল আদব-হাদীস নং ৬৮৪

২ বি. এম. মফিজুর রহমান আল্ আযহারি, ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস ও তার প্রতিকার, প্রথম প্রকাশ, (চট্টগ্রাম: ইউনিক লাইব্রেরী, এপ্রিল ২০০৬), পৃষ্টা নং ২৪৫.

৩ মাহামুদুল হাসান, মিম্বারের ধ্বনি- প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০০৫-মিছবাহুল ফালাহ প্রকাশনী, চকবাজার, চট্টগ্রাম, পৃষ্টা নং ১১৮

৪ সুনান আত তিরমিযি. কিতাবুল আদব, বাবু ফিন নাযাফাহ, হাদিস নং ২৭২৩.

৫ প্রাগুক্ত, হাদসি নং ৬৮৪

৬ ড. মো: ময়নুল হক, ইসলাম:পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, পৃষ্টা নং ২৫০

৭ দৈনিক আমার দেশ-৫ই জুন ২০০৮

৮ পরিবেশপত্র, জানুয়ারী সংখ্যা, পৃষ্টা নং ৩২

৯ অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ডঃ এ বি মির্জা আজিজুল ইসলাম এর বাজেট পেশকে কেন্দ্র করে লিখিত ডক্টর আতিউর রহমানের প্রবন্ধ থেকে সংকলিত, দৈনিক প্রথম আলো, ১০ জুন, ২০০৮

১০ সহীহ মুসুলিম, আল মুসকাত, হাদীছ নং ২৯০১

১১ কথা সাহিত্যিক আহমদ ছফা, পরিবেশপত্র, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, পৃষ্টা নং:০৭

১২ এবিএম রবিউল ইসলাম, পরিবেশ দূষণ বনায়ন ও ইসলাম, অগ্রপথিক, ইফাবা অক্টোবর/২০০০, পৃষ্টা নং ৯৭

১৩ বুখারী, বাবু হারমুল মদীনা, হাদীস নং ১৭৩৪

১৪ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরণ্য দেবতা, পৃষ্টা নং ৩৭৩

১৫ দৈনিক নয়া দিগন্ত-৫ই জুন ২০০৯

১৬ দৈনিক জনকণ্ঠ ৬ জুন ২০০৮

১৭ সরোয়ার আমিন বাবু, পরিবেশ সংরক্ষনে জাতিসংঘ, বায়োজার্ণাল, পৃষ্টা নং ০৭

১৮ অরণ্য দেবতা, রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড,পৃষ্ঠা নং ৩৭৩

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 143-150)

চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্যঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ

মুহাম্মাদ আমিনুল হক*

ভূমিকা

গত কিছুদিন যাবৎ ভাস্কর্য নির্মাণ নিয়ে বাংলাদেশে ব্যাপক হৈ চৈ হচ্ছে। বিশেষ করে বাউল সম্রাট লালনের ভাস্কর্য নির্মাণ ও ভাংচুর নিয়ে এর পক্ষে বিপক্ষে অনেক আলোচনার ঝড় উঠে। কেউ কেউ মনে করেন যে, ভাস্কর্য নির্মাণ একটি শিল্পকর্ম। এ শিল্পকর্ম করতে কোন আপত্তি নেই। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, ভাস্কর্য নির্মাণ একটি শিল্পকর্ম হলেও এর বৈধ ও অবৈধ উভয়দিকই বিদ্যমান। অতএব, এটি যদি বৈধ পন্থায় নির্মিত হয়, তাহলে কোন আপত্তি নেই।

আমরা যদি মানব ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে নিশ্চয়ই দেখতে পাব যে, চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য বিনির্মাণ কোন নতুন বিষয় নয় বরং এটি আদিকাল থেকেই বিদ্যমান ছিল। চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিও বেশ স্পষ্ট। নিম্নের আলোচনায় আমরা ভাস্কর্যের উৎপত্তি, এর বিকাশ এবং এর বৈধতা-অবৈধতা সম্পর্কে বিশদভাবে তুলে ধরবো; যাতে সকলের কাছেই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে।

চিত্রাঙ্কন কি?

চিত্রাঙ্কন হচ্ছে- কোন ব্যক্তি বা বস্তুর হুবহু অবয়ব ফুটিয়ে তোলা।[১] কোন কিছুর চিত্র অঙ্কন করা।[২] আরবীতে বলা হয় التصوير। আর ইংরেজীতে বলা হয়- Drawing, Painting, Portrayal, Figaration ইত্যাদি।[৩]

ভাস্কর্য কি?

ভাস্কর্য শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে- ভাস্কর শিল্প; প্রস্তরাদি খোদাই করে বা তা দিয়ে মূর্তি নির্মাণের কাজ।[৪] আর ইংরেজীতে এর অর্থ হচ্ছে- sculp·ture; statue; statuette, monument, figurine, carving, figure: creation of three-dimensional art: the creation of a three-dimensional work of art, especially by carving, modeling, or casting; three-dimensional work of art: a work of art created by sculpture, or such works collectively.[৫]

অর্থাৎ- কোন কিছুর ত্রিমাত্রিক শিল্পকর্মই হচ্ছে ভাস্কর্য, অথবা ভাস্কর কতৃক কোন কিছুর চিত্রকর্মকে ভাস্কর্য বলে।

আরবীতে ভাস্কর্য হচ্ছে- تمثال যার বহুবচন হচ্ছে- تماثيل যার বাংলা অর্থ হলো- মূর্তি, প্রতিমা, প্রতিমূর্তি, প্রতিচ্ছবি, আকৃতি ইত্যাদি।[৬]

মোটকথা ভাস্কর্য হচ্ছে- কাঠ, পাথর, মাটি, সিমেন্ট, লোহা, তামা, স্বর্ণ ও যে কোন বস্তু দিয়ে কোন কিছুর হুবহু কিংবা আংশিক প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করা।

মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম ভাস্কর্য নির্মাণঃ

যদি আমরা আদি মানব হযরত আদম (আ.) থেকে অদ্যবদি পর্যন্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাই যে, ভাস্কর্য নির্মাণের কাজ নূহ (আ.) এর জাতিই সর্বপ্রথম করেছিল। এর পূর্বে কেউই এ কর্ম করেনি। আমরা যদি সূর নূহ এর ২৩ নং আয়াতের শানে নুযূল পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাই প্রায় সকল তাফসীরকারকই এ আয়াতের ব্যখ্যায় সর্বপ্রথম ভাস্কর্য নির্মাণের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। ভাস্কর্য সম্পর্কিত আয়াতটি হচ্ছে- (وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا)

-"তারা বলছেঃ তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করোনা এবং ত্যাগ করোনা ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে" (আল কুরআন, সূরা নূহঃ ২৩।)

---

* প্রভাষক, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

আল্লাহর কাছে নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে নূহ (আ.) আরও বললেনঃ তারা পরস্পরে এই চুক্তিতেও উপনীত হয়েছিল যে, وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

অর্থাৎ, আমরা আমাদের দেব-দেবী বিশেষতঃ এই পাঁচ জনের উপাসনা পরিত্যাগ করবনা। আয়াতে উল্লেখিত শব্দগুলো পাঁচটি প্রতিমার নাম।

ইমাম বাগভী বর্ণনা করেন, এই পাঁচ জন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার নেক ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দা ছিলেন। তাদের সময়কাল ছিল হযরত আদম (আ.) ও নূহ (আ.) এর আমলের মাঝামাঝি। তাঁদের অনেক ভক্ত ও অনুসারী ছিল। তাঁদের ওফাতের পর ভক্তরা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহ তাআলার এবাদত ও বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে। কিছুদিন পর শয়তান তাদেরকে এই বলে প্ররোচিত করলঃ তোমরা যেসব মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উপাসনা কর, যদি তাদের মূর্তি তৈরী করে সামনে রেখে লও, তবে তোমাদের উপাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হবে। তারা শয়তানের ধোঁকা বোঝতে না পেরে মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি তৈরী করে উপাসনালয়ে স্থাপন করল এবং তাদের স্মৃতি জাগরিত করে এবাদতে বিশেষ পুলক অনুভব করতে লাগল। এমতাবস্থায়ই তাদের সবাই একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেল এবং সম্পূর্ণ নতুন এক বংশধর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল। এবার শয়তান এসে তাদেরকে বোঝালঃ তোমাদের পূর্বপুরুষদের খোদা ও উপাস্য মূর্তিই ছিল। তারা এই মূর্তিগুলোরই উপাসনা করত। এখান থেকেই প্রতিমা পূজার সূচনা হয়ে গেল। উপরোক্ত পাঁচটি মূর্তির মাহাত্ম্য তাদের অন্তরে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত ছিল বিধায় পারস্পরিক চুক্তিতে তাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৭]

ভাস্কর্য নির্মাণের কাজ নূহ (আ.) এর জাতির পূর্বে আর কেউ যে করেনি এতে কোন সন্দেহ নেই। সূরা ইউনুস এর ১৯ নং আয়াতের[৮] তাফসীর করতে গিয়ে ইবনে কাসীর বর্ণনা করেনঃ মূর্তি পূজার শিরক মানুষের মাঝে নতুন। এটি আগে কখনো ছিলনা। সব মানুষই এক ধর্মের অনুসারী ছিল। আর তা হচ্ছে- ইসলাম। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেনঃ আদম (আ.) ও নূহ (আ.) এর মধ্যে দশ শতাব্দী ব্যবধান ছিল। এ সময়ের সব মানুষই ইসলাম ধর্মের অর্ন্তভুক্ত ছিল। এরপর তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল এবং মূর্তি পূজা শুরু হল। অতঃপর আল্লাহ তাদের হেদায়েতের জন্য তাদের মাঝে একত্ববাদের পক্ষে দলীল সহকারে রাসূল প্রেরণ করলেন।[৯]

অতএব, মূর্তি নির্মাণের কাজ সর্বপ্রথম নূহ (আ.) এর জাতিই শুরু করে। অতঃপর আল্লাহ তাদের হেদায়েতের জন্য নূহ (আ.) কে তাদের মাঝে প্রেরণ করলেন, যাতে তারা এহেন জঘন্য শিরক হতে বিরত থাকে।

ইসলামের দৃষ্টিতে চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্যঃ

ইসলামে চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণের বিধান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এখানে দুটি বিধান বিদ্যমান।

প্রথমত : বৈধ চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ সম্পর্কিত বিধান।

দ্বিতীয়ত : অবৈধ চিত্র ও ভাস্কর্য নির্মাণ সম্পর্কিত বিধান।

নিম্নে আমরা উভয় বিধান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রথমতঃ

প্রাণীদের চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণঃ যে সকল বস্তুর প্রাণ আছে, তার চিত্র অঙ্কণ কিংবা ভাস্কর্য, মূর্তি বানানো কোনভাবেই জায়েজ নেই। ইসলাম এ কাজকে পুরোপুরি হারাম ঘোষণা করেছে। প্রাণীদের চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণের কাজকে শুধু শুধু নিষিদ্ধ করা হয়নি; বিশেষ কয়েকটি দিক বিবেচনা করে একে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এ দিকগুলি হচ্ছে-

একঃ

কোন প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণ কিংবা তার চিত্র আঁকার বিষয়টি শুধু ফিকহ (ইসলামী বিধান) এর সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং এটি একজন মুসলমানের আক্বীদা (বিশ্বাস) এর সাথে জড়িত বিষয়। একজন মুসলমান মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, দুনিয়ার সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ। তাঁর কাজে কোন শরীক নেই। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করবেন, তার অবয়ব দান করবেন এটাই স্বাভাবিক। অতএব, কোন প্রাণীর অবয়ব দান, মূর্তি তৈরি করা কিংবা এগুলি তৈরি করে ইলাহ এর সম্মান দেয়া মস্তবড় শিরক। কেননা এর মাধ্যমে আল্লাহর কর্মের সাদৃশ্য স্থাপনের চেষ্টা করা হয় যা ইসলামী আক্বীদার পরিপন্থী। কোন কিছু তৈরি করা, তার চেহারা দান করা ঊীপষঁংরাবষু আল্লাহরই কাজ। এগুলি যে মহান আল্লাহ তায়ালার কাজ সে সম্পর্কে নিম্নে দলীল উপস্থাপন করা হল-

ক) কুরআনের দলীলঃ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন-

(هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)

-"তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে, যেমন তিনি চেয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।"

(আল কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত নংঃ ৬।)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

(وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ)

-"আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার-অবয়ব, তৈরি করেছি। অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি- আদমকে সেজদা কর তখন সবাই সেজদা করেছে; কিন্তু ইবলীস সে সেজদাকারীদের অর্ন্তভূক্ত ছিল না।" (আল কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত নংঃ ১১।)

তিনি আরো বলেন-

(هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)

-"তিনিই আল্লাহ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।"

(আল কুরআন, সূরা আল-হাশর, আয়াত নংঃ ২৪।)

আল্লাহ আরো বলেন-

(يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (٦) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (٧) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ)

-"হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল?। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন। তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন।" (আল কুরআন, সূরা আল-ইনফিতার, আয়াত নংঃ ৬-৮।)

এ আয়াতগুলি এ সাব্যস্ত করে যে, কোন কিছু সৃষ্টি করা, তার রূপ, অবয়ব দান কেবল আল্লাহরই কাজ। অতএব, মানুষ কর্তৃক কোন প্রাণীর রূপদান, ভাস্কর্য, মূর্তি নির্মাণ করা বৈধ নয় বরং তা সীমালংঘন ও আল্লাহর কাজে সাদৃশ্য অবলম্বন যা অত্যন্ত গুনাহের কাজ।

খ) হাদীসের দলীলঃ

١-عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১. -"উম্মুল মু'মিনীন আ'য়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, উম্মে হাবীবাহ ও উম্মে সালামাহ বর্ণনা করেন যে, তাঁরা হাবশার একটি উপাসনালয়ে কতিপয় চিত্র দেখেছিলেন। অতঃপর তাঁরা উহা সম্পর্কে আল্লাহর রাসূলকে বললেন। তখন আল্লাহর রাসূল বলল-তাদের মধ্যে যদি কোন সৎ লোক মারা যেত তাহলে তারা তার কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করত এবং উহাতে তাদের ছবি চিত্রায়িত করে রেখে দিত। তারা সকলেই কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বান্দা হিসেবে পরিগণিত হবে।"[১০]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন- "উক্ত হাদীসে চিত্রাঙ্কন (প্রাণীর) হারাম করার দলীল বিদ্যমান"[১১]

٢- عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا ابن عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ.

২. "সাঈদ ইবনে আবুল হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি ইবনু আব্বাস (রা.) এর নিকট বসা ছিলাম এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো- হে ইবনে আব্বাস আমি একজন সাধারণ মানুষ, আমি

আমার জীবন ধারনের জন্য আমার হাতের কর্মের উপর নির্ভর করি, আর আমি এই চিত্রগুলি তৈরি করি। অতঃপর ইবনু আব্বাস বলেনঃ এ ব্যাপারে আমি রাসূল (স.) থেকে যা শুনেছি আমি শুধু তা-ই তোমার কাছে বর্ণনা করবো। আমি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি কোন প্রাণীর চিত্র অঙ্কন করবে আল্লাহ তাঁকে কিয়ামতে কঠিন শাস্তি দিবেন যতক্ষণ না সে ঐ চিত্রায়িত বস্তুর মধ্যে প্রাণ দিতে পারে, আর সে কখনো প্রাণ দিতে পারবেনা। একথা শুনে ঐ ব্যক্তির চেহারা হলদেটে হয়ে গেলে ইবন আব্বাস তাকে বললেনঃ যদি এ কর্ম ছাড়া তোমার কোন গত্যন্তর না থাকে তাহলে তুমি গাছ-পালা বা এ জাতীয় যে কোন বস্তুর চিত্রাঙ্কন করতে পারো যাতে কোন প্রাণ নেই।"[১২]

৩- عن عبد الله بن مسعود قال سمعت النبي، صلى الله عليه وسلم يقول : إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون.

৩. "আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাব দেওয়া হবে চিত্রকরদের।"[১৩]

৪- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم.

৪- "আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নিশ্চই আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেনঃ নিশ্চই যারা প্রাণীদের চিত্রাঙ্কন করে তারা কিয়ামতে কঠিন শাস্তি পাবেন, আর তাদেরকে বলা হবে- তোমরা যা তৈরি করেছ তার মধ্যে প্রাণ দাও।"[১৪]

৫- عن أبي هريرة أنه دخل داراً بالمدينة فرأى أعلاها مصورا يصور قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرّة.

৫. আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি মদীনার এক বাড়িতে প্রবেশ করে তার উপরে একজন চিত্রকরকে চিত্রাঙ্কন করতে দেখলেন। তখন তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি- আল্লাহ বলেন, তার চেয়ে আর কে বেশি যালিম যে আমার সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টি করে? তার ক্ষমতা থাকলে অতি ক্ষুদ্র কোন প্রানী কিংবা যবের ন্যায় কোন শষ্যদানা সৃষ্টি করুক"।[১৫]

ইমাম নববী বলেনঃ "فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرّة " এর অর্থ হচ্ছে- কোন বান্দা পারলে প্রাণ দিয়ে অতি নগন্য কোন বস্তু সৃষ্টি করুক যা আমার সৃষ্ট প্রাণীর ন্যায় চলতে পারে, খাইতে পারে। অথবা যবের ন্যায় একটি শষ্যদানা সৃষ্টি করুক যা আমার সৃষ্ট শষ্যের মত ঝাল, টক, মিষ্টি হবে। আর এটা বান্দার জন্য অসম্ভব কর্ম।"[১৬]

৬- عن أبي جحيفة قال : نهى النبي، صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى، عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور.

৬. আবু হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (স.) কুকুর ও রক্ত ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। .....এবং তিনি চিত্রকরকে লা'য়ানত দিয়েছেন।"[১৭]

দুইঃ

ইসলামী শরীয়া'হ মূর্তি, ভাস্কর্য নির্মাণের জন্য আসেনি বরং এগুলোকে ধ্বংস করার জন্য এসেছে। নিম্নে এর দলীল উপস্থাপন করা হলো-

ক. হাদীসে এসেছে-

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : دخل النبي، صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة ثلاث مائة وستون نصبا فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول { جاء الحق وزهق الباطل } الآية

"আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (স.) যখন মক্কা বিজয়ের সময় মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন তিনি কা'বা ঘরের চারপাশে তিনশত ষাটটি ভাস্কর্য পেলেন অতঃপর তিনি তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে ঐগুলিকে খোঁচা মেরে ভেঙ্গেছিলেন আর বলছিলেন[১৮]- { جاء الحق وزهق الباطل } সত্য এসেছে এবং বাতিল ধ্বংস হয়েছে।"[১৯]

খ. হাদীসে আরো এসছে-

عن أبي الهياج الأسدى قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وفي رواية (ولا صورة إلا طمستها).

"আবু হাইয়াজ আল আসাদী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাকে আলী ইবনে আবি তালিব বলেছেনঃ আমি কি তোমাকে তেমনিভাবে প্রেরণ করবনা যেমনি ভাবে আল্লাহর রাসূল (স.) আমাকে প্রেরণ করেছেন? তুমি কোন ভাস্কর্য পেলে তা পা দিয়ে পিষে ফেলবে, উচু কবর দেখলে সমান করে দিবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে কোন প্রাণীর চিত্র দেখলে তা পিষে ফেলবে।"[২০]

তিনঃ

আল্লাহর রাসূল (স.) ঐ ব্যক্তিকে হুমকি দিয়েছেন যিনি তার ঘরে কোন প্রাণীর চিত্র কিংবা ভাস্কর্য রাখে। এবং তিনি এহেন কর্মের জন্য পাপ হওয়া ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

ক. রাসূল (স.) বলেনঃ " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل "

"ঐ ঘরে ফিরিস্তা প্রবেশ করেনা যে ঘরে কুকুর ও ভাস্কর্যের চিত্র থাকে"[২১]

খ. হাদীসে এসেছে-

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهية فقلت : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبتُ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بال هذه النمرقة ؟ قلت : اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال : إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.

"হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি একটি গির্দা কিনেছিলেন যাতে কিছু চিত্রাঙ্কন ছিল। যখন রাসূল (স.) উহা দেখলেন তখন তিনি ঘরে প্রবেশ না করে দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন, তখন আমি তাঁর চেহারায় তুচ্ছতার ছাপ লক্ষ করে বললামঃ হে আল্লার রাসূল (স.) আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে মাফ চাচ্ছি, আমি কি এমন অপরাধ করলাম? অতঃপর আল্লাহর রাসূল (স.) বললেনঃ এ গির্দা কিসের জন্য? আমি বললামঃ এটি আপনার জন্য আমি কিনেছি, আপনি এতে বসবেন এবং বালিশ রূপে ব্যাবহার করবেন। অতঃপর রাসূল (স.) বললেনঃ এ সমস্ত চিত্রের চিত্রকরগণ কিয়ামতের দিন কঠিন আযাবের মুখোমুখি হবেন এবং তাদের বলা হবে- তোমরা যা সৃষ্টি করেছ তাতে প্রাণ দাও। এবং তিনি আরো বলেনঃ যে ঘরে কোন প্রাণীর চিত্র থাকে সে ঘরে কোন ফিরিস্তা প্রবেশ করেনা।"[২২]

চারঃ

কোন প্রাণীর চিত্রাঙ্কন করা বা ভাস্কর্য নির্মাণ করা শিরক এ পতিত হওয়ার একটি ওসিলা। কেননা যে প্রাণীর চিত্র নির্মাণ করা হয় তার শুরুটা সম্মান স্বরূপ হলেও পরবর্তীতে অজ্ঞতাবসতঃ তাকে খোদার মর্যাদায় পৌছানো হয়। যে ঘটনা আমরা ইতোঃপূর্বে হযরত নূহ (আ.) এর জাতির মধ্যে দেখেছি। এ সম্পর্কিত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের একটি হাদীসও পূর্বের আলোচনায় স্থান পেয়েছে।[২৩]

উপরের কুরআন ও হাদীসের আলোকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হলো তা হচ্ছে- যে কোন প্রাণওয়ালা বস্তুর ভাস্কর্য, চিত্র তৈরি করা নিষেধ। নিষিদ্ধ হওয়ার দিকগুলো হচ্ছে-

১. চিত্রকরকে লা'য়ানত দেয়া হয়েছে।
২. তাকে কিয়ামতের দিন কঠিন আযাব দেওয়া হবে।
৩. যিনি এ কাজ করেন তাকে মহা যালিম হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।
৪. এহেন কর্মকে নিষেধ করা হয়েছে।
৫. আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে ঘরে মূর্তি, ভাস্কর্য, প্রাণীর চিত্র থাকে সে ঘরে ফিরিস্তা প্রবেশ করেনা।

উপরোক্ত আলোচনায় ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কন হারাম হওয়ার তিনটি কারণও আমারা দেখতে পাই-

১. ভাস্কর্য নির্মাণ ও চিত্রাঙ্কনে আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য সাধনের চেষ্টা।
২. কাফেরদের কাজের সাথে সাদৃশ্যতা।
৩. এটি শিরকে পতিত হওয়ার একটি ওসিলা।

আল্লামা ইউসুফ আল কারদাভী এ সম্পর্কে বলেনঃ "ইসলাম সকল প্রকার প্রাণীর দৈহিক রূপ চিত্রায়িত করা, ভাস্কর্য নির্মাণ করাকে হারাম করেছে। চাই সেটি মানুষের কিংবা অন্য যে কোন প্রাণীর হোক। হারামের মাত্রা আরো বেড়ে যাবে যদি এটি কোন সম্মানিত মানুষের জন্য করা হয়। যেমনঃ- কোন প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, নবী, ওলী কিংবা বিধর্মীদের ইলাহদের মূর্তি যেটি হিন্দুরা করে থাকে। এটি হারামতো বটেই এমনকি একর্মটি কুফরি কর্ম হবে। আর কেউ যদি এ কর্মকে হালাল মনে করে তাহলে তিনি কাফের হবেন।"[২৪]

সমস্ত আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, ইবাদত কিংবা সম্মান প্রদর্শনের জন্য এ কাজ করা পুরোপুরি হারাম। কেননা এটি অপবিত্র কর্ম। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)

"সুতরাং তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথন থেকে দূরে সরে থাক।" (আল কুরআন, সূরা আল হাজ্জঃ ৩০)

নিম্নের শর্তগুলি বিদ্যমান থাকলে উল্লেখিত কারণ ছাড়াও এ কাজ বৈধ নয়। শর্তগুলি হচ্ছে-

১. ভাস্কর্য, চিত্রটি প্রকাশ্য পূর্ণাঙ্গ অবয়বের হতে হবে।

২. এটি নির্মাণের কোন আবশ্যকীয় প্রয়োজনীয়তা থাকবেনা।

৩. এটি এমন বস্তুতে নির্মিত হতে হবে যা দীর্ঘস্থায়ী হয়, যেমনঃ কাঠ, পাথর, ধাতু ইত্যাদি।

যাতে করে কোন মানুষ মূর্তি পূজা না করতে পারে অথবা তাদের সাথে বৈসাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা পায় যারা এ কাজকে পবিত্র মনে করেন। যেমনিভাবে আল্লাহর রাসূল (স.) প্রাণীর চিত্রওয়ালা কাপড় ছিড়ে ফেলেছিলেন; কেননা এটি এমন বিশ্বাসের দিকে ইশারা করে যাকে কতিপয় মানুষ তাদের ধর্মের মৌলিক কর্ম হিসেবে বেছে নিয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, কোন প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণ ও চিত্রাঙ্কন ইসলাম পুরোপুরি নিষিদ্ধ করেছে। এ কর্ম যিনি করেন তিনি আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করে লা'য়ানতের উপযুক্ত হন। আমরা এহেন কর্ম থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

দ্বিতীয়তঃ বৈধ চিত্র ও ভাস্কর্য নির্মাণ:

ইসলাম নিম্নোক্ত বিধানের ভিত্তিতে চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণের বৈধতা দিয়েছেঃ

১. যে বস্তুর কোন প্রাণ নেই এমন বস্তুর ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কনে ইসলাম বৈধতা দিয়েছে। তাই কোন কোন প্রাণহীন বস্তু যেমনঃ গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, আসমান-যমীন ও প্রাকৃতিক বস্তুর চিত্র ও ভাস্কর্য নির্মাণে কোন দোষ নেই। প্রাণহীন বস্তুর চিত্র ও ভাস্কর্য নির্মাণের বৈধতার দলীল হচ্ছে-

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا ابن عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ.

"সাঈদ ইবনে আবুল হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি ইবনু আব্বাস (রা.) এর নিকট বসা ছিলাম এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো- হে ইবনে আব্বাস আমি একজন সাধারণ মানুষ, আমি আমার জীবন ধারনের জন্য আমার হাতের কর্মের উপর নির্ভর করি, আর আমি এই চিত্রগুলি তৈরি করি। অতঃপর ইবনু আব্বাস বলেনঃ এ ব্যাপারে আমি রাসূল (স.) থেকে যা শুনেছি আমি শুধু তা-ই তোমার কাছে বর্ণনা করবো। আমি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি কোন প্রাণীর চিত্র অঙ্কন করবে আল্লাহ তাঁকে কিয়ামতে কঠিন শাস্তি দিবেন যতক্ষণ না সে ঐ চিত্রায়িত বস্তুর মধ্যে প্রাণ দিতে পারে, আর সে কখনো প্রাণ দিতে পারবেনা। একথা শুনে ঐ ব্যক্তির চেহারা হলদেটে হয়ে গেলে ইবনু আব্বাস তাকে বললেনঃ যদি এ কর্ম ছাড়া তোমার কোন গত্যন্তর না থাকে তাহলে তুমি গাছ-পালা বা এ জাতীয় যে কোন বস্তুর চিত্রাঙ্কন করতে পারো যাতে কোন প্রাণ নেই।"[২৫]

এ হাদীসের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয় যে, প্রাণহীন বস্তুর চিত্র ও ভাস্কর্য নির্মান বৈধ। যেমনঃ গাছ, সাগর, সূর্য, চন্দ্র, পাহাড়, আকাশ, মসজিদ ইত্যাদি।

২. ভাস্কর্য যদি অপূর্ণাঙ্গ হয় যা ছাড়া জীবিত অবস্থায় কোন প্রাণী চলতে পারেনা তাহলে তা বৈধ হবে। যেমনঃ কোন মস্তকবিহীন বা পেটবিহীন চিত্র কিংবা ভাস্কর্য।

৩. চিত্র কিংবা ভাস্কর্য নির্মাণে যদি কোন স্বার্থ জড়িত থাকে, যেমনঃ মেয়ে শিশুদের খেলনা, শিক্ষার উপকরণ তাহেলে তা বৈধ হবে। কেননা আল্লাহর রাসূল (স.) হযরত আ'য়েশা (রা.) কে খেলনা পুতুল নিয়ে খেলা করতে বারণ করেননি। তাই আলেমগণ মনে করেন যে, পুতুল নিয়ে খেলা করা কন্যা শিশুদের জন্য বৈধ এ কারণে যে এর মধ্যে তার জন্যে ভবিষ্যৎ মা হয়ে শিশু লালনের অনুশীলন নিহিত। তাই বালিকাদের এ কর্ম চিত্র ও ভাস্কর্য নির্মাণ ও তা ঘরে রাখার সাধারণ নিষেধের আওতায় পড়বেনা।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي.

"হযরত আ'য়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আমার সাথীদের সাথে খেলনা পুতুল নিয়ে খেলা করতাম। একদা আল্লাহর রাসূল আমাদের খেলার সময় এসে পড়লে আমার সাথীরা একটু লজ্জা পেল তখন আল্লাহর রাসূল তাঁদেরকে গোপনে আমার কাছে এসে খেলা করার সুযোগ দিলেন।"[২৬]

৪. ভাস্কর্য যদি কোন মিষ্টান্ন, ময়দা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা হয় তাহলে আসবাগ বিন আল ফারয আল মালেকির মতে তা বৈধ।

৫. আর ফটোগ্রাফার দিয়ে ছবি তোলা বৈধ হবে যদি তা প্রয়োজনের খাতিরে হয়। যেমনঃ বিদেশে যাওয়ার জন্য, লেখা-পড়ার জন্য, নাগরিকত্ব সাব্যস্তকরণের জন্য ইত্যাদি।

৬. আর ভিডিও দিয়ে ছবি তোলা বৈধ। কেননা এটি স্থির চিত্র নয়। ভিডিও মানুষের নড়া-চড়া, হাটা-চলা, আওয়াজ সব কিছু ধারণ করতে পারে তাই এটি অবৈধ নয়। তবে ভিডিও যেন অবৈধ কাজে ব্যবহৃত না হয় যেমনঃ পর্নোগ্রাফি, অশ্লীল সিনেমা, অপরাধমূলক কর্মকান্ডের চিত্র ইত্যাদি। তাহলে তা অবৈধ হবে। আল্লাহ বলেনঃ

(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)

"যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।(আল কুরআন, সূরা আন-নূরঃ ১৯-২০।)

উপসংহারঃ

উপরোক্ত আলোচনার মধ্যে যে ফলাফল ফুটে উঠেছে তা হচ্ছে-

১. চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য এ দুটির মধ্যে আ'ম খাছ বিদ্যমান। প্রত্যেক ভাস্কর্য চিত্রের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু চিত্র ভাস্কর্যের অর্ন্তভুক্ত নয়। ভাস্কর্য হচ্ছে- কোন মানুষ কিংবা প্রাণীর চিত্র কোন পাথর, কাঠ, ধাতু, সুতা, প্লাস্টিক ইত্যাদির মাধ্যমে নির্মিত চিত্র।

২. মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম ভাস্কর্য নির্মাণের ঘটনা ঘটে হযরত নূহ (আ.) এর জাতির মধ্যে যে সম্পর্কে সূরা নূহ এ আলোকপাত করা হয়েছে।

৩. কুরআন ও হাদীসের ব্যাপক দলীলের মাধ্যমে কোন পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে প্রয়োজনের খাতিরে যেমনঃ শিক্ষা উপকরণ কিংবা অন্য যে কোন প্রয়োজনীয় কাজে তা ব্যবহার করা যাবে। প্রাণ নেই এমন বস্তুরও চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ করা যাবে। যেমনঃ গাছ-পালা, নদী-সাগর, পাহাড়-পর্বত, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাতি।

৪. প্রয়োজনীয় কাজে ফটো তোলা যাবে। যেমনঃ নাগরিকত্ব প্রমাণে, বিদেশ গমণে, লেখা-পড়ার কাজে ইত্যাদি।

৫. শরী'য়ত সম্মত কাজের ভিডিও তোলা বৈধ। অবৈধ কাজের ভিডিও তোলাও অবৈধ, যেমনঃ অশ্লীল সিনেমা, পর্নোগ্রাফি, হত্যা-সন্ত্রাসের উস্কানিমূলক ভিডিও ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র

১ ফাইরোজ আবাদী, আল কামুসুল মুহীত, (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাস আল আ'রাবি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯১ইং) মূল অক্ষর- صور ।

২ ড. কিলআ'জি, মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা, (করাচী, ইদারাতুল কুরআন) খন্ড. ১, পৃ.১৩৩ ।

৩ Dr. Ruhi Baalabaki, ***AL-MAWRID A Modern Arabic English Dictionary*** (Beirut: Dar EL-ELM LILMALAYIN, Sixteenth Edition, 2002) Page. 325

৪ ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০২) পৃ. ৯২৯

৫ Microsoft Student with Encarta Premium 2007 (© 1993-2006 Microsoft Corporation), www. microsoft.com

৬ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী] (ঢাকাঃ রিয়াদ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫ইং) পৃ. ২৬৬

৭ মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (র.), *তাফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন*, অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (সউদী আরবঃ খাদেমুল-হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প) পৃ. ১৪০৮; উক্ত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) যে বক্তব্য পেশ করেছেন, তা হলঃ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صَارَتْ الْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ أَمَّا وَدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْلٍ وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَإٍ وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لِآلِ ذِي الْكَلَاعِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ (صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب تفسير ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق، رقم الحديث: ٤٥٣٩)

৮ আয়াতটি হচ্ছে- وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

৯ ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আ'জিম*, সম্পাদনাঃ সামী বিন মুহাম্মদ সালামাহ, (দারু তাইয়্যেবাহলিন নাশরি ওয়াত তাওযি', ১৯৯৯ইং) ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২৫৭

১০ সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুস সালাত, হাদীস নংঃ ৪০৯ ।

১১ ইবনে হাজার, ফাতহুল বারী, (www.al-islam.com) ২য় খন্ড, পৃ. ১৪৮ ।

১২ *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল বুয়ু', হাদীস নংঃ ২০৭৩ ।

১৩ *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুস লিবাস, বাবু আযাবিল মুসাব্যিরিনা ইয়াওমাল কিয়ামাহ, হাদীস নংঃ ৫৪৯৭; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল লিবাস ওয়ায যিনাহ, বাবু তাহরীমি তাসবিরি সুরাতিল হাইওয়ান ওয়া তাহরীমি ইত্তিখাযিহী, হাদীস নংঃ ৩৯৪৩, ৩৯৪৪; *সুনান আন-নাসাঈ*, কিতাবুস যিনাহ, হাদীস নংঃ ৫২৬৯ ।

১৪ *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুস লিবাস, বাবু আযাবিল মুসাব্যিরিনা ইয়াওমাল কিয়ামাহ হাদীস নংঃ ৫৪৯৫ ।

১৫ *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুস লিবাস, বাবু নাকদিস সুয়ার, হাদীস নংঃ ৫৪৯৪; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল লিবাস ওয়ায যিনাহ, বাবু তাহরীমি তাসবিরি সুরাতিল হাইওয়ান ওয়া তাহরীমি ইত্তিখাযিহী, হাদীস নংঃ ৩৯৪৭ ।

১৬ ইমাম নাববী, *শারহে মুসলিম*, বাবু তাহরীমি সুরাতিন, (http://www.al-islam.com) খন্ডঃ ৭, পৃ. ২২২ ।

১৭ *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল বুয়ু', হাদীস নংঃ ১৯৪৪ ।

১৮ *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল মাজালিম ওয়াল গাসব, হাদীস নংঃ ২২৯৮ ।

১৯ আল কুরআন, সূরা আল ইসরাঃ ৮১ ।

২০ *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস নংঃ ১৬০৯ ।

২১ *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবু বাদইল খালক, বাবু যিকরিল মালাইকাহ, হাদীস নংঃ ২৯৮৬ ।

২২ *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল বুয়ু', হাদীস নংঃ ১৯৬৩ ।

২৩ দেখুন, তথ্যসূত্র-৫ ।

২৪ শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনজিদ, www. الإسلام سؤال وجواب

২৫ *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল বুয়ু', হাদীস নংঃ ২০৭৩ ।

২৬ *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদাব, বাবুল ইনবিসাত ইলান নাস, হাদীস নংঃ ৫৬৬৫ ।

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 151-153)

নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন ঃ প্রসঙ্গ ইসলাম

মেরী চৌধুরী*

নারীর অধিকার, নারী স্বাধীনতা ও নারীর ক্ষমতায়ন বর্তমান সময়ের একটি বার্নিং ইস্যু। পাশ্চাত্য সমাজে নারী অধিকারের আন্দোলন আজ নারীবাদী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী আজ নারীর অধিকার আর ক্ষমতায়নের শ্লোগান উঠেছে। অথচ ইসলামই প্রথম নারী অধিকারের ব্যাপারে কথা বলেছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও তার স্বাধীনতা রক্ষায় রেখেছে কার্যকরী ভূমিকা। কুরআনে বলা হয়েছে, গোটা মানবজাতির বিস্তৃতিতে উৎস হিসেবে কাজ করেছে একজন পুরুষ ও একজন নারী। আর নর-নারী মিলেই মানবগোষ্ঠী। নারী ছাড়া বিশ্বকে কল্পনা করা যায় না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন- "হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন নর ও একজন নারীর থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার।" (সূরা হুজুরাত : ১৩)

যে নর ও নারী দিয়ে মানবজাতির শুভ সূচনা, সে নর-নারী আজ সারাবিশ্বে সরব পদচারণা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং ক্ষমতায়নের কথা আনলে শুধু পুরুষকে বুঝায় না। সে সাথে নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন সমভাবে অনুমিত।

আধুনিক সভ্যতার কথা বলে আজকের পাশ্চাত্য সমাজ নারীর ক্ষমতায়নের নামে নারীকে ভোগ লালসার সামগ্রীতে পরিণত করেছে। মুসলিম সমাজেও আজ তার ঢেউ লেগেছে। শত শত বছরের ঔপনিবেশিক শাসন ও শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবে মুসলিম নারীরাও পাশ্চাত্য নারীর কায়দায় সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন ছিঁড়ে বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য চেষ্টারত। তারা ইসলামের শিক্ষা বেমালুম ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্যের প্রচার-প্রপাগান্ডায় কুরআন-সুন্নাহ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তারা জানতেও চেষ্টা করে না যে, ইসলামে নারীর স্বকীয় অধিকার নজিরবিহীন স্বীকৃত। মানুষ হিসেবে তার মৌলিক অধিকার আল কুরআনে পুরোপুরী প্রতিষ্ঠিত। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়-আমাদের মুসলিম সমাজে ও নারীরা আজো একটি বৈষম্যপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। কুরআন ও হাদীসে নারীকে যে অধিকার ও ক্ষমতায়ন দেয়া হয়েছে তা অহরহ লঙ্ঘিত হচ্ছে। অথচ আল কুরআনে ১১৪টি সূরার মাঝে নারীদের বিষয়ে আলাদা একটি সূরা নাজিল করা হয়েছে। এই সূরার প্রথম আয়াতেই নারী পুরুষের মৌলিক সহমর্মিতা ও সমমর্যাদার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে- "হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের একটি মাত্র আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর তার থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার সহধর্মিনীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য নর ও নারী। (সূরা: আন নিসা-১)

আল কুরআনের এ ঘোষণা অনুযায়ী নারী ও পুরুষ উভয়েই একই নিয়তির অংশীদার। তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। সুতরাং ইসলাম নারীর অধিকার, মর্যাদা আর ক্ষমতায়নকে সুনিশ্চিত করেছে। তাদের ভিন্ন দৈহিক কাঠামো ও গঠন প্রকৃতিকে কখনো ইসলাম তাদের মাঝে বৈষম্য সৃষ্টির দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেনি। প্রত্যেকেই তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠ। কুরআনের সূরা ত্বীনে বলা হয়েছে- "নিশ্চয় আমি মানুষকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।" এখানে নারী ও পুরুষকে আলাদা করা হয়নি। উভয়কেই সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। আসল কথা হচ্ছে কি, মানব জীবনের মহান উদ্দেশ্য সাধনে নিমিত্তে পুরুষ থেকে নারীকে ভিন্ন আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। আকৃতির এ ভিন্নতা না থাকলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসার ব্যাপারে ঘাটতি দেখা দিত। প্রকৃতিগতভাবে নারীর দৈহিক কাঠামোর ভিন্নতা কিছুতেই অধীনস্থতা তৈরীর মাপকাঠি কিংবা ক্ষমতায়নের অন্তরায় হতে পারে না। মা হিসেবে তার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করা হয়েছে। রাসূল (সঃ) বলেছেন- "আল্লাহ ও নবীর পরে সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করতে হবে মাকে।" কুরআনে বলা হয়েছে-" আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে।" (সূরা: লোকমান-১৪)

---

* ৫ম সেমিস্টার, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

একজন মা তথা একজন নারীকে সম্মান প্রদর্শন আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। এটি ক্ষমতায়নের একটি দিক। কেননা ক্ষমতাধর কর্তৃপক্ষকে বাধ্যতামূলক শ্রদ্ধা করতেই হয়। মানুষ খলিফা বা আল্লাহর প্রতিনিধি। খলিফার মর্যাদার মধ্যে রয়েছে সকল ক্ষমতায়ন। কুরআনের ঘোষণা- "আর প্রভু যখন ফেরেশতাদের ডেকে বললেন, নিশ্চয় পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করব।" এখানে পুরুষকে পৃথক করে বলা হয়নি। অতএব, নর-নারী উভয়েই খেলাফতের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। এ দায়িত্ব পালন করতে গেলে প্রত্যেক নারী ও পুরুষের কিছু ক্ষমতা লাগবে। নারীর ক্ষমতায়নের ভিত্তি এই খেলাফতের মধ্যে। তাই নারীর রয়েছে সামাজিক, রাজনৈতিক ও কর্মক্ষেত্রে পেশা গ্রহণের অধিকার। ইসলামী আইনে কোন মানুষকে কেবল অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা উন্মাদ হওয়া ব্যতীত আর কোন কারণে স্বাভাবিক কাজকর্ম কিংবা তার অধিকার পালনে অযোগ্য ঘোষণা করে না। অথচ পাশ্চাত্য আইনের ভিত্তি বলে পরিচিত রোমান আইন এবং ফরাসি আইনে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত যাবতীয় সামাজিক অধিকার থেকে উন্মাদ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও নারী এই তিন ধরনের মানুষকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল।

কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণের উদাহরণ ভূরি ভূরি। কুরআনে স্পষ্টভাবে বৃদ্ধের দুই মেয়ের সম্পর্কে বলা হয়েছে। তারা মেষ পালন এবং তাদের পানি পান করাতেন। তারা হযরত মূসা (আঃ) এর সঙ্গে কথাও বলেছেন এবং মূসা (আঃ) কে সাথে নিয়ে তাদের পিত্রালয়ে গিয়েছেন।

মহিলাদের চাকরি কিংবা বাইরের কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ থাকলেও কোন মেয়ে যদি তার স্বাধীন সিদ্ধান্তে ঘরে থাকতে চায় তার সে অধিকার রয়েছে। মা ও স্ত্রী হিসেবে তার পারিবারিক দায়িত্ব পালনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, চাকুরীটা কোনক্রমেই এমন হতে পারবে না। তাছাড়া চাকুরীরত মহিলা একই কক্ষে একাধিক পুরুষ সহকর্মীদের সাথে কাজ করতে পারবে না। কেননা ভিন্ন পুরুষের সাথে নিভৃতে সাক্ষাৎ শরীয়তে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

বৃহত্তর প্রয়োজন ছাড়া কিংবা জীবন-জীবিকার তাগিদ না থাকলে বাইরের কাজ থেকে ঘরের কাজেই নারীর জন্য অধিকতর কল্যাণকর। পর্দা নারীর ক্ষমতায়নের অন্তরায় বলে বিরুদ্ধবাদীরা বলে থাকে। পরিবার ও সমাজ জীবনে নারীর ভারসাম্যপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠা এবং নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য পর্দাব্যবস্থা। পর্দার মাধ্যমে একজন মহিলা তার দেহকে পর পুরুষের কুদৃষ্টি থেকে হেফাজত করবে। নিজ গৃহে পর্দা করতে হচ্ছে না। পর্দা হচ্ছে মুসলিম মহিলাদের বাইরের কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের জন্য ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী হওয়ার জন্য নয়। তাই পর্দা নারীর ক্ষমতায়নের অন্তরায় নয়, ক্ষমতায়নের মাধ্যম। ইসলাম পুরুষ ও নারীর জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা উপলব্দি ও শিক্ষা দানের স্বীকৃতি দিয়েছে। রাসূল (সঃ) বলেন- "জ্ঞান অর্জন পুরুষ ও নারী প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য।" এবং "দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর।"

ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম বিখ্যাত নারী হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রধানত যে কারণে স্মরণীয় তা হচ্ছে তার মেধা, জ্ঞান ও বিশিষ্ট স্মৃতিশক্তি। সাধারণ ভাবে প্রারম্ভিক মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্বে নারীর শিক্ষালাভের ওপর বাধা-নিষেধ ছিল না। যে কোন ক্ষেত্রে শিক্ষালাভের অধিকার মহিলার রয়েছে। ইসলাম একে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ইসলাম নারীর রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করেছে। আমরা উল্লেখ করেছি বৃদ্ধের দুই মেয়ে ও হযরত মুসা (আঃ) এর কথা সে মেয়েদের একজন তো তাদের পিতাকে স্পষ্টভাবে ও দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন- "হে পিতা তাকে কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করুন। কেননা, কর্মঠ ও সৎ লোককেই কাজে নিয়োগ করা ভাল।"

সে মেয়ের এ কথা ও পরামর্শ পিতা রেখেছিলেন। এখান থেকেই স্পষ্ট হয় মেয়েরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। জাতীয় সংসদে আলোচনা-সমালোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মেয়েরা আলোচনা-সমালোচনায় অংশগ্রহণের অধিকার রাখে বিধায় সংসদের প্রতিনিধিত্বশীল বিষয়েও মেয়েরা ক্ষমতাসম্পন্ন। মহানবী (সাঃ) রাজনৈতিক জীবনের যে কোন জটিল মুহূর্তে তার সহধর্মিনীদের পরামর্শ নিতেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মুহূর্তে তিনি সহধর্মিণী উম্মে সালমার পরামর্শে কুরবানী করে মাথা মুন্ডন করেন। খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও মহিলারা তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। একজন মহিলা মোহরানা প্রসঙ্গে হযরত ওমরের (রাঃ) বিরোধিতা করেন এবং হযরত ওমর (রাঃ) রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে সেই মহিলার ভূমিকাকে সম্মান দেখিয়েছেন। হযরত উসমান (রাঃ) এর সময় হযরত আয়েশা (রাঃ) সরকারের কঠোর সমালোচনা করতেন। এভাবে নারী রাজনৈতিক আসরেও ক্ষমতাবান।

রাসূল (সঃ) বায়আত গ্রহণে নারীদেরও সামিল করেছেন। এটা নারীর রাজনৈতিক অধিকারের দিক। যার পরিবর্তিত রূপ আজকের ভোট অধিকার। যুদ্ধক্ষেত্রে সাহাবীদের স্ত্রীদের উপস্থিতি ও সেখানে আহতদের সেবা শুশ্রুষা এবং পিপাসার্তদের পানি পান করানোর কথা আমরা ইতিহাসে পাই। বিখ্যাত উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত আয়েশা (রাঃ) অংশ গ্রহণ করে পর্দার অন্তরাল থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। এসব তথ্য নারীর রাজনৈতিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

ইসলামে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন থাকলেও ইতিহাসের কোনো যুগেই মুসলিম নারীর রাজনৈতিক তৎপরতা তেমন একটা না থাকার কারণ কি? অথচ তাকে এ অধিকার দেয়া হয়েছে। সে ইচ্ছে করলে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারত। কিন্তু সে বুঝেছে যে, জীবনে তার প্রথম কর্তব্য হলো উপযুক্ত মা ও গৃহিণী হওয়া। মুসলিম নারীরা এই অবস্থানে আজকের সুইজারল্যান্ডের নারীর পথে তুলনীয়। সুইস নারীর রাজনৈতিক অধিকার থাকা সত্ত্বেও সে তা প্রয়োগ করে না এবং করতে চায় না। কেননা, রাজনীতির ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ময়দানে যাওয়ার চেয়ে পরিবার ও ঘরোয়া জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকাই ভালো।

পরিশেষে বলতে চাই- একমাত্র ইসলামই নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন দিয়েছে। মানব সভ্যতার অতীত ইতিহাস কিংবা অন্য কোন ধর্মে নারীকে দেয়া হয়নি সামান্যতমও মর্যাদা। অন্যান্য সভ্যতায় নারীরা মা রূপে সন্তানকে দুগ্ধ পান করিয়াছেন, অর্ধসঙ্গিনী সেজে নর জীবনের উত্থান পতনের পাশে দাঁড়িয়েছেন বটে; কিন্তু সমাজ নারীকে কেবল সেবিকা ও দাসীর মর্যাদা দিয়েছে। সেখানে ইসলামই নারীকে মর্যাদা দিয়েছে। পুরুষের পাশাপাশি নারীর স্থান ঘোষণা করা হয়েছে। নারীর অধিকার আর ক্ষমতায়নে ইসলামের কোন বিকল্প নেই। ভূল বুঝাবুঝি ও গোঁড়ামি অপনোদনে চাই ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ন।

তথ্যসুত্র

১. আল কুরআন
২. তাফহীমুল কোরআন,
৩. রিয়াদুস সালেহীন,
৪. ছাত্রসংবাদ,
৫. পৃথিবী- মাসিক পত্রিকা,
৬. মদিনা- মাসিক পত্রিকা,
৭. ইসলামের দৃষ্টিতে নারী- ফরিদ আখেন্দী।

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 154-159)

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আধুনিক নারী ও ইসলাম

উম্মে কুলসুম*

নারী সভ্যতার সুতিকাগার, পৃথিবীর মূল উপাদান ও পরিবারের প্রধান কারিগর। যুগে যুগে এই নারীই পরম মমতাময়ী মা, স্নেহের বোন, আদরের কন্যা, জীবনের অর্ধাংশ, নির্ভরশীলতার অনুপম আধার স্ত্রী। নারী শুধু পৃথিবী টিকে থাকার অনিবার্য একক নয়। এই পৃথিবীর স্থিতিশীলতা আর কল্যাণকর রূপায়নের মূল চালিকা শক্তি। তাই পৃথিবীর জন্য নারী জাতিকে বাদ দিয়ে যে পরিকল্পনা রচিত হবে তা অনিবার্যভাবে অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ হবে। নারীকে বাদ দিয়ে কেবল পুরুষের গঠিত কোন মানব সমাজ চিন্তাও করা যায় না।[১] পৃথিবীর চলমান গতিধারার দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, বর্তমান নারী সমাজের করুণ পরিস্থিতি, অথচ ইসলাম নারী সমাজকে তাদের স্ব স্ব অধিকার দিয়েছে যেমনিভাবে দিয়েছে পুরুষজাতিকে দিয়েছে। কিন্তু আজকাল নারী সমাজ সমাধিকারের শ্লোগান নিয়ে চলতে গিয়ে পশ্চাদপদতার স্বাক্ষর রাখছে দিন দিন। আত্মনির্ভরশীলতার পরিবর্তে পাশ্চাত্যের তথাকথিত আধুনিকতার অন্ধ অনুসরনকে বেছে নিয়েছে। এ দুরাবস্থা নিরসনে পাশ্চাত্যের আধুনিকতা ও ইসলামী আধুনিকতা তুলনামূলক আলোচনা–একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে।

বর্তমান প্রেক্ষাপট ঃ

আজ আধুনিকতার শ্লোগানে উজ্জীবিত এ বিশ্ব। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে স্ব স্ব যোগ্যতা নিয়ে কর্মে আত্ম নিয়োগ করে আছে মানবজাতি। তাদের স্বপ্ন সুন্দর সোনালী এক কাঙ্খিত বিশ্ব নির্মাণ। মানবতার সাম্যের জয়গানে নারী ও পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আরোহণ করতে চাচ্ছে সফলতার স্বর্ণ সোপানে। কিন্তু হাজারো প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নারী সমাজ এখনো অবহেলিত, চোখ ধাঁধানো এক ভোগ্য পণ্য মাত্র। তবুও হতভাগা নারী জাতি বার বার সম্মুখীন হচ্ছে নিত্য নতুন বঞ্চনার। আর তাই আজ নিরূপায় কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে মা, স্ত্রী, কন্যা ও ভগ্নি হিসেবে আমরা কি পেয়েছি ???

ইতিহাসের আয়নায় একবার চোখ রাখলে আমরা দেখতে পাব, যুগে যুগে বিভিন্ন সভ্যতা নারীকে করেছে নির্যাতিত, নিপীড়িত, শোষিত ও বঞ্চিত। নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত নারী মুক্তি চেয়েছে, অধিকার চেয়েছে, চেয়েছে স্বাধীনতার প্রদীপ্ত সূর্যের পানে চেয়ে নির্মল হাসি হাসতে, মুক্ত বিহঙ্গ হয়ে উড়তে চেয়েছে জীবন আকাশে। অন্ধের মত হাতড়িয়ে ফিরেছে স্বীয় মর্যাদা আর সম্ভ্রমের সোপান। তাদের এ আকাঙ্খাকে কাজে লাগিয়েছে সুবিধাবাদী চাটুকদার বিশেষ এক শ্রেণী। অধিকার প্রদানের নাম দিয়ে নারীকে মাধ্যম বানিয়ে লুফে নিয়েছে নিজের মুনাফা, পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বাধীনতা কিনতে চেয়েছিল যে অর্ধাঙ্গীনীরা, কায়িক শ্রমের ক্ষেত্রগুলোতেও হারিয়েছে তাদের ন্যায্য অধিকার, বঞ্চিত হয়েছে প্রতিটি পদক্ষেপে।

মানব সভ্যতায় নারীর অবস্থানঃ একটি পর্যালোচনা ঃ

প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত নারীদের ব্যাপারে ইতিহাসে বহুবিধ দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০-৬০০ অব্দে, গ্রীক সমাজে নারীদেরকে শয়তানের প্রতিমূর্তি মনে করা হতো। আইনগতভাবে নারীরা সংসারের অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির মত, উত্তরাধিকার বলতে কিছু ছিল না। সারাজীবন পুরুষের দাসী বাদীর মত জীবন কাটাত। পুরুষদের অনুমতি ব্যতীত নিজের সম্পত্তি ভোগ বা হস্তান্তর করতে পারত না। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের ভাষায় "নারী হলো জগতের বিশৃংখলা ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ট উৎস।"

৫০০ খ্রীষ্টাব্দে মাকোন একাডেমী এ বিষয়ে গবেষণা চালায় যে, নারী আত্মাহীন দেহ, নাকি তার আত্মাও আছে। গবেষণা শেষে একাডেমী এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় একমাত্র মসীহের মাতা ব্যতীত আর কোন নারীই দোযখ

---

* ৬ষ্ঠ সেমিস্টার, দা'ওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

থেকে মুক্তির নিশ্চয়তা প্রাপ্ত আত্মার অধিকারী নয়। ৫৮৭ খ্রীঃ ফ্রান্সে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল নারীকে কি মানুষ বলে বিবেচনা করা হবে নাকি অমানুষ বলা হবে। সম্মেলনে স্থির হয়, নারী মানুষ তবে তার সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষের সেবা করা। ৬১০ সালের পূর্ব পর্যন্ত আরবের মেয়েদের ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘটনাকে অশুভ বলে বিবেচনা কর হত। ১৮০৫ সালে ব্রিটিশ আইনে স্ত্রীদেরকে বিক্রি করার অধিকার থাকত স্বামীদের হাতে। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সে নারী, শিশু ও পাগল এ তিন শ্রেণীর মানুষ অধিকার ও দায়িত্বহীনভাবে বিবেচিত ছিল। চীন সভ্যতায় নারীকে "Waters of the woe" বা দুঃখের প্রস্রবন বলা হত। ভারতীয় হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এছাড়া দেব-দেবীর সন্তুষ্ঠির জন্য কৃষি ও ভাল ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে নারীদেরকে বলি দেয়া হত।[২]

নারী মুক্তি আন্দোলন ঃ

শিল্প বিপ্লব নারীর স্বাধীনতা সংগ্রামকে তথাকথিত সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিল। ইতিপূর্বে সে ঘরে বিদ্রোহ করতে চাইলেও জানতো না ঘরের বাইরে গিয়ে সে কি করবে? কোন ধরনের জীবন বেছে নিবে? এ বিপ্লব তার সামনে বাইরের এমন একটি চিত্র পেশ করল যা পারিবারিক জীবনের তুলনায় অধিক মোহময়। এ নতুন অবস্থায় সে মা, বাবা ও স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিল। এ পর্যায়ে সাম্যের অর্থ করা হলো কেবল মানবিক অধিকার ও নৈতিক মর্যাদার ক্ষেত্রেই নয় বরং সামাজিক জীবনে পুরুষ যা করবে নারীও তাই করবে। ফলে প্রকৃতিগতভাবে যে সব কর্মের উপর সভ্যতা ও মানব জাতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে সেসব দৈনন্দিন কাজের প্রতি নারী উদাসীন ও বিদ্রোহী হয়ে উঠল। দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব, সন্তান লালন পালন, গৃহ পরিচালনা, পারিবারিক সেবা শুশ্রুষা আর তার কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত রইলো না। বরং স্বাধীন ব্যবসা ও শিল্প কারখানায় পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতা, অফিস আদালত ও কলকারখানায় চাকুরী লাভ, নির্বাচনী অভিযানে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা, খেলাধুলা, ক্লাব, রঙ্গমঞ্চ, নৃত্য ও গীত ইত্যাদি চিত্তবিনোদন কাজে অংশ গ্রহণ তার কর্তব্য কর্মের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ল।[৩]

ইউরোপের এই নারী মুক্তি আন্দোলনই আজ পূর্ণাঙ্গ নারীবাদে পরিণত হয়েছে। গড়ে উঠেছে অনেক নারীবাদী সংগঠন। এ নারীবাদী আন্দোলনের মূলতত্ত্বগুলো হচ্ছেঃ

১. নারীর বর্তমান দূর্বল প্রকৃতি অব্যাহত ও দীর্ঘকালীন পুরুষ শোষণের ফল। আপন মেধা ও প্রতিভা চর্চার সুযোগ দেয়া হলে তার স্বরূপ পুরুষের মত হত, এমনকি পুরুষকেও ছাড়িয়ে যেত।

২. সমাজে পুরুষদের প্রাধান্য রয়েছে বলেই নারী উপেক্ষিত, পদদলিত এবং সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত। তাই সমাজে পুরুষদের প্রাধান্য দেয়া এবং এ প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব যে সব কারণও উপায়-উপকরণ দ্বারা লাভ হয়ে থাকে সেগুলো অবশ্যম্ভাবীরূপে নারীকেও অর্জন করতে হবে।

৩. নারী তার স্বভাবগতভাবে কাজ (সন্তান ধারণ ও লালন পালন, গৃহ পরিচালনা ইত্যাদি) করে সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোন কল্যাণ সাধন করছে না বরং পুরুষের কাজই সভ্যতার উন্নয়ন করা।[৪]

আধুনিক নারী প্রগতিবাদের ফলাফল ঃ

অগ্রসরমান বিশ্বে নারী আজ এগিয়ে আছে অনেক দূর। শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, প্রশাসন সকল ক্ষেত্রেই নারী রেখেছে যোগ্যতার স্বাক্ষর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আজ নারী মহাকাশ থেকে সমুদ্র সর্বত্র পরিব্যপ্ত। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক উভয়ক্ষেত্রেই সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের হার ১৫.৪%। অধিকাংশ দেশেই নারী ভোটাধিকার অর্জন করেছে। বিশ্বের আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীর অংশ গ্রহণ ১০ ভাগেরও উপরে। ১৭১টি দেশের মধ্যে ১৬০টি দেশের জাতীয় সংসদে নারীর আসন ২০ ভাগেরও বেশি। এ পর্যন্ত ইতিহাসে ২১ জনেরও বেশী নারী রাষ্ট্রপ্রধানের পদ অলংকৃত করেছে। জাতি সংঘের ৫জন উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপকের মধ্যেও একজন নারী। তথাপি নারীর এই অগ্রযাত্রা সঠিক লক্ষ্যে পরিচালিত না হওয়া, নারী কর্মে সঠিক পরিবেশ না পাওয়ায় পৃথিবী ব্যাপী সমাজ ও নারী জীবন আজ বিপর্যস্ত। বিশেষ করে নারী প্রগতিবাদ আন্দোলনের জন্মদানকারী পাশ্চাত্য বিশ্বের নৈতিক অবক্ষয় জনিত চিত্র আজ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ধর্মীয় বন্ধন ছিন্ন করা ও নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা এই অবক্ষয়কে আরো ত্বরান্বিত করেছে।[৫] ফলশ্রুতিতে–

১. অশ্লীলতার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।

২. অবাধ যৌনাচার স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। এক পুরুষ বহু নারীর সাথে এবং এক নারী বহু পুরুষের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলছে।
৩. সমকামীতা ও দুরারোগ্য ব্যাধি, সিফিলিস, এইডস মহামারী আকার ধারণ করেছে।
৪. বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা, ফ্যাশন শো, বিজ্ঞাপন, মডেলিং ও চিত্র শিল্পে নারীর শারিরীক প্রদর্শনের যথেচ্ছ মহড়া চলছে।
৫. সেক্স ক্লাব এবং পতিতালয়গুলো নারী পুরুষের যৌন উন্মাদনা চরিতার্থের সুযোগ করে দিয়েছে।
৬. বিবাহ সম্পর্কে অনীহা সৃষ্টি হচ্ছে এবং বিবাহ বিচ্ছেদ ও পরিবার ভাঙ্গন আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৭. ভ্রুণ, হত্যা এবং গর্ভপাতের মাধ্যমে মানব বংশ ধারার প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা প্রদর্শন করা হচ্ছে।
৮. স্কুল গুলোতে নিয়মিত যৌন শিক্ষা ও শিশু ভ্রুণ হত্যার প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।
৯. অফিস, আদালত, কল কারখানা ও মাঠে ময়দানে পুরুষের মত কাজ করার বোঝা অর্পিত হয়েছে।
১০. কুমারী মাতৃত্বের কোন হিসাব নেই।
১১. যতক্ষণ নারীর লাবণ্য থাকে ততক্ষণ মূল্যায়ন থাকে, লাবণ্য শেষ হয়ে গেলে অবহেলার শিকার হয়।[৬]

আন্তর্জাতিক সংস্থার রিপোর্ট ঃ

আমেরিকার নৈতিক সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত "Committee Fourteen" এর রিপোর্টে প্রকাশিত হয় যে, সেখানকার নৃত্যশালা, ক্লাব, নৈশ ক্লাব, সৌন্দর্য্য শালা, মেসেজ সেলুন, ম্যান লেয়ার সেলুন ইত্যাদী সকলই প্রায় পতিতালয়, উলংগপনা ও অশ্লীলতার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। আমেরিকায় নারী জনসংখ্যা সম্পর্কে 'kinsey' রিপোর্টে প্রকাশ করা হয় আমেরিকান নারীরা বিয়ের পূর্বে শতকরা ৫০ জনের সতীত্ব নষ্ট করে। ২৫ জনেরও বেশী বিবাহিত অবস্থায় বিভিন্ন পুরুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী। শতকরা ২০ জন সমকামী। যৌন অপরাধ ও অন্যায় প্রবণতা কলেজ ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের মাঝেই বেশী। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, শতকরা ৯০ জন অধিবাসী যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত, সেখানকার হাসপাতালগুলোতে গড়ে ২ লক্ষ সিফিলিস ও ১ লক্ষ ৬০ হাজার প্রমেহ রোগীর চিকিৎসা প্রদান করা হয়। মোট চিকিৎসকের ৬১% যৌন রোগীর চিকিৎসক। (**এনসাইক্লোপেডীয়া ব্রিটেনিকা**- অধ্যায়-২৩, পৃষ্ঠা-৪৫) পাশ্চাত্য ভয়াবহ এইডস ব্যাধি আক্রান্ত রোগীর সঠিক সংখ্যা বিশ্ব প্রকাশ করতে নারাজ।[৭] ফ্রান্সে একবার ৪ মাসের এক শিশুর মৃত্যু হলে মা তার মৃতদেহের পাশে নৃত্যগীতের আসর জমিয়ে বলতে থাকে এখন আমরা ২য় সন্তান জন্ম দেব না। এই সন্তানের মৃত্যুতে আমি এবং আমার স্বামী পরম শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করেছি। চিন্তা করতো, সন্তান কি জিনিস যে সর্বদা ঘ্যান ঘ্যান, ক্রন্দন ও নোংরামী সৃষ্টি করে।[৮] (**Paul Bureo**: Ibid, পৃষ্ঠা-৭৪,৭৫)। পাশ্চাত্য বহিঃবিশ্বে নারী সমাজের এ করুণ পরিস্থিতি সীমাবদ্ধ ছিল না বরং এ পরিস্থিতি বিশ্বের বিভিন্ন দিক দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিল যার কবল থেকে রক্ষা পাইনি আমাদের প্রিয় স্বপ্নের ভূমি বাংলাদেশও।

বাংলাদেশের করুণ পরিস্থিতির একটি তালিকা ঃ

অশ্লীলতার বিষবাষ্পে গুমরে উঠছে আমাদের প্রিয় এ জন্মভূমির চতুর্পাশ। ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত দশ বছরে এদেশে পতিতালয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫ হাজার। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ হেডকোয়ার্টারের দেয়া তথ্য অনুযায়ী ২০০৮ সালের জানুয়ারী-জুন পর্যন্ত নারী নির্যাতন মামলার চিত্র নিম্নরূপ ঃ (দৈনিক প্রথম আলো)

- যৌতুকের জন্য নির্যাতন-১৮৭৩ টি
- নারী অপহরণ-১৪২১ টি
- ধর্ষণের পর মৃত্যু/আহত-২৭ টি
- নারী হত্যা-৩২ টি
- এসিড নিক্ষেপ-৭১ টি
- নারী ধর্ষণ-১৭৪ টি
- নারী পাচার সংখ্যা-৪৯ টি
- অন্যান্যভাবে নারী নির্যাতন-১৫৩১ টি
- তাছাড়াও ভারতে প্রতিদিন নারী পাচার হয়-৫০ জন।

পৃথিবীর এই বিকৃতি ও সভ্যতার ভাঙন রোধে কিছু করণীয়:

- নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ইসলামী ভিত্তির উপর তোলা উঠতে হবে।
- পৃথিবীকে পবিত্র ও কল্যাণময় করতে নারী ও পুরুষ পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, পরস্পরে সহযোগী ও সাহায্যকারী প্রমাণিত করা।

- নারী ও পুরুষ উভয়কেই স্বীয় স্বভাবগত যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন করা।
- অবাধ যৌন স্বাধীনতার পরিবর্তে বৈবাহিক দায়িত্বশীলতার মাধ্যমে নারী পুরুষের জীবনের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা।
- ক্ষেত্র ও কর্মের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও নারী ও পুরুষ উভয়ের কর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন হওয়া। আর তা হচ্ছে পৃথিবীর কল্যাণ।
- নারীর সম্মান ও মর্যাদামন্ডিত ভূমিকাকে সামনে রেখে সমগ্র জাতিকে চিন্তা কর্মে সামগ্রিক বিপ্লব সৃষ্টি করতে উদ্বুদ্ধ করা।
- নারী ও পুরুষের মৌলিক অধিকারে সমতা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে তা নিশ্চিত করা।
- মানব জাতির কল্যাণের উদ্দেশ্য ঠিক রেখে নারী ও পুরুষ উভয়ের স্বীয় যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণের পথ উন্মুক্ত করা।[৯]

নারীর অপরিহার্য ভূমিকা ও করনীয় ঃ

১. **পরিবার গঠন:** মানব সমাজে অতি প্রাচীন কাল থেকে পরিবার প্রথা চলে আসছে। এ পরিবার যতদিন টিকে থাকবে ততদিন পৃথিবীর অস্তিত্বও টিকে থাকবে। পরিবার ভেঙ্গে যাওয়াই পৃথিবীর বিপর্যয়ের মূল কারণ। কুরআনে তাই পরিবারকে দুর্গের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং পরিবারে বসবাসরত সকলকে এ দুর্গে সুরক্ষিত বলা হয়েছে। পরিবার তার সকল সদস্যকে নৈতিকতা বিরোধী পরিবেশ, অসৎ অশ্লীল জীবনের হাতছানি থেকে রক্ষা করতে পারে। এই দুর্গ সুরক্ষায় প্রধান ভূমিকা একজন নারীর।[১০] রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন "তোমরা তোমাদের গৃহে দৃঢ়ভাবে ও স্থিতিশীলভাবে অবস্থান কর। নারী অপরিসীম স্নেহ, মায়া মমতা ও চিন্তাশীলতা দিয়ে তার সন্তান ও অন্যান্য পরিজনের সুন্দর জীবন নিশ্চিত করতে পারে। এজন্য মহান আল্লাহর ঘোষণা-

(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لأيات لقوم يتفكرون)، (سورة الروم: ٢١)

২. **ভবিষ্যত বংশধরের সংরক্ষণ ও গঠন :** ভবিষ্যত বংশধর সংরক্ষণ ও সঠিকভাবে গঠনের ব্যাপারে অপরিহার্য ভূমিকা রাখতে পারে নারীরা। ভবিষ্যত শিশুর জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান করা নারীর প্রধান কর্তব্য।[১১] কুরআনে শিশুর ভ্রূণ হত্যাকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

(ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا)، سورة بني إسرئيل: ٣١)

সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলার জন্য সন্তানদের উত্তম নৈতিক প্রশিক্ষণ দানকে ইসলাম অপরিহার্য ঘোষণা করেছে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন "সুন্দর নৈতিক চরিত্র ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া অপেক্ষা উত্তম আর কিছু পিতামাতা সন্তানকে দিতে পারে না"।

৩. **সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরামর্শ প্রদানে দূরদর্শিতা ও কল্যাণকামীতার পরিচয় ঃ** পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজস্ব মত প্রকাশ ও পরামর্শদানে নারীকে এগিয়ে আসতে হবে এবং এক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে। ইসলামের ইতিহাসে নারীর এই অংশগ্রহণের উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হুদায়বিয়ার সন্ধির সংকটময় পরিস্থিতিতে রাসূল (সাঃ) সাহাবীদেরকে বার বার নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও সবাই যখন চুক্তিকে অপমানজনক মনে করে ইহরাম ভাঙতে রাজি হচ্ছিল না, তখন হযরত উম্মুল মোমেনীন উম্মে সালমা (রাঃ) রাসূল (সঃ) কে পরামর্শ দেন আপনিই প্রথমে মাথা মুন্ডন ও পশু কোরবানী করে দিন, আপনাকে দেখে তারা সবাই করতে বাধ্য হবে। সাহাবীরা সাথে সাথে রাসূল (সাঃ) কে অনুসরণ করলো। মীমাংসা হয়ে গেল এত বড় একটা সমস্যা।

৪. **সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবস্থান ঃ** কৃষিকাজ থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণ লাভের যে কোন পেশা এমনকি সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নারী তার প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনকে সামনে রেখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করতে পারবে।

৫. **শিক্ষা ও সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ ঃ** জ্ঞান অর্জন, শিক্ষা-প্রদান ও সেবামূলক কাজে অংশ গ্রহণ এবং বিভিন্ন জনকল্যাণ মূলক কাজে নারী তার মমতার হাত বাড়িয়ে দিবে। জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষা প্রদানে হযরত আয়েশা (রাঃ) ইসলামের ইতিহাসে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি কুরআন, ইসলামের ফরয সমূহ, হালাল হারাম, কাব্য ও সাহিত্য, আরবদের ইতিহাস ও নসবনামা বিষয়ক জ্ঞানের ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর চাইতে অধিক জ্ঞানীলোক আর দেখি নাই। চিকিৎসা ক্ষেত্রে মুসলিম নারীরা আহতদের চিকিৎসার সেবা দিয়েছেন। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করেও তারা দৃঢ় ভূমিকা রেখেছেন।[১২]

৬. **সামাজিক অসংগতি প্রতিরোধে ভূমিকা পালন ঃ** পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে সামাজিক অনাচার, পারিবারিক অশান্তি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এই যৌনাচার রোধে সামাজিক জনমত তৈরী করতে নারীকে এগিয়ে আসতে হবে। নারীর সম্মান ক্ষুন্ন হয় এমন পেশা এবং পণ্য হিসাবে নারী ব্যবহৃত হয় সেসব পেশায় অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে। পাশাপাশি ইসলামে যৌতুকের অবস্থান নিষিদ্ধ এ ব্যাপারে মুসলিম জনসাধারণকে সচেতন করতে হবে। যারা এসিড, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, অপহরণের মত বিকৃত রুচির পরিচয় দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরীর ব্যাপারে জোর আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

৭. **সত্য প্রচার ও প্রসারে আত্ম নিয়োগ ঃ** ন্যায় কাজের আদেশ দান অন্যায় কাজের বাধা দানের দায়িত্ব শুধু পুরুষের নয় এ কাজে নারীরও রয়েছে সমান দায়িত্ব। কুরআনের বাণী -

(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلواة ويؤتون الزكواة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم)، (سورة التوبة: ٧١)

যথার্থ ভূমিকা পালনে ইসলাম প্রদত্ত নারীর অধিকার ঃ নারীর শাশ্বত অধিকার নির্ধারণে ইসলাম ৩টি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে।

১. নিছক শৃংখলা বজায় রাখার জন্য পুরুষের যে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, এ সুযোগ গ্রহণ করে যেন পুরুষ নারীর উপর অন্যায় আচরণ করতে না পারে।

২. নারীকে এমন সুবিধা দান করতে হবে যাতে সে তার স্বাভাবিক প্রতিভা বিকাশ ঘটাতে পারে এবং সভ্যতা গঠনে সর্বোচ্চ স্থানে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

৩. নারীর উন্নতি ও সাফল্যের চরম শিখরে আরোহন করা যেন সম্ভব হয়, তবে তা নারী হিসেবে হবে, পুরুষ হিসেবে নয়। এই বিষয়গুলোর প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রেখে ইসলাম নারীকে যে ব্যাপক তামদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক অধিকার দিয়েছে তার উদাহরণ পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক কোন সমাজ ব্যবস্থায় খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।[১৩] তাই নিম্নে নারীদের কতিপয় অধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:-

১) অর্থনৈতিক অধিকার ঃ সমাজে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং সে মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার জন্য সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তার অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা। ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য সকল আইন কানুন নারীকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল করে রেখেছে। এই আর্থিক দুর্গতি সমাজে তার দাসত্বের মূল কারণ। পাশ্চাত্য এই অবস্থার অবসানের জন্য নারীকে উপার্জনশীন বানালো। যা আরেকটি বিরাট অমঙ্গল ডেকে আনলো। ইসলাম এই দুই অবস্থার মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করেছে।

- নারীদেরকে উত্তরাধিকারের মত বিরাট অধিকার দান করা হয়েছে। সে পিতা, স্বামী, সন্তান, এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন থেকে উত্তরাধিকার লাভ করতে পারবে।[১৪] কুরআনের বাণী-

(للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) (سورة النساء: ٧)

- স্বামীর নিকট হতে মোহর লাভ ঃ আল্লাহর বাণী-

(وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا)، (سورة النساء: ٤)

- এসকল উপায়ে অর্জিত সম্পত্তিতে তার পূর্ণ মালিকানা ও স্বত্ব কায়েম হয় এবং তা ব্যয় করার কোন অধিকার তার পিতা, স্বামী বা অন্য কারো নেই।
- নিজে সম্পদশালী হওয়ার পরও ভরণ পোষণের ব্যয়ভার স্বামীকে বহন করতে হবে। এ দায়িত্ব হতে স্বামী আদৌ মুক্ত হওয়ার নয়।

২) তামাদ্দুনিক অধিকার ঃ

ক) স্বামী নির্বাচনের পূর্ণ অধিকার নারীকে দেয়া হয়েছে। তাই ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোথাও তাকে বিয়ে দেয়া যাবে না।
খ) একজন অমনোপূত, অত্যাচারী, অথবা অকর্মণ্য স্বামী হতে বিবাহ বিচ্ছেদের পূর্ণ অধিকার নারীকে দেয়া হয়েছে।
গ) একজন নারী তার স্বামী ও পরিবার পরিজনের কাছ থেকে সদাচরণ এবং দয়াদ্র পাওয়ার অধিকার রাখে।[১৫] কুরআনের বাণী- "নারীর সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে দয়ার্দ্র ও স্নেহশীল করতে ভুলো না। (সুরাঃ নিসা- ১৯)
ঘ) ইসলাম শুধু নৈতিক উপদেশ দিয়েই ক্ষ্যান্ত হননি। যদি স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর উপর অধিকার প্রয়োগে অন্যায় অত্যাচার করা হয়, তাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বন করার অধিকার স্ত্রীকে দিয়েছে।
ঙ) বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা নারীর দ্বিতীয় বিবাহ করার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে ইসলাম।

৩. নারী শিক্ষা ঃ দ্বীনি ও পার্থিব সকল ধরনের শিক্ষা লাভ করার জন্য নারীকে শুধু অনুমতিই দেয়া হয়নি পুরুষের মত নারী শিক্ষা দীক্ষাকে অতীব প্রয়োজন মনে করা হয়েছে। রাসূল (সঃ) এর কাছ থেকে পুরুষরা যেমন দ্বীনি ও নৈতিক শিক্ষা লাভ করত, তেমনি নারীরাও লাভ করতো। নবী করিম (সঃ) এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাঃ) শুধু মহিলা সাহাবীদের শিক্ষক ছিলেন না বরং তিনি পুরুষ সাহাবীদের শিক্ষিকাও ছিলেন, তিনি তাদেরকে হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন।

হযরত হামজা (রাঃ) এর শাহাদাত প্রাপ্তির পর তাঁর কন্যার লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহনের জন্য হযরত আলী (রাঃ) দাবী করলেন, বললেন- এ আমরা চাচাতো বোন, এর লালন পালনের অধিকার আমার আছে। হযরত জাফর (রাঃ) বললেন আমি আলীর চাইতেও বেশী হকদার। কেননা এই আমার চাচাতো বোন নয় এর খালা আমার ঘরেই রয়েছে। অন্য দিকে হযরত জায়েদ (রাঃ) বলেন, হযরত হামজা (রাঃ) ছিলেন রাসূলের পাতিয়ে দেয়া আমার ভাই, আর এ সূত্রেই আমি চাচা হিসেবে এ মেয়ের লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণে আমি সর্বাধিক অধিকারী। চিন্তা ও কর্মে নারীর প্রতি দায়িত্ব পালনের এ দৃষ্টান্ত ইসলাম ছাড়া অন্য কোন সভ্যতায় পাওয়া সম্ভব নয়।

নারীকে আজ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে নারীর সামগ্রিক কল্যাণ ও পৃথিবীর স্বাভাবিকতা নিশ্চিত করতে ইসলাম প্রদত্ত প্রকৃত মর্যদা অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে। পালন করতে হবে ইসলাম প্রদত্ত দায়িত্ব। আর আমরা যারা মুসলমান তাদের জন্য ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধানের চেয়ে অন্য কিছুকে অধিকতর কল্যাণ মনে করা নির্বুদ্ধিতার শামিল।

মহান আল্লাহ্ বলেন- (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون)، (المائدة: ٥٠)

তথ্যসূত্র:

১ মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, নারী, প্রকাশকাল মে-২০০৮ ইং, পৃষ্ঠা : ৯
২ ড. মুস্তফা আস সিবায়ী, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, চতুর্থ প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ০৭, পৃ: ১৫
৩ সেমিনার স্মারক, পৃ: ১১
৪ প্রাগুক্ত, পৃ: ১২, ১৩।
৫ আব্দুল খালেক, নারী, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ ইং, পৃ: ৭৯
৬ প্রাগুক্ত, পৃ.: ৯৫।
৭ সেমিনার স্মারক, প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০০৬, পৃ.: ১৩
৮ আব্দুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ.: ৮০।
৯ সেমিনার স্মারক, পৃ.: ১৪।
১০ মাওলানা আব্দুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, ১৯তম সংস্করণ, প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০০৮ ইং, পৃ.:২৬
১১ প্রাগুক্ত, পৃ.: ২৬
১২ সেমিনার স্মারক, প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০০৬ ইং, পৃ.: ১৬
১৩ সেমিনার স্মারক, প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০০৬ ইং পৃ.: ১৭
১৪ নঈম সিদ্দিকী, ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে নারীর কাজ, প্রকাশকাল অক্টোবর ২০০০ ইং, পৃ. ৫৯।
১৫ প্রাগুক্ত, পৃ.: ৬১।

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 160-163)

মৃত ব্যক্তি কেন্দ্রিক কুসংস্কার: প্রেক্ষিত চট্টগ্রাম

মোহাম্মদ বেলাল*

ভূমিকা:

সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উপর যার পরে আর কোন নবী নেই। মানুষ মরণশীল। চির সত্য এই বাক্যটি মানুষের জানা থাকা সত্ত্বেও মানুষ মৃত্যুকে স্মরণ রাখে না। আল্লাহ বলেনঃ

(أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ)

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই এমনকি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরে অবস্থান করলেও । (সুরা আন্ নিসা, আয়াত-৭৮)

মৃত্যু থেকে শুরু করে মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করা পর্যন্ত শরীয়তের যে সমস্ত বিধি বিধান রয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হল জানাযার নামায আদায় করা। জানাযার নামাজ আদায় করা ফরযে কেফায়া। কিন্তু এই ফরয কাজটি আদায় করার পূর্বে ও পরে এমন কিছু কাজ করা হয় যা শরীয়তের বিধি-বিধানে খুজে পাওয়া যায়না। কোরআন বা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় এমন কাজকে শরীয়তের কাজ মনে করে সওয়াবের আশায় সম্পাদন করাকে বেদআত বলে। বেদআত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন- "فإن كل بدعة ضلالة"

"নিশ্চয় প্রত্যেক বেদআত পথভ্রষ্টতা।"[১]

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন- "أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته"

"বেদআতকারীর কোন আমল কবুল করতে আল্লাহ অস্বীকার করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বেদআত ত্যাগ করে।[২]

আমি আমার প্রবন্ধে মৃত ব্যক্তি কেন্দ্রিক কুসংস্কার, বিশেষকরে জানাযার নামায আদায় করার পূর্বে ও পরে আমাদের সমাজে প্রচলিত বেদআত সমূহ উল্লেখ করব, ইনশাআল্লাহ।

জানাযা নামাজের ফযীলত ঃ

একজন মুসলমানের উপর অন্য মুসলমান ভাইয়ের যে ছয়টি হক বা অধিকার রয়েছে তন্মধ্যে একটি হল, কোন মুসলমান মারা গেলে তার জানাযায় অংশ গ্রহণ করা। জানাযায় অংশ গ্রহণ করলে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন-

«مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ ». قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ ».

"যে ব্যক্তি জানাযায় অংশ গ্রহণ করল এবং নামায পড়ল সে এক ক্বীরাত সওয়াব লাভ করল। আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত উপস্থিত থাকল সে দুই ক্বীরাত সওয়াব লাভ করল।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল: দুই ক্বীরাত কি? উত্তর দিলেন: 'দুটি বড় বড় পাহাড় সমান সওয়াব।[৩]

জানাযার নামাজে অংশগ্রহণকারী মানুষের সংখ্যা অধিক হলে মৃত ব্যক্তি উপকৃত হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ

«مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ».

"কোন মৃত ব্যক্তির জানাযার যদি মুসলমানদের একটি দল শরীক হয় যাদের সংখ্যা একশতে পৌছে যায় আর তারা ঐ মৃত ব্যক্তির মুক্তির জন্য সুপারিশ তথা দোয়া করে তখন তাদের দোয়া কবুল করা হয়।[৪]

জানাযা নামাজ আদায় করার সহীহ পদ্ধতি ঃ

মনে মনে জানাযার নামাজ আদায় করার নিয়ত করা এবং কাঁধ বা কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে বাম হাতের উপর ডান হাত বাঁধা।

---

*এম.এ, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জানাযার নামাজে তাকবীর বললেন, প্রথম তাকবীরের সময় হাত উঠালেন, অতঃপর বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে বাঁধলেন।[৫]"

- হাত বাঁধার পর সূরা ফাতেহা পড়া।

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضى الله عنهما – عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ.

তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর পিছনে জানাযার নামাজ পড়েছি। তিনি সূরা ফাতেহা পড়লেন এবং বললেনঃ যেন তোমরা জানতে পার এটা সুন্নাত।[৬]

- অতঃপর দ্বিতীয় তাকবীর বলা এবং দরূদ শরীফ পড়া। আবু উমামা ইবনে সাহল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাকে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) একজন সাহাবী বলেছেনঃ জানাযা নামাজের পদ্ধতি হল ইমাম প্রথম তাকবীরের পর চুপে চুপে সূরা ফাতেহা পড়বে, দ্বিতীয় তাকবীরের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উপর দরূদ পড়বে। তৃতীয় তাকবীরের পর মৃত ব্যক্তির জন্য নিষ্ঠার সাথে দোয়া করবে।[৭]
- অতঃপর তৃতীয় তাকবীর বলা এবং নিম্নে বর্ণিত দোয়াটি পড়া।

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِيمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلاَمِ اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ».

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড়, নর ও নারীদের ক্ষমা কর। হে আল্লাহ, আমাদের মাঝে যাদেরকে, তুমি জীবিত রেখেছো, তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো আর যাদেরকে মৃত্যু দান করো তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু, দান করো। হে আল্লাহ আমাদেরকে তার সওয়াব হতে বঞ্চিত করো না এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো না।[৮]

- ছোট শিশুর জানাযায় দোয়া পড়া সুন্নাত। "اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا وأجرا"

"হে আল্লাহ! এই মৃত শিশুকে আমাদের জন্য অগ্রবর্তী, নেকী ও সওয়াবের ওসীলা বানাও।[৯]

- অতঃপর চতুর্থ তাকবীর বলা এবং ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরানো।

মৃত্যুর পূর্বক্ষণে প্রচলিত কিছু বেদআত ঃ

- আমাদের সমাজে এই ধারণা-বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট শয়তান সেই ব্যক্তির পিতা-মাতার আকৃতি ধারণ করে আগমন করে এবং তাকে ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মের কথা বলতে থাকে যেন সেই মুহূর্তে ঐ মুমূর্ষ ব্যক্তি ঈমান হারা হয়ে যায়। এই প্রকারের ধারণা-বিশ্বাসের কোন শরয়ী ভিত্তি নেই এই প্রকারের ধারণা-বিশ্বাস পোষণ করা বেদআত।
- মৃত পথযাত্রী ব্যক্তির মাথার নিকট কোরআন শরীফ রাখা এবং এ বিশ্বাস রাখা যে এতে ঐ মুমূর্ষ ব্যক্তি উপকৃত হবে।
- মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট বসে কোরআন তেলাওয়াত করা, কোরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত নেই; বরং এই মুহূর্তে যা করণীয় তা হল মুমূর্ষ ব্যক্তিকে কালেমার তালক্বীন দেয়া অর্থ্যাৎ মুমূর্ষ ব্যক্তির পাশে বসে কালেমা পড়া। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ « لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ».

"তোমাদের মুমূর্ষ ব্যক্তিদেরকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়ে শোনাও।" [১০]

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেনঃ « مَنْ كَانَ آخِرُ قَوْلِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ».

"যার শেষ কথা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" [১১]

মৃত্যুর পর প্রচলিত বেদআত সমূহ ঃ

- এই ধারণা-বিশ্বাস পোষণ করা যে, মৃত্যুর পর তিন দিন পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির রুহ ঘরের আশ-পাশে ঘুরতে থাকে।
- মৃত ব্যক্তির নিকট মোমবাতি জ্বালানো।
- মৃত ব্যক্তির নিকট বসে কোরআন তেলাওয়াত করা।
- মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনদের শোক পালনার্থে দাড়ি রাখা।
- মৃত ব্যক্তির গোসলের স্থানে মোমবাতি জালানো।
- মৃত ব্যক্তির কপালে বা বক্ষে আঙ্গুল দ্বারা কালেমায়ে শাহাদাত লেখা।

- এই ধারণা পোষণ করা যে, মৃত ব্যক্তি যদি নেককার হয় তবে তার ওজন হালকা হয়; আর যদি বদকার হয় তবে তার ওজন ভারী হয়।
- লাশ বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় কোরআন তেলাওয়াত করা বা উচ্চস্বরে জিকির করা।
- মৃত্যুর পর চার-দিনা (চতুর্থ দিন) একুশা (একুশতম দিন) চল্লিশা (চল্লিশতম দিন) গরীব-মিসকিনদের খাওয়ানো। এখানে উল্লেখ্য যে কোন মানুষ মারা গেলে গরীবদের খাওয়ানো কোন জরুরী কাজ নয়; বরং ওয়ারিশগন মৃত ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য মসজিদ, মাদরাসাহ বা এতিমখানায় দান-খয়রাত করতে পারেন, গরীবদেরও খাওয়াতে পারেন, তবে খাওয়ানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে সেটা যেন কোন নির্দিষ্ট তারিখ, দিন বা মৃত্যুবার্ষিকীতে না হয়।
- মৃত্যুর পর তৃতীয়, পঞ্চম বা সপ্তম দিনে রুটি বিতরণ করা।

জানাযা নামাজের সময় প্রচলিত বেদআত ঃ

- জানাযা নামাজের পূর্বক্ষণে মৃতের যে কোন এক আত্মীয় দাড়িয়ে উপস্থিত মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে বলেন, "এই মৃত লোকটি জীবিতকালে কেমন ছিলেন?" উপস্থিত সবাই সমস্বরে বলেন: "খুব ভাল ছিলেন।" অথচ অনেক মুসল্লি এই মৃত ব্যক্তিকে চিনতেন না। চেনা-পরিচয় বিহীন কোন লোক সম্পর্কে কিছু বলা মিথ্যা সাক্ষ্যের সমতুল্য। এরূপ প্রশ্ন করা ও উত্তর দেয়া বেদআত। কেননা জানাযা নামাযের পূর্বে এভাবে প্রশ্ন করা ও উত্তর দেয়ার প্রচলন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামগণ (রাঃ) এর সময়ে ছিল না। কোরআন বা হাদীসেও এর কোন উল্লেখ নাই। তবে হ্যাঁ কোন ব্যক্তির ইনতিকালের পর তার আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী বা পরিচিত ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় যদি তার প্রশংসা করে তাতে মৃত ব্যক্তি উপকৃত হয়।

عن أَنَسَ بْن مَالِكٍ – رضى الله عنه – يَقُولُ : مَرُّوا بجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – «وَجَبَتْ ». ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ « وَجَبَتْ ». فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ – رضى الله عنه – مَا وَجَبَتْ قَالَ «هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِى الأَرْضِ».

আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, কিছু লোক একটি লাশের এর পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করল এবং তাঁরা মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করল, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন: "নির্ধারিত হয়ে গেল।" অতঃপর লোকেরা অন্য একজন মৃত ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মৃতের দুর্নাম করল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন: "নির্ধারিত হয়ে গেল।" ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কি নির্ধারিত হল? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন: "তোমরা প্রথম ব্যক্তির প্রশংসা করেছ, তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে গেছে আর দ্বিতীয় ব্যক্তির বদনাম করেছ তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে গেছে। তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী।" [১২]

- জানাযা নামাজ পড়ার সময় জুতা খুলে জুতার উপর দাড়ানো। এখানে যে বিষয়টি লক্ষনীয় তা হল যদি জুতার মধ্যে কোন নাপাকি না থাকে তবে সে জুতা খোলার কোন প্রয়োজন নাই। কেননা সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জুতা পরিধান করে নামাজ আদায় করেছেন। আর যদি জুতার মধ্যে নাপাকি থাকে তবে সে জুতা পরিধান করে বা খুলে তার উপর দাড়িয়ে নামাজ আদায় করা নিষেধ, কেননা একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জুতা পরিধান করে নামাজ আদায় করছিলেন এমন সময় জিবরাইল (আঃ) এসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জুতা খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন, কারণ সে জুতার মধ্যে নাপাকি ছিল। [১৩]
- জানাযার নামাজে তাকবীর দেওয়ার সময় আকাশের দিকে তাকানো। ইহা ঠিক নয় বরং নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযের সময় আকাশের দিকে তাকাতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেনঃ

«مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِى صَلاَتِهِمْ». فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِى ذَلِكَ حَتَّى قَالَ «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ».

"মানুষের কি হল যে তারা নামাজের মধ্যে আকাশের দিকে তাকায়?" এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) নির্দেশ কঠোর ছিল। এমন কি তিনি বললেন: "তাদের এ কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত; অন্যথায় তাদের দৃষ্টি ছিনিয়ে নেয়া হবে।[১৪]"

জানাযা নামাযের পরে প্রচলিত বেদআত সমূহঃ

- জানাযার নামাজ শেষ হওয়ার পর লাশের খাটের চতুর্দিকে জমায়েত হয়ে সম্মলিত ভাবে হাত তুলে দোয়া করাকে অবশ্যক মনে করা একটি বেদআত। কারণ, এইভাবে সম্মলিতভাবে দোয়া করা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বা সাহাবায়ে কেরামগণ থেকে কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নেই।

• জানাযা নামাযের পর চল্লিশ কদম দেয়া। মৃত ব্যক্তিকে কাঁধে নিয়ে চলার সময় গুনে গুনে দশ কদম পর পর কাঁধ পাল্টানো হয়। কেননা কোরআন বা সহীহ হাদীসে এর কোন প্রমাণ নেই।

তবে হ্যাঁ কেউ যদি লাশের খাট বহন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায় তখন তার স্থলে অন্য ব্যক্তি এসে খাট কাঁধে নিতে পারে অথবা সওয়াবের আশায় একে অন্যকে মৃতের খাট কাঁধে নেয়ার সুযোগ দিতে পারে।

• জানাযা নামাযের পর লাশ কাঁধে করে বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় কোরআন তেলাওয়াত বা উচ্চস্বরে জিকির সহ কালেমায়ে শাহাদাত পড়তে থাকা।

উপসংহার

আমাদের সকলের উচিত সমস্ত ইবাদাতকে শিরক-বেদআত থেকে মুক্ত রাখা, অন্যথায় আমাদের কোন আমলই আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

(فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا)

"যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।" (সুরা কাহফ, আয়াত-১১০)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ.

"যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যাতে আমাদের বিধি-বিধান নেই তা অগ্রহনীয়।"(১৫)

আল্লাহ আমাদের সবাইকে শিরক-বেদআত মুক্ত ইবাদত করার তাওফিক দান করুন।

তথ্যসূত্র

১. মুসলিম শরীফ, কিতাবুল জুমুআ, বাব রাফউত সাওতি ফীল খুতবা, হাদীস নং ২০০২। নাসায়ী, কিতাবুল ঈদাইন, বাব কাইফাল খুতবা, হাদীস নং ১৫৭৭ ইবনে মাযা, মুকাদ্দামা, বাব ইযতেনাবুল বিদা ওল জদল, হাদীস ৪৫

২. ইবনে মাযা, মুকাদ্দামা, হাদীস ৫০, তোহফাতুল আশরাফ, নং-৩৩৬৭

৩. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, বাব মান ইনতাজারা হাত্তা তুদফানা, হাদীস ১৩২৫ মুসলিম শরীফ, বাব ফদলুস সালাত আলাল জানায়েয, হাদীস ২১৮৬ সুনানে নাসায়ী, হাদীস ১৯৯৪।

৪. মুসলিম শরীফ, বাব মান সাল্লা আলাইহি মিয়াতুন, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস ২১৯৫। সুনানে তিরমিযী, বাব মা জাআ ফি সালতিল জানায়ে যে, হাদীস ১০২৯। সুনানে নাসায়ী, হাদীস ১৯৯০।

৫. সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল জানায়েয, বাব মা জাআ ফী রাফউল ইয়াদায়নি, হাদীস ১০৭৭, তোহফাতুল আশরাফ ৯/১০ হাদীস ১৩১১৭।

৬. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, বাব কিরাতুল ফাতেহাতুল কিতাব আলাল জানাযাতে, হাদীস ১৩৩৫ ইবনে মাযা, বাব মা জাআ ফীল কিরআতি আলাল জানাযাতি, কিতাবুল জানায়িব, হাদীস ১৪৯৫ ও ১৪৯৬।

৭. আল উম লিশ শাফয়ী, উদৃত কিতাবুল জানায়েয লিশ শায়খ আলবানি। পৃ: ৮২

৮. ইবনে মাযা, বাব মা জাযা ফীদ দুআ ফীস সালাতি আলাল জানাযাতি, কিতাবুল জানায়িয হাদীস ১৪৯৮, তোহফাতুল আশরাফ ১৪৯৯৪

৯. সহীহ আল বুখারী, বাব নং ৬৫, কিরআতু ফাতিহাতুল কিতাব আলাল জানাযাতে।

১০. সহীহ মুসলিম বাব তালকিনুল মাওতা, কিতাবুল জানাইয, হাদীস ২১২০ আবু দাউদ, বাব ফীত তালকিন হাদীস, ৩১১৭। সুনানে নাসায়ী, বাব তালকীন হাদীস ১৮২৫, ইবনে মাযা, হাদীস ১৪৪৫।

১১. সুনানে তিরমিযী, বাব মা জা আ ফী তালকীনিল মারিদ, হাদীস ৯৭৭।

১২. সহীহ মুসলিম, বাব ফীমান য়ুমনা আলাইহি খায়রান কিতাবুল জানাইয, হাদীস ২১৯৭, সুনানে নাসায়ী বাব আছছানা, কিতাবুল জানাইয হাদীস ১৯৩১।

১৩. আবু দাউদ, বাব আস সালাত ফী নাআল, কিতাবুস সালাত, হাদীস ৬৪৬

১৪. সহীহ মুসলিম, বাব আন নহয়ু রফয়িল বাছার ইলাছ ছামায়ি ফিস সালাত, কিতাবুস সালাত হাদীস ৯৬৬

১৫. সহীহ মুসলিম বাব নাকদুল আহকাম আল বাতেলা কিতাবুল আকদিয়া, হাদীস ৪৪৬৮। সহীহ আল বুখারী, কিতাবুস সুলহি, হাদীস ২৬৯৭, সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, হাদীস ৪৬০৬। সুনানে ইবনে মাযা, হাদীস ১৪।

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 164-167)

মানবাধিকারঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ

মোহাম্মদ মেশকাত উন নবী*

ভুমিকা:

ঐতিহাসিক বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মবেত্তাগণ মানুষের অধিকার রক্ষা ও মানবতার কল্যাণে অগ্রসর ভূমিকা পালন করেছেন। ইসলামের আগমনে মানবাধিকার সবচেয়ে বেশী নিশ্চিত, সুরক্ষিত ও চর্চিত হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর আবির্ভাবের পর আরবের অরাজক সমাজ জীবনে নীতি ও নিষ্টার প্রবর্তন ঘটে এবং শান্তি ও সহমর্মিতাকে তিনিই মানব জীবনের আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। নবী করীম (সঃ) বলেছেন: "প্রত্যেক মানুষের বাঁচার অধিকার আছে। স্বস্তির অধিকার আছে এবং নির্বিঘ্ন জীবনের অধিকার আছে"। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের পক্ষ থেকে "মানবাধিকার বিশ্ব ঘোষণা" প্রচারিত হয় তাতে বল হয়, মানুষের মানুষ হিসাবেই কতগুলো অধিকার রয়েছে। তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মান প্রদর্শন সকল মানুষের কর্তব্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মানবাধিকার পর্যায়ে পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই কি সর্বপ্রথম ঘোষণা? বিশ্বমানব সমাজ সম্পর্কে এটাই হয়ত প্রথম ঘোষণা কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজের মানুষের জন্য এটাই প্রথম ঘোষণা নয় এর পূর্বেও দুনিয়ার বিভিন্ন মানব সমাজ সম্পর্কে একাধিক ঘোষণার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইতিহাসে মানবাধিকার ঘোষণা:

দার্শনিক হেগেল আজ থেকে দুই শত বৎসর পূর্বে "ইতিহাস দর্শন" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। তাতে মানুষের অধিকার পর্যায়ে অনেক তত্ত্বকথা আলোচিত হয়েছে বটে, কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র ইউরোপীয় সমাজে মানুষের অধিকার সম্পর্কে আওয়াজ তোলা। বিশ্ব মানবতা তাতে অনুল্লেখিতই রয়ে গেছে।

অতপর ১৭৮৯ সনে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হলে ফ্রান্স অধিবাসী মানুষদের পর্যায়ে মানবাধিকার ঘোষণা দেয়া হয়। কিন্তু তা-ও মূলত পাশ্চাত্যের জনগণ সম্পর্কিত ব্যাপার ছিল। এরপর ১৯৪৮ সনে জাতি সংঘের উপরোক্ত ঘোষণা হয়েছিল বিশেষভাবে যখন সম্পূর্ণ বেআইনি ও অমানবিকভাবে আরব বিশ্বের মধ্য অবস্থিত ফিলিস্তিনকে বিভক্ত করে তার একটি বিরাট অংশ কেবল মাত্র ইয়াহুদিদের জন্য শক্তি ও চক্রান্তের সাহায্যে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়।[১]

মানবাধিকার সম্পর্কে ইসলামের ঘোষণা:

(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)

আজকের দিন তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ পরিণত করে দিলাম, সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত করে দিলাম তোমাদের জন্য আমাদের নিয়ামত এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন- জীবন- বিধান হিসাবে পছন্দ করলাম।[২]

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেছেন:

(ونزلنا عليك الكتب تبيانا لكل شئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين)

এবং আপনার প্রতি ক্রমাগতভাবে কুরআন অবতীর্ণ করেছি সর্ববিষয়ের বর্ণনাকারী ব্যাখ্যাকারী হিসাবে, প্রদর্শনকারী- জীবন- বিধান, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ হিসাবে।[৩]

১. রিযিক - জীবিকা:

কুরআন মজীদে রিযিক الرزق শব্দটি নানা ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। রিযিক বলতে সেই সব জিনিসই বোঝায়, যা এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্যে মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। খাদ্য - পোশাক - বাসস্থান, শিক্ষা, জ্ঞান ও রোগের চিকিৎসা এই সবই এর মধ্য গণ্য।

---

* ১ম সেমিষ্টার, দা'ওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

এইজন্য ইসলামের দৃষ্টিতে "রিযিক" মানবাধিকারভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই শুধু নয়, তা মানবাধিকারের মধ্য সর্ব প্রথম ও সর্বাধিক প্রয়োজনীয়।

মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, মানুষের রিযিকের দায়িত্ব তিনিই গ্রহণ করেছেন। তিনি নিজেকেই "রিযিকদাতা" ঘোষণা করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেনঃ-

(وهو خير الرازقين)

অর্থাৎ এবং তিনি (আল্লাহ) হচ্ছেন সর্বোত্তম রিযিকদাতা।[৪]

তিনি আরও বলেছেন,

(إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين)

নিশ্চয় আল্লাহ ত'আলা বিপুল রিযিকদাতা সুদৃঢ় শক্তির অধিকারী।[৫]

অন্যস্থানে বলেছেন,

(وكلوا مما رزقكم الله حللا طيبا واتقو الله الذى انتم به مؤمنون)

এবং তোমরা আহার ও ভোগ ব্যবহার কর আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে হালাল ও পবিত্র-উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি এবং তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও।[৬]

২. জীবন ও প্রাণের নিরাপত্তা লাভে মানবাধিকার :

খাদ্য- জীবনোপকরণ এবং ধর্ম ও দ্বীন পালনে নিরাপত্তা লাভের পর মানুষের জীবন- প্রাণের নিরাপত্তা লাভ একান্তই অপরিহার্য, তাও মৌলিক মানবাধিকার এর অন্তর্ভুক্ত। মানুষ যদি জীবন রক্ষার নিরাপত্তাই লাভ না করল তা হলে খাদ্য বা জীবনোপকর তাও ধর্ম গ্রহণ ও পালনের অদিকার তার জন্য নিতান্তই অর্থহীন।[৭]

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে কোনরুপ কারণ ব্যতীত এবং আইনের চূড়ান্ত বিচার ও সেই বিচার দন্ড স্বরূপ প্রাণ সংহার ব্যতীত অন্য কোন ভাবে মানুষকে হত্যা করা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ তথা হারাম। ইরশাদ হচ্ছে,

(ولا تقتلو النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا)

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের প্রাণ ও জীবনকে অত্যাধিক সম্মানিত বানিয়েছেন। তা কোনরুপ কারণ বা আইনের চূড়ান্ত বিচারে সাব্যস্ত দন্ড ছাড়া সংহার করা যেতে পারে না। অতএব তোমরা মানুষকে হত্যা কর না। যে লোক অন্যায় ভাবে ও বিচারের দন্ড ছাড়াই নিহত হয়, সে হিসাবে হত্যাকারীকে হত্যা করার অধিকার আমরা দিয়েছি। কিন্তু এই দ্বিতীয় হত্যা মানবিকতাকে লংঘণ করা যাবে না। এই অভিভাবক হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে অবশ্যই সাহায্য প্রাপ্ত হবে।[৮]

এতিমের মাল সংরক্ষণঃ

যে বালক-বালিকার পিতা মারা যায়, তারাই এতিম তার অপূর্ণ বয়স্ক বলেই তাদেরকে ইয়াতিম বলা হয়। মৃত পিতা হয়ত অনেক ধন-মাল রেখে গেছে কিন্তু সে সবের রক্ষণাবেক্ষণ ও বিলি ব্যবস্থা করা, জমি চাষাবাদ করা ইয়াতিমদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ কারণে তার বড়ই অসহায়। এই সুযোগ অনেকেই তাদের ধন-সম্পদ ও বিত্ত সম্পত্তির অপহরণ করে নেয়। এরই প্রতিরোধ হিসেবে আল্লাহ এই সাবধান বাণী ঘোষণা করেছেন,

(إن الذين يأكلون أموال اليتمى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا)

যারা ইয়াতীমদের মাল ভক্ষণ করে জুলুম করে তার আসলে নিজেদের পেটে আগুণ ভরে। পরিণামে তারা অবশ্যই জাহান্নামে যাবে।[৯]

অন্যত্র আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

(ولا تقربوا مال اليتمى إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده)

তোমরা ইয়াতিমের ধন সম্পদের কাছেও যাবেনা তবে উত্তম পন্থায় যেতে পার, তাও তার পূর্ণ বয়স্কতা পাওয়া পর্যন্ত।[১০]

আরও বলেছেন, তোমরা উত্তম উৎকৃষ্ট মালকে খারাপ মালের সাথে আদল-বদল করবে না এবং তোমাদের মালের সাথে তাদের মাল মিলিয়েও খাবে না। কেননা তা অতি বড় গুনাহ।[১১]

পিতা-মাতার অধিকারঃ

সামষ্টিক অধিকারের পর্যায়ে সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে সন্তানের উপরে পিতা-মাতার হক বা অধিকার। কুরআন মজিদে তাওহীদী আকিদার সমপর্যায়ে ও পর- পরই উল্লেখিত হয়েছে। স্বতন্ত্রভাবে এর উল্লেখ দেখা যায়।

একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

(واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا)

এবং তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ কর এবং তার সাথে কোন কিছুকেই শরীক বানিও না। আর পিতা-মাতার সাথে উত্তম দয়ার্দ্র ও আন্তরিক আচরণ গ্রহণ কর।[১২]

আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার ব্যাপারে বিশেষ উপদেশ দিয়েছি। (স্মরণ করিয়ে দিয়েছিযে,) তার মা তাকে বহন করেছে দূর্বলতার ওপর দুর্বলতা সহ্যকরে, আর তার দুধ ছাড়ানো হয়েছে দুই বছরের মধ্য- যে, তুমি আমার শোকর কর, কর তোমার পিতা-মাতারও যদিও শেষ পর্যন্ত আমার নিকটই হবে চূড়ান্ত পরিণতি।

এই পিতা-মাতার সাথে খারাপ আচরণ করা, তার ওপর অভিশাপ বর্ষণের কারণ ঘটানো অত্যন্ত বড় অপরাধ বলে নবী করীম (সঃ) জানিয়েছেন, তিনি বলেছেন,

إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه

ব্যক্তি তার পিতা-মাতার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করলে সবচেয়ে বড় (কবীরা) গুনাহ হবে।[১৩]

স্বামী- স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারঃ

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারের গুরুত্ব সর্বাগ্রাম্য। কেননা পরিবার হচ্ছে সমাজ প্রসাদের প্রথম ইট, সমাজ সংস্থার প্রথম একক। আর একজন পুরুষ ও একজন নারী যখন স্বতঃস্ফুর্তভাবে বিবাহিত হয়ে একত্রিত জীবন যাপন শুরু করে। তখনই একটি পরিবারের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই পুরুষ ও নারীই হচ্ছে স্বামী ও স্ত্রী।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক মধুর ও শান্তির হলে পুরো সামজিক শান্তির হয়। আর তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে তিক্ত ও অপ্রীতিকর হলে শুধু যে পরিবারটিই অশান্তিপূর্ণ ও বিপর্যস্ত হবে। তা-ই নয় তার তিক্ততা সংক্রমিত হয়ে গোটা সমাজকেই বিষাক্ত বাণিয়ে দিবে। তাই স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সম্য এবং পরিবার প্রধান হিসাবে স্বামীর এক মাত্রার অতিরিক্ত অধিকারের কথা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ-

ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة

স্ত্রীদের অধিকার ঠিক ততটাই যতটা প্রচলিত নিয়মে তাদের কর্তব্য। তবে তাদের ওপর পুরুষদের একমাত্র মর্যাদাধিক্য রয়েছে।[১৪]

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন,

(الرجال قوامون على النساء)

পুরুষরা মেয়েদের চালোকে মর্যাদা সম্পন্ন।[১৫]

তিনি আরো বলেন, তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে আচরণ কর ও জীবন যাপন কর। তোমরা যদি তাদের অপছন্দই কর, তাহলে জেনে রেখো, তোমরা হয়ত কোন জিনিস অপছন্দ কর। অথচ আল্লাহ তাতে বিপুল কল্যাণ রেখেছেন। (তাই হঠাৎ করে- পরীক্ষা না করে চরম পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। করলে মানবাধিকার ক্ষুন্ন হবে)।

শ্রমের অধিকার- শ্রমিকের অধিকারঃ

ইসলামে মানুষের শ্রম করার অধিকার ও পূর্ণ মাত্রার স্বীকৃতি। মানুষের জীবিকার প্রধান উপায় শ্রম। একথা কুরআন মজীদে জোরালো ভাষায় বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

(وأن ليس للإنسان إلا ما سعى– وأن سعيه سوف يُرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى)

এবং মানুষের প্রাপ্য শুধু তা, যার জন্য সে চেষ্টা ও শ্রম করেছে। এই চেষ্টা ও শ্রম অবশ্যই গুরুত্ব পাবে এবং চেষ্টা শ্রমকারীকে তার পূর্ণ মাত্রার প্রতিফল অবশ্যই দেয়া হবে।[১৬]

রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

اعطو الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

শ্রমিকের শ্রমজনিত ঘাম শুকাবার আগেই অবিলম্বে তার মজুরী দিয়ে দাও।[১৭]

মজুরী না দেয়া বা কাজ অনুপাতে না দেয়াও ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রসুলে করীম (সাঃ) বলেছেন, তিনি কেয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির ফরিয়াদী হয়ে দাঁড়াবেন।

তাদের একজন হল,

رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره

যে ব্যক্তি কোন শ্রমিক নিযুক্ত করে তার দ্বারা পূর্ণ কাজ করিয়ে নেয়ার পর তার মজুরী দেয়নি।[১৮]

তিনি আরো বলেন, তোমাদের কারোর খাদেম যখন তার জন্য খাবার নিয়ে আসবে, তখন তাকে সঙ্গে বসিয়ে না খাওয়ালেও তাকে অবশ্যই এক মুঠি বা দুই মুঠি খাবার দেবে। কেননা সে-ই তার ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বশীল।

উপসংহারঃ

বর্তমান বিশ্বে "মানবাধিকার" শব্দটি খুবই আলোচিত ইস্যু। বিশ্বের পরাশাক্তিগুলো "মানবাধিকার" নাম দিয়ে মুসলিম জনপদগুলো ক্ষতবিক্ষত করছে। এখন মানুষের প্রশ্ন হল, মানবাধিকার কি? আজ ফিলিস্তিনে, ইরাকে, আফগানিস্তানে, যে নিস্পাপ শিশু ও নারী নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। বন্দি নির্যাতনের নামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য কুখ্যাত হয়েছে গুয়ান্তানামো শিবির। এটাই কি মানবাধিকার!

তথাপি সভ্যতা ও মানবাধিকার পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই "সত্যের আগমনে, মিথ্যা দূরীভূত" প্রকৃত মানবাধিকারের ধারক-ইসলাম তাই আমাদের ইহা সঠিক ভাবে বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে।

তথ্যসূত্র

---

১ মাওঃ আব্দুর রহীম, ইসলাম ও মানবাধিকার (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশণী, দ্বীতিয় প্রকাশ, ২০০২ইং) পৃ. ৯-১০।

২ আল কুরআন, সূরা মা'য়িদাঃ৩

৩ সূরা আল নহলঃ ৮৯

৪ সূরা আল মুমিনঃ৭২

৫ সূরা আল হজ্জঃ ৫৮

৬ সূরা আল মায়িদাঃ ৮৮

৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

৮ সূরা বনী- ইসরাইলঃ ৩৩

৯ সূরা আল নিসাঃ ১০

১০ সূরা বনী ইসরাইলঃ৩৪

১১ সূরা আল নিসাঃ২

১২ সূরা আল নিসাঃ ৩৬

১৩ সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং- ৫৫১৬।

১৪ সূরা আল নিসাঃ ২২৮

১৫ সূরা আল নিসাঃ ৩৪

১৬ সূরা আল নাজমঃ ৩৯-৪১

১৭ সুনানু ইবনি মাজাহ, কিতাবুল আহকাম, হাদীস নং- ২৪৩৪।

১৮ সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল বুয়ু', হাদীস নং- ২০৭৫।

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 168-170)

কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান অভিন্ন সূত্রে গাঁথা

মু. আরাফাত খাঁন*

কুরআনের চ্যালেঞ্জ

সকল সংস্কৃতিতে সাহিত্য এবং কবিতা মানুষের ভাব প্রকাশ ও সৃজনশীলতার অন্যতম প্রধান মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। সমগ্র বিশ্ব এমন একটা যুগ অতিবাহিত করেছে যখন সাহিত্য ও কবিতা গৌরবজ্জ্বল অবস্থান অর্জন করেছিল। যেমন বর্তমানে অর্জন করেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।

এমন কি মুসলিম পন্ডিতরাও স্বীকার করেছেন যে, কুরআন হচ্ছে এক অনন্য আরবী সাহিত্য এবং এটা পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ আরবী সাহিত্য। কুরআন মানব জাতিকে কুরআনের মত অনুরূপ গ্রন্থ তৈরি করার চ্যালেঞ্জ করেছে।

(وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعو شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين).

তোমাদের যদি কোন সন্দেহ থাকে, যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ন করেছি তা সম্পর্কে তাহলে এর মত একটি সুরা রচনা করে নিয়ে আস। এক আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। আর যদি তা না পারো অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবেও না, তাহলে সে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও-পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য। (সূরা আল-বাকারা (২) ঃ ২৩-২৪)

কুরআনের অন্তর্ভূক্ত সূরাগুলোর মত যে কোন একটি সুরা তৈরি করার জন্য কুরআন চ্যালেঞ্জ করেছে। ঠিক একই ধরনের চ্যালেঞ্জ কুরআনে বারবার পূনরাবৃত্তি হয়েছে। সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যিক ভাষায়- পৃথিবীকে চ্যাপ্টা হিসাবে যে ধর্মগ্রন্থে বর্ণনা করে তা অবশ্য আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন কোন ব্যক্তি কর্তৃক কখনোই গৃহীত হবে না।

কারণ আমরা এমন একটা যুগে বসবাস করি যেখানে মানবিক কারণ, যুক্তি এবং বিজ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বেশির ভাগ লোকই কুরআনের অভূতপূর্ব চমৎকার ভাষার জন্য এটাকে আল্লাহর গ্রন্থের প্রমান হিসাবে মেনে নিবে না। আল্লাহর নাযিলকৃত হবার দাবীদার কোন গ্রন্থকে অবশ্যই তার নিজস্ব কারণ ও যুক্তির শক্তির উপর নির্ভরযোগ্য হতে হবে।[১]

বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী ও নোবেল বিজয়ী আলবার্ট আইনস্টাইন বলেন, ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু, বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম পঙ্গু।[২] তাই চলুন কুরআন অধ্যায়ন করি এবং এটিকে জানতে বা বুঝতে খুঁটিয়ে দেখি যে, কুরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান কি সংগতিপূর্ন নাকি অসংগতিপূর্ন।

পদার্থ বিজ্ঞান

* অতিপারমানবিক কণিকার অস্তিত্ব:

প্রাচীনকালে 'পরমানুবাদ' নামে একটি সুপরিচিত তত্ত্ব ব্যাপকভাবে গৃহিত হয়েছিল। মূলত প্রায় ২৩ শতাব্দীকাল পূর্বে বসবাসকারী গ্রীকরা বিশেষতঃ ডেমোক্রিটাস নামে এক গ্রীক দার্শনিক কর্তৃক এই তত্ত্বটি প্রস্তাবিত হয়েছিল। এই তত্ত্বটি মূলতঃ গ্রীকরা প্রস্তাব করেছিল, তবে ডেমোক্রিটাস এবং তার পরবর্তী লোকেরা ধারণা করত যে, পরমানু হচ্ছে বস্তুর ক্ষুদ্রতম একক।[৩]

আরবরাও এই রকম বিশ্বাস করত। আরবী শব্দ ..... (জাররাহ) এর অতিসাধারণ অর্থ হচ্ছে পরমানু। বর্তমানে বিজ্ঞান আবিস্কার করেছে যে, পরমানুকে বিভাজন করা সম্ভব। পরমানু যে বিভাজিত হতে পারে তা বিংশ শতাব্দীর আবিস্কার। এমনকি ১৪ শতাব্দীকাল পূর্বে এই ধারণা আরবের কারও জানা ছিল না। সে জন্য (জাররাহ) ছিল একটি সীমা যা কেউ অতিক্রম করতে পারত না। তথাপি নিচের আয়াতটি এই সীমা স্বীকার করে নাঃ

---

* ২য় সেমিষ্টার, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

(وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى لياتينكم عالم الغيب لا يعزب عند مثقال ذرة في السموات والأرض ولا أصغر من ولا أكبر إلا في كتاب مبين، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين).

কাফিরগণ বলে – কিয়ামত আমাদের নিকট আসবে না। বল, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমাদের নিকট তা অবশ্যই আসবে। তিনি যাবতীয় অদৃশ্যের জ্ঞানী। তাঁর থেকে লুকায়িত নেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুকণা। আকাশ ও পৃথিবীতে, না তার থেকে আর না তার থেকে বড় (কোনটাই নেই লুকায়িত)। সবই আছে এক সুস্পষ্ট কিতাবে। (সূরা সাবাঃ৩)। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরও বলেনঃ আর তোমার প্রতিপালকের দৃষ্টির আড়ালে এমন অনুপরিমান বা তা থেকে ছোট বা তা থেকে বড় কোন তা বস্তু নেই যা আছে পৃথিবীতে , আর না যা আছে আসমানে। যা (লেখা) আছে এক সুস্পষ্ট কিতাবে। (সূরা ইউনুস ঃ ৬১)

এই আয়াত আল্লাহর অসীম জ্ঞান, তার প্রকাশ্য ও গোপন সকল জ্ঞানের দিকে ইঙ্গিত করে। তারপর এটি বলে যে, পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সব কিছুর ব্যাপারে আল্লাহ সচেতন। এভাবে আয়াতটি সুস্পষ্টভাবে প্রমান করে যে, পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব, যে সত্যটি আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা অতি সম্প্রতি আবিস্কৃত হয়েছে।[৪]

জীব বিজ্ঞান

*** প্রত্যেক জীবন পানি থেকে তৈরিঃ**

কুরআনের নিচের আয়াতটিতে মনোযোগ দেয়া যাকঃ

(أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كنتا رتقا ففتقنها وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون).

"কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না"?

(সূরা আল-আম্বিয়াঃ৩০)

বিজ্ঞানের অনেক অগ্রগতির পরে বর্তমানে শতকরা ৮০ ভাগ পানি দ্বারা তৈরি কোষের সার বস্তু সাইটোপ্লাজম সম্পর্কে জানতে পেরেছি। বিজ্ঞান এটাও জানিয়েছে যে, অধিকাংশ জীব শতকরা ৫০-৯০ ভাগ পানি দ্বারা গঠিত এবং প্রত্যেক প্রাণীকে যে, পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা ১৪ শতাব্দী পূর্বে কোন মানুষের পক্ষে কি অনুমান করা সম্ভব ছিল? অধিকন্তু আরবের মরুভূমি কোন মানুষের দ্বারা এ ধরনের অনুমান কি কল্পনা যোগ্য হতে যেখানে সর্বদা পানির দুস্প্রাপ্যতা ছিল?[৫] (৫)

নিচের আয়াতটি পানি দ্বারা প্রাণী সৃষ্টি সম্পর্কে বর্ণনা করে– (والله خلق كل دابة من ماء).

"আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক প্রাণীকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আল-নূরঃ৪৫)

কুরআনের আয়াতে পানি দ্বারা মানব সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে।

(وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وجهرا وكان ربك قديرا).

"তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে, অতঃপর তাকে রক্তগত, বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার পালনকর্তা সবকিছু করতে সক্ষম।" (আল-ফুরকানঃ ৫৪)

উদ্ভিদ বিজ্ঞান

*** উদ্ভিদকে জোড়ায় জোড়ায় (পুরুষ ও স্ত্রী) সৃষ্টি করা হয়েছেঃ**

পূর্বকালে মানুষ জানত না যে, উদ্ভিদেরও পুরুষ ও স্ত্রী লিঙ্গ বৈষম্য রয়েছে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের মতে প্রত্যেক উদ্ভিদের পুরুষ ও স্ত্রী লিঙ্গ আছে। এমনকি সমজাতীয় উদ্ভিদেরও পুরুষ ও স্ত্রী লিঙ্গ আছে।

(وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبت شتى).

"আর আকাশ থেকে তিনি পানি বর্ষণ করেন, আর তা দিয়ে আমি যুগল উদগত করি, যার প্রত্যেকটি অন্যটি থেকে আলাদা"। (তা-হাঃ৫৩)

ফল জোড়ায় জোড়ায় (পুরুষ ও স্ত্রী) সৃষ্টি করা হয়েছেঃ (ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين).

"আর সকল প্রকারের ফল হতে সেখানে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আরাদঃ৩)

ফল হচ্ছে উৎকৃষ্ট উদ্ভিদের প্রজননতা প্রক্রিয়ার শেষতম পরিণতি। ফল উৎপাদনের পূর্ববর্তী পর্যায়ে পাওয়া যায় ফুল; এই ফুলের রয়েছে পুরুষাঙ্গ ও স্ত্রী অঙ্গ (পুংকেশর ও গর্ভকেশর)। কোন ফুলের স্ত্রী অংগে যখন পরাগের মাধ্যমে পুংকেশর প্রকিষ্ট হয়, তখন ফুল গভবর্তী হয়; পরে এই ফল পরিপক্ক হয় এবং তার বীজ ছড়ায়। সকল ফলের মধ্যেই যে, পুরুষ ও স্ত্রী অঙ্গ বিদ্যমান রয়েছে, তা কুরআনে উল্লিখিত এক মহাসত্য।

কিছু নির্দিষ্ট প্রজাতির ফল, অনিষিক্ত (গর্ভহীন) ফুল থেকে উৎপন্ন হতে পারে (পার্থি নৌকার্পিক ফল) যেমন, কলা বিশেষ প্রকারের আনারস, ডুমুর, কমলা, আঙ্গুর ইত্যাদি। অবশ্য এসব ফল তাদের অন্য ধরনের গাছগাছালি থেকেও উৎপন্ন হতে পারে, যে সব গাছাগাছালিতে সুস্পষ্ট যৌন প্রজনন বিদ্যমান।[৬]

*** সব কিছু জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছেঃ**

(ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون).

"আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার"। (সূরা আয-যারিয়াত ঃ ৪৯)

জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি সম্পর্কিত এ আয়াত মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ ও ফলসহ সব কিছুকে অন্তর্ভূক্ত করে। এমনকি এটা ঋণাত্মক চার্জযুক্ত ইলেকট্রন ও ধনাত্মক চার্যযুক্ত প্রোটনের সমন্নয়ে গঠিত বিদ্যুৎ এর (ইলেকট্রিসিটি) পরমানুকেও অন্তর্ভূক্ত করছে।

(سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون).

"পুতঃ পবিত্র সত্বা যিনি জোড়া সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেকটির যা উৎপন্ন করে যমীন আর তাদের নিজেদের ভিতরেও আর সে সবেও যা তারা জানে না" (সূরা ইয়াসীনঃ ৩৬)

কুরআন এখানে বলে যে, বর্তমানে মানুষ যা জানে আর যা জানে না ও পরবর্তী সময়ে যা আবিস্কৃত হতে পারে সেগুলোসহ সব কিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে।

তাই আসুন কুরআনের গবেষণায় জাতির অগ্রগতির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করি। যে কুরআনই হলো বিজ্ঞানের মূল উৎস।

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন ঃ يس، والقرآن الحكيم

ইয়াসীন, এবং বিজ্ঞানময় কুরআন" (সূরা ইয়াসীন:১-২)

আল্লাহ তায়ালা সকলকে কুরআন অনুযায়ী জীবন ধারণের তাওফিক দান করুন, আমীন॥

তথ্যসূত্রঃ

---

১ The Quran & Modern Science Compatible or Incompatible : Dr. Zakir Naik.

২ বিশ্বখ্যাত মনীষিদের জীবনী : মাইকেল এইচ হার্ট, পৃষ্ঠা নং-৬৭

৩ রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান : টমাস এডিসন, পৃষ্ঠা: নং : ৩১

৪ The Quran & Modern Science compatible or incompatible : Dr. Zakir Naik.

৫ The Quran & Modern Science compatible or incompatible : Dr. Zakir Naik.

৬ The Quran & Modern Science compatible or incompatible : Dr. Zakir Naik.

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 171-173)

আত্মনির্ভরশীলতা ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ

আ.খ,ম, নোমান কুতুবী*

ভূমিকা ঃ

আত্মনির্ভরশীলতা মানব সভ্যতার প্রাণশক্তি। যা ছাড়া মানবজাতির অস্তিত্ব, উন্নতি, অগ্রগতি, প্রগতি ইত্যাদি অকল্পনীয়। আর এসবের মূলে রয়েছে উৎপাদন। উৎপাদনের সুতিকাগার হচ্ছে শ্রম। অর্থনীতির ভাষায় Land, Labour, Capacity, Organization উৎপাদনের এ চার সূচকের মধ্যে Labour বা শ্রম অন্যতম।

এ শ্রমের মাধ্যমে তিলে তিলে গড়ে উঠে আত্ম-নির্ভরশীলতার শক্তিশালী ইমারত। ইসলামের দৃষ্টিতে এ আত্মনির্ভরশীলতা তথা আত্মকর্মসংস্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইসলাম মানুষকে পরনির্ভরশীল না হয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়া শিক্ষা দেয়। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মনির্ভরশীলতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ।

ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মনির্ভরশীলতা ঃ

ইসলামে আত্মনির্ভরশীল জীবন কাম্য। অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেই নিজের জীবিকা নির্বাহ করবে। অন্যের নিকট হাত না পেতে নিজেই নিজের রুজি রোজগার ব্যবস্থা করবে। ইসলাম প্রতিটি মানুষের কাছে এটাই দাবী করে। এ জন্য ইসলাম হালাল উপার্জনকে ফরজ করে দিয়েছেন। মহানবী (সঃ) বলেছেন-

"طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة"

অর্থাৎ, অন্যান্য ফরজের সঙ্গে হালাল উপার্জনও ফরজ।[১]

কাজেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে হালাল উপার্জনে সচেষ্ট হতে হবে। নিজের ও পরিবারের প্রয়োজন মিটাবার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে।

এ কথা সত্য যে, ইসলাম সম্পদের মোহ ও লোভ লালসাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। ঘৃণা করে কৃপনতাকে। কিন্তু সাথে সাথে পরিমিত ও প্রয়োজনীয় সম্পদের গুরুত্বও ইসলাম স্বীকার করে। কারণ ধন-সম্পদ ছাড়া নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণ সম্ভব নয়। (যা করা প্রতিটি ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব) এমনকি, নূন্যতম সম্পদহীন অবস্থা ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনতে পারে। মানুষেকে ঈমান আকিদা বিরোধী ও শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত করতে পারে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সঃ) বলেছেন- "كاد الفقر أن يكون كفرا"

অর্থাৎ, দারিদ্র কুফুরের দিকে নিয়ে যেতে পারে।[২]

তাই দারিদ্রমুক্ত জীবনযাপন করার মতো প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে। অন্য একটি হাদিসে রাসূল (সঃ) বলেছেন- "ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه إلا دينارا ودرهاما"

অর্থাৎ লোকদের সম্মুখে এমন যুগ আসবে যখন (হারাম হতে বাঁচার জন্য) অর্থকড়ি ব্যতিরেকে উপায় থাকবে না।[৩]

কাজেই হারাম হতে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পদ হালাল পথে সংগ্রহ করার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

মহানবী (সঃ) আরো বলেছেন- "لا بأس بالغناء لمن اتق الله"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তার জন্য ধন সম্পদে ক্ষতি নেই।[৪]

এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ সাধক ও মুহাদ্দিস সুফিয়ান সাওরির (রহঃ) একটি বাণী প্রনিধানযোগ্য)। তিনি বলেছেন-

"كان المال فيما مضى يكره، فأما اليوم فهو فرس المؤمن"

অর্থাৎ অতীতকালে ধন-সম্পদ অপছন্দ করা হতো। কিন্তু আজকাল ধন-সম্পদ হলো মুমিনের জন্য ঢাল স্বরূপ।[৫]

---

* ২য় সেমিষ্টার, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

এজন্য স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ফরজ ইবাদত (বিশেষতঃ জুমার নামাজ) শেষ করার পর পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহর দেয়া ফযল (রুজি রোজগার) অনুসন্ধান করতে বলেছেন।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন-

যখন নামাজ সমাপ্ত হয়, তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড় ও আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) অন্বেষণ করা।[৬]

আরেকটি আয়াতে রিযিকের সন্ধানে পৃথিবীর কন্দরে কন্দরে ছড়িয়ে পড়তে বলা হয়েছে-

অর্থাৎ, অতএব তোমরা চল পৃথিবীর কন্দরে কন্দরে এবং তাঁর কাছ থেকে পাওয়া রিযিক আহার কর।[৭]

ইসলামের প্রাথমিককালের রাতের দীর্ঘ নামাজের বাধ্যবাধকতা থেকে পরবর্তীতে অব্যহতি দানের অন্যতম কারণ হিসেবে রুজি রোজগারের বাস্তবতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে-

অর্থাৎ অন্যান্যরা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায় সন্ধান করে আল্লাহর অনুগ্রহ।[৮]

কাজেই অলস ও শ্রমবিমুখ হয়ে বসে থাকার সুযোগ নেই। পরনির্ভরশীলতা ও অন্যের অনুগ্রহের উপর বেঁচে থাকা বাঞ্ছিত নয়। নবী (সঃ) বলেছেন- "ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه"

অর্থাৎ, কারো জন্য নিজের হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম আহার বা খাদ্য নেই।[৯]

এ থেকে বুঝা যায়, নিজের শ্রমে জীবিকা অর্জন সর্বোত্তম জীবিকা। এ জন্য ইসলাম বিনা প্রয়োজনে অন্যের কাছে হাত পাততে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন- মহানবী (সঃ) বলেছেন-

"من سأل وعنده ما يغنيه فإنما .....من النار"

অর্থাৎ, যে যাঞ্চনা করে (হাত পাতে) অথচ, তার নিকট এমন সম্বল রয়েছে যা তাকে উহা হতে বাঁচাতে পারে, নিশ্চয়ই সে আগুন সংগ্রহ করছে।[১০]

অন্য এক হাদীসে রাসূল (সঃ) বলেছেন- "المسائل قدوح يقدح بها الرجال وجهه"

অর্থাৎ, চাওয়া হলো ক্ষত স্বরূপ, যার দ্বারা যাঞ্চাকারী নিজের মুখমন্ডলকে ক্ষত বিক্ষত করছে।[১১] হাত পাতার নীচতা প্রকাশ করতে গিয়ে মহানবী (সঃ) বলেছেন- "اليد العليا خير من اليد السفلى.... إلى آخر الحديث"

অর্থাৎ উপরে হাত নিচের হাত হতে উত্তম। উপরের দাতার হাত নিচে গ্রহীতার হাত।[১২]

এ প্রসঙ্গে আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত কম্বল ও কুড়াল সংক্রান্ত কাহিনীটি স্মর্তব্য।

একদা মহানবী (সঃ) এর কাছে একজন ভিক্ষা চাইলে তিনি ভিক্ষা দেয়ার বদলে ঐ ব্যক্তির একমাত্র সম্বল, কম্বলটি বিক্রি করে একটি কুড়াল কিনে দিয়ে কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করতে বললেন। মহানবীর কথামত কাজ করার ফলে শেষ পর্যন্ত লোকটির অভাব দূর হয়ে যায়।

এ থেকে স্পষ্ট যে, ভিক্ষা নয়, কাজই মহানবীর (সঃ) শিক্ষা। মোট কথা, হালালভাবে প্রয়োজনীয় ধন-সম্পদ সংগ্রহ করা আত্মনির্ভরশীল হওয়া, অন্যের গলগ্রহ না হওয়া, পারত পক্ষে হাত না পাতা, শ্রমবিমুখ ও অলসতা পরিহার করে কাজ করা, পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করাই হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা।

কম্বল ও কুড়ালের কাহিনী থেকে এও বুঝা যায় যে, ভিক্ষা কোন সামাধান নয়। বরং মানুষকে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া, স্বল্প কোন পুঁজি বা আয় উপার্জনের উপকরণ যোগাড় করে দেয়া এবং সঠিক পরামর্শ দেয়াই হচ্ছে সামাধান। ইসলাম চায় স্থায়ী দারিদ্র বিমোচন। আর স্থায়ী বিমোচনের জন্য প্রয়োজন উদ্যোগ ও কঠোর পরিশ্রম।

অলস হয়ে ঘরে বসে না থেকে কাজ বা রুজি রোজগারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া, প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো। তাহলে অবস্থার পরিবর্তন আশা করা যায়। যেমন- একটি হাদিসে আছে- "سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا"

অর্থাৎ রাসূল (সঃ) বলেছেন- তোমরা (কাজ বা ব্যবসার উপলক্ষে) ভ্রমণ কর এবং (পরিনামে) ধনাঢ্য অর্জন কর।[১৩]

বস্তুতঃ কঠোর পরিশ্রম, আত্মকর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল মনোভাব দারিদ্র বিমোচনের প্রকৃষ্ট পন্থা। আর পরমুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত আত্মনির্ভরশীল জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন সে লক্ষ্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা। কেননা যারা আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রচেষ্টা চালায় আল্লাহ তায়ালা তাকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। যেমন মহানবী (সঃ) বলেছেন- "ومن يستغني يغنيه الله"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরমুখাপেক্ষিতামুক্ত আত্মনির্ভরশীল হতে চায় আল্লাহ তাকে আত্মনির্ভরশীল করে দেন।[১৪]

অতএব, এ থেকে বুঝা যায়, ইসলাম মানুষকে আত্মনির্ভরশীল হতে শিক্ষা দেয়। নেয়ার জন্য নয়, দেয়ার জন্য শিক্ষা দেয়।

শেষকথাঃ

আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সকলের উচিৎ পরনির্ভরশীল না হয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়া। আত্মনির্ভরশীল হওয়ার মাধমে জীবন সুন্দর হয় এবং সুখের হয়।

তাই আসুন আমরা সবাই ইসলামের নির্দেশ মোতাবেক আমাদেরকে পরনির্ভরশীল না করে আত্মনির্ভরশীল করি এবং দারিদ্রমুক্ত সমাজ গড়ার চেষ্টা করি। মহান আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন। আমীন-

তথ্যসূত্র ঃ

---

১ বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ২৪, হাদীস নং- ১২০৩০

২ বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা- ২৬৭, হাদীস নং- ৬৬১২

৩ আহমদ, খন্ড-৩৭, পৃষ্ঠা- ১৩৪, হাদীস নং- ১৭৬৬৬।

৪ আহমদ, খন্ড-৫০, পৃষ্ঠা- ৩৬৪, হাদীস নং- ২৩৮৫৮

৫ মিশকাত (বাব ইস্তিজাবুররিজাল) খন্ড- ১৫, হাদীস নং- ২০১।

৬ সূরা জুমআ -১০

৭ সূরা মূলক - ২০।

৮ সূরা মুজ্জাম্মেল- ২০।

৯ সহীহ বুখারী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ৭৩০, হাদীস নং- ১৯৫৬।

১০ আবু দাউদ, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা- ১৭৭, হাদীস নং- ১৬৩১।

১১ আবু দাউদ, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা- ১৯০, হাদীস নং- ১৬৪১।

১২ সহীহ বুখারী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ৫১৮, হাদীস নং-১৩৬১।

১৩ তাবরানী আল আওসাত, খন্ড- ৯, পৃষ্ঠা- ৯২১১, হাদীস নং-৯১৮১।

১৪ সহীহ বুখারী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ৫১৮, হাদীস নং-১৩৬২।

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 174-177)

ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস

মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন*

ইসলাম অর্থ শান্তি। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষ ও জ্বীন জাতির জন্য সৃষ্টি করেছেন। যখন পৃথিবীর মধ্যে খুন খারাবী, হত্যা লুণ্ঠন, মারামারী, কাটা-কাটি বিপর্যয় ও বিশৃংখলা এক কথায় যখন সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেল ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রিয় হাবীব, আমাদের প্রিয় নেতা ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে প্রেরণ করেছেন দ্বীনি ইসলাম সহকারে, সাথে দিয়েছেন চলার পাথেয় হিসাবে মুক্তির দিশারী মহাগ্রন্থ আল কুরআন। যেন তিনি এই ইসলামের মাধ্যমে একটি সুন্দর পৃথিবী উপহার দিতে পারেন, যেখানে খুন, হত্যা, লুণ্ঠন, রাহাজানী ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড থাকবেনা। সবাই সেখানে ভাই ভাই ও বন্ধু হিসেবে অবস্থান করবে। কেউ কাউকে হত্যা করবেনা, কেউ কারো সম্পদ ছিনিয়ে নিবেনা, চুরি করবেনা, জেনা ব্যভিচার করবেনা। বরং সবাই একজন অপরজনের জান ও মাল, সম্পদ আব্রুর রক্ষক হয়ে যাবে। আর রাসুলে কারীম (সঃ) ও ঠিক এই ইসলামের মাধ্যমে একটি সুন্দর জাতি উপহার দিয়েছিলেন। তিনি যখন মদিনায় এসে কুরআনে কারীমের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করলেন, তখন মদিনার লোকগুলো সোনার মানুষে রুপান্তরিত হয়ে গেল। কেউ কাউকে হত্যা করেনা, কেউ কারো সম্পদ চুরি করেনা, কেউ যেনা ব্যাভিচার করেনা, সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেনা, তারা সবাই হয়ে গেল এক শান্তি প্রিয় জাতী। ইসলাম উপহার দিল এক সুন্দর পৃথিবী। কিন্তু ইয়াহুদীও খ্রিষ্টানরা এই মুসলিম জাতিকে সহ্য করতে পারেনা। তারা এই ইসলামকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলার জন্য অতীতে যেমন চেষ্টা করেছিল, বর্তমানেও তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তারা বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে তা ইসলাম তথা মুসলমানদের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। এবং এর মাধ্যমে ইসলামকে সন্ত্রাসী ধর্ম ও মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী জাতী বানানোর অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। এবং সন্ত্রাসের কথা বলে একের পর এক মুসলিম রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে যাচ্ছে। আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন ও ইরাকের উপর হামলা করে হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করেছে। মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ট দেশকে শেষ করে দিচ্ছে। তারই সুত্র ধরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ আমাদের এই প্রিয় বাংলাদেশকেও তারা টার্গেট করেছে। আর এই জন্য তারা বেছে নিয়েছে কিছু নাম ধারী মুসলমানকে। যারা বোমা মেরে মানুষ হত্যা করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলছে। মূলত তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়না, তারা চায় ইসলামকে এদেশের মাটি থেকে উৎখাত করে এটিকে একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করতে। তারা চায় তাদের এই চক্রান্ত সফল করে ইরাক, আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিনের মত আমাদের এই প্রিয় মাতৃভুমিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে। তাই আজ আমাদেরকে জানতে হবে ইসলাম সন্ত্রাসের ব্যাপারে কি বলে?

ফিতনা ও সন্ত্রাস সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টি :

ইসলামে ফিতনা, সন্ত্রাস বা বিশৃংখলা সৃষ্টি করাকে হত্যার চেয়েও জঘন্য বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে হাকীমে এসেছে ঃ الفتنة أشد من القتل ফিতনা বা বিপর্যয় বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়ে মারাত্মক।[১]

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেছেন ঃ

(الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ)

অর্থাৎ: যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করে, আর আল্লাহ যা যুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছে তা ছিন্ন করে আর জমিনে বিপর্যয়, বিশৃংখলা বা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তারা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তভূক্ত।[২]

অন্যেত্রে বলেছেন ঃ والله لايحب المفسدين অর্থাৎ ঃ আল্লাহ তা'য়ালা বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে পছন্দ করেন না বা ভালবাসেন না।

---

* ১ম সেমিষ্টার, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

ইসলামে হত্যার বিধান:

ইসলামের বিধানে বিনা কারণে কাউকে হত্যা করা সম্পূর্ণ রুপে হারাম করা হয়েছে। সন্ত্রাসী করে বা বোমা মেরে মানুষ হত্যা করা কবিরা গুনাহ। কারন জীবন মৃত্যুর মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার হাতে। এতে কোন মানুষের অধিকার নেই।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে করীমে হত্যার বিধান সম্পর্কে বলেছেন ঃ

(وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ)

অর্থাৎ: তোমরা যথার্থ বা ন্যায় সংগত কারণ ছাড়া কোন মানুষকে হত্যা করোনা।[৩]

হত্যার সংগত কারণ:

সংগত কারণে ফিকহের দৃষ্টিতে ৪টি কারনে মানুষকে হত্যা করা জায়েজ হতে পারে, তবে শর্ত হল তা কার্যকরী করতে পারবে একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রের ইসলামী সরকার। অর্থাৎ যে দেশে ইসলামী হুকুমত সম্পূর্ণ রূপে পালন করা হয়। ব্যাক্তিগত ভাবে বা দলীয় ভাবে এই হুকুম পালন করা যাবেনা। হত্যার সংগত কারণ গুলো হল ঃ

- কিসাস ঃ অর্থাৎ হত্যার অপরাধে হত্যা করা।
- বিবাহিত জেনাকারের শাস্তি।
- মুরতাদ বা ধর্ম ত্যাগীদের শাস্তি।
- যে ব্যাক্তি প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সরকারকে উৎখাতের চেষ্টা করবে তার শাস্তি।[৪]

উল্লেখিত কারণ সমুহ একমাত্র ইসলামী সরকারের নির্দেশে কার্যকর করা যাবে, অন্য কোন অবস্থাতে হত্যা করা জায়েজ নাই।

ইসলামে হত্যা বা সন্ত্রাসের শাস্তি:

সন্ত্রাসীদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতে ও পরকালে কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)

অর্থাৎ: যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা করে তাদের শাস্তি হল হত্যা করা ও শুলে চড়ানো অথবা বিপরীত দিক থেকে হাত ও পা কেটে ফেলা কিংবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা, এ অপমান জনক শাস্তি পৃথিবীর জন্য আর পরকালে রয়েছে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি।[৫]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে করীমে বলেছেন ঃ

(مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا)

অর্থাৎ : কেউ যদি কোন ব্যাক্তিকে হত্যা করে অথবা পৃথিবীতে সন্ত্রাসী কার্যক্রম বা বিশৃংখলা সৃষ্টি করে সে যেন সমস্ত মানব জাতিকে হত্যা করল।[৬]

অন্যত্র বলেছেন ঃ (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)

অর্থাৎ: যে ব্যাক্তি কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করবে তার শাস্তি হল জাহান্নাম যেখানে সে অনন্তকাল থাকবে, আর তার উপর আল্লাহ তা'য়ালার আযাব ও অভিশাপ এবং তার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে মহা শাস্তি।[৭]

আর রাসুলে কারীম (সঃ) হত্যা কারীদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ হত্যা কারীরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা।

হত্যা ও সন্ত্রাসকে রুখে দাড়াতে হবে:

হত্যার বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সকল শান্তিকামী মানুষকে প্রতিবাদী হতে হবে। নতুবা হত্যার জন্য আল্লাহর শাস্তি সকলকে পাকড়াও করবে। এ কাজটি করতে হবে সম্মিলিত ভাবে, হত্যাকারীর শাস্তি কার্যকর করা জরুরী।[৮]

রাসুলে কারীম (সঃ) বলেন:

عن أبي هريرة (رضـ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمْ اللَّهُ فِي النَّارِ

অর্থাৎ: হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সঃ) বলেন আসমান ও জমিনের সবাই যদি এক যোগে কোন মু'মিনকে হত্যা করে, আল্লাহ তা'য়ালা একজন নিরপরাধ মু'মিনের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সকলকে এক সাথে জাহান্নামের আগুনে জ্বালাবেন।[৯]

হত্যার অপরাধ সংগঠিত হওয়া এক বিপর্যয়ের বিষয়। সকল মানুষকে জাতি, ধর্ম, দল, মত ভাষা ও বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে হত্যাকারী ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে হবে। তাদের ভয়ংকর নীল নকশা গুড়িয়ে দিতে হবে। এ ব্যাপারে যারা অসহযোগী বা হত্যাকারীকে আড়ালকারী ও প্রকৃত দোষীদের বাদ দিয়ে নিরপরাধীকে দোষী বলে পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করবে তাদেরকেও হত্যাকারীদের কাতারে দাড় করানো ইসলামের দাবি।১০

নবী করীম (সঃ) হত্যার অপরাধ সম্পর্কে কঠোর ভাষায় বলেছেন ঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

অর্থাৎ: আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) রাসুল (সঃ) হতে বর্ণনা করেন, একজন নিরপরাধ মানুষ খুন করা সমগ্র দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার চেয়ে ভয়াবহ।[১০]

সমগ্র পৃথিবী ও ইহার সমস্ত উপায় উপকরণ একজন মানুষের জীবনের চেয়ে কম মূল্য বহন করে। যে মানুষকে আল্লাহ তায়ালা এ গোটা বিশ্বের খলীফা হিসেবে পাঠিয়েছেন, সেই সম্মানিত মানুষ খুন সহজ বিষয় নয়।

নবী করীম (সঃ) হত্যাকারীকে প্রতিরোধ করার নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

لا يَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ مَوْقِفًا يُقْتَلُ فِيهِ رَجُلٌ ظُلْمًا، فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَ حِينَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ

অর্থাৎ : কোন মানুষকে যেখানে অন্যায় ভাবে খুন করা হয়, যদি কেউ প্রতিরোধ না করে বা হত্যায় বাধা না দিলে সকলের উপর আল্লাহর গজব অবতীর্ণ হবে।[১১]

ইসলাম চাই শান্তি:

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেল ইসলাম কি চাই? ইসলাম চাই শান্তির এক পৃথিবী। জালেম কে তার জুলুম থেকে বাধা দেওয়া ও মজলুমকে জালেম থেকে রক্ষা করা।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا

অর্থাৎ: কেউ যদি কোন মানুষকে হত্যা থেকে রক্ষা করে বা বিপদ থেকে বাচিয়ে দেয়, সে যেন গোটা মানব জাতিকে বাচিয়ে দিল।[১২] অর্থাৎ তার আমল নামায় দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে বাচিয়ে দেওয়ার সওয়াব দান করা হবে।

হত্যা ও খুন থেকে পৃথিবীকে ও পৃথিবীর মানুষকে নিরাপত্তা দিতে এসেছিলেন মানবতার মুক্তির দুত হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। তিনি বিদায় হজ্বের গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ শুরু করেছিলেন এই বলে ঃ

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ : قال رسول الله (ص) دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ

অর্থাৎ : নবী করীম (সঃ) বিদায় হজ্বের বক্তব্যে বলেন ঃ সাবধান আমি সকল প্রকার জাহেলিয়াত ও বর্বরতাকে আমার পায়ের নিচে পিষ্ট করে যাচ্ছি। আজ থেকে জাহেলী যামানার মানুষ খুন করার বর্বরতাকে রহিত করে দিলাম। আমি সর্ব প্রথম আমার বংশের আমার নিজ চাচা হারেস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র রাবিয়ার রক্তের দাবী প্রত্যাহার করলাম। সে বনি লাইস গোত্রে দুগ্ধ পান করেছিল যাকে হুযাইল হত্যা করেছে।[১৩]

অতএব আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, বোমা মেরে বা সন্ত্রাসী করে মানুষ হত্যা করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যাবেনা, বরং তা করলে মানুষ ইসলাম থেকে দুরে সরে যাবে। ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবেনা। আর এই বোমা ও সন্ত্রাসের অজুহাত দিয়ে আমাদের প্রিয় দেশের উপর ইয়াহুদী খ্রিষ্টানেরা হামলা করে দেশকে আরো ধ্বংসের দিকে টেলে দিবে। আমাদেরকে দেখতে হবে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও সাহাবায়ে ইকরাম (রাঃ) দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সন্ত্রাসী করে করে নয় বরং প্রেম ও ভালবাসা দিয়ে। নবী (সঃ) ও সাহাবায়ে ইকরাম (রাঃ) দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অত্যাচারিত হয়েছেন, লাঞ্চিত হয়েছেন, কিন্তু তবুও তারা সন্ত্রাসের পথ বেঁচে নেয় নাই। বরং বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমাদেরকেও তাদের পথ অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক জ্ঞান উপলব্ধি করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

তথ্যসুত্র

১ আল কুরআন, সুরা বাকারা- ১৯১।
২ আল কুরআন, সুরা বাকারা- ২৭।
৩ আল কুরআন, সুরা বনি ইসরাঈল- ৩৩।
৪ অধ্যাপক মুফিজুর রহমান, বিশ্ব শান্তির রোড ম্যাপ, পৃ. ৯৬।
৫ আল কুরআন, সুরা মায়েদা- ৩৩।
৬ আল কুরআন, সুরা মায়েদা- ৩২।
৭ আল কুরআন, সুরা নিশা- ৯৩।
৮ অধ্যাপক মুফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।
৯ সূনান আত তিরমিযি, কিতাবুত দিয়াত, হাদীস নং- ১৩১৮।
১০ সূনান আত তিরমিযি, কিতাবুত দিয়াত, হাদীস নং- ১৩১৫।
১১ আল মু'জামুল কাবির লিত তাবরানি, খন্ড. ৯, পৃ. ৪৫৮।
১২ আল কুরআন, সুরা মায়েদা- ৩২।
১৩ সহীহ মুসলিম, কিতাবলি হাজ্জ, হাদীস নং- ২১৩৭।

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 178-182)

সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে বাংলাদেশঃ আমাদের করণীয়

মাহমুদুল হাছান *

ভূমিকা:

মানুষ তার নিজ সত্তাকে প্রকাশ করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম সংস্কৃতি করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল সংস্কৃতি। "সংস্কৃতি" শব্দটি মানুষের আত্মার সাথে সম্পৃক্ত একটি শব্দ। মানব জীবনের একটি বিকশিত ও পরিশীলিত রূপ। জীবন ধারার কাঠামো, বিস্তৃতি ও রূপ বৈচিত্রের বাইরে সংস্কৃতি ভিন্নকোন রূপ আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। সহজ কথায় সংস্কৃতি হচ্ছে তাই যা চিত্তের উৎকর্ষ সাধন করে মনকে প্রফুল্ল দেয়।

'সভ্যতার ক্রম বিকাশ ধারায় আমরা বর্তমানে 'ইলেকট্রনিক যুগ' অতিক্রম করছি, কিন্তু সাংস্কৃতিকভাবে আমরা পশ্চিমাদের প্রভাবে ব্যাপকভাবে পিছিয়ে আছি। আর তাই আমরা নতুন একটি যুদ্ধের সম্মুখীন হচ্ছি, (নতুন একটি ক্রুসেডের সম্মুখীন হচ্ছি) তা হচ্ছে সাংস্কৃতিক যুদ্ধ। এটিই এখন নতুন ক্রুসেড। আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি তাকাই তাহলে দেখবো সংস্কৃতির করাল গ্রাসে নিপতিত হচ্ছে আমাদের যুব সমাজ।

সংস্কৃতি কি?:

জার্মান শব্দ "Kultor" বা "Cultura" শব্দ থেকে Culture বা সংস্কৃতি কথার উৎপত্তি। 'সংস্কৃতি' শব্দটি ইংরেজী 'Culture' এর রূপান্তর Culture এর অর্থকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। Way of life বা জীবন পদ্ধতি, Art/Music Literature বা কলা/সঙ্গীত/ভাষা, যা কোন গোষ্ঠীর চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। Beliefs/Allitudes বা বিশ্বাস মনোভাব।

আর বাংলায় 'সংস্কৃতি' কথাটার উৎপত্তি সংস্কৃত শব্দ 'সংস্কার' থেকে। সংস্কার অর্থ বিশুদ্ধিকরণ। অর্থাৎ অনুশীলনলব্দ দেহ, মন, হৃদয় ও আত্মার উৎকর্ষ সাধনই কৃষ্টি কালচার বা সংস্কৃতি।

আর আরবীতে যাকে ثقافة বলা হয়। ইংরেজীতে যাকে Aggression বাংলায় বলে আগ্রাসন বলে। ইংরেজী Aggression এই শব্দটির বাংলায় অর্থ হচ্ছে বিনা উত্তেজনায় আক্রমন করা। অথবা অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ বা আক্রমন করা।

পরিভাষায় : সমাজ বিজ্ঞানী গোল্ড স্মীত বলেন–

'Culture is that patterned whole of responses, the more or lessconsistant unity that likes the diverse elements or living into a way of life.

E.B. Taylor সুন্দরভাবে বলেছেন–

Culture is that complex whole which is cluds knowledge. belief, art morals, law, customs, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.

সমাজ বিজ্ঞানী brown বলেছেন–

'Culture is a distinctive and universal characteristic of human society.

Maciver খুবই ছোট্ট কথায় কথাটি বুঝিয়েছেন–Culture is what we are.

আবুল মনছুর আহমদ 'বাংলাদেশ কালচার' গ্রন্থে বলেছেন- ব্যক্তির যেমন পার্সোনালিটি বা ব্যক্তিত্ব, সমষ্টি বা জাতির তেমনি কালচার বা সংস্কৃতি।

আরনাল্ড ম্যাথিউ বলেছেন– পৃথিবী সম্বন্ধে যা উৎকৃষ্ট বলা বা চিন্তা করা হবে তা জানাই 'সংস্কৃতি'।

---

* ১ম সেমিস্টার, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

ড. আহমদ শরীফের মতে– সংস্কৃতি হলো মানুষের অর্জিত আচরণ পরিশ্রুতি জীবন চেতনা। চিন্তায় কর্মে ও আচরণে জীবনের সুন্দর শোভন পরিশীলিত ও পরিমার্জিত অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি।

এ সকল সংজ্ঞায় স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে কোন সমাজ বা জাতির মনে কোন একটা ব্যাপারে Standard ব্যবহার বিধি, সার্বজনীন চরিত্র আচরণ বা আখলাকের রূপ পরিগ্রহ করলেই সেটাকে ঐ মানব গোষ্ঠীর কালচার বলা হয়ে থাকে। সংস্কৃতির সবচেয়ে সহজ সংজ্ঞা দিয়েছেন এইচ কে. লাস্কি – তিনি বলেন "Culture is that what we are" এতে প্রতীয়মান হয় যে ধর্মের সঙ্গে রয়েছে সংস্কৃতির গভীর সম্পর্কে। পন্ডিত জওহর লাল নেহেরু তার "Discovery of india" গ্রন্থে হিন্দু ধর্মকে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল প্রবাহ বলে বর্ণনা করেছেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মুসলিম দেশসমূহের জীবন প্রবাহে ইসলাম অনিবার্য তা স্বীকার করেছেন, তার ভাষায়– In some Muslim Lands here a deeps desire that state should is some fashio reflect the sprite of Islam" এসব দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামকে বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রাণপ্রবাহ বলে চিহ্নিত করা যায়।

কিন্তু আজ যারা এ দেশের সংস্কৃতির ইমারতের নির্মাতা রবীন্দ্রনাথ, শরৎ, কিংবা অন্য কাউকে বানাতে চায় এটা কি তাদের কোন অসৎ উদ্দেশ্য বা বিকৃত চিন্তার বহিঃপ্রকাশ নয় কি? রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান ও অবদানের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল কিন্তু তার আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতি নয়। আমরা দেখেছি ছায়ানটের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ওয়াহিদুল হকের মৃত্যুতে জানাযার পরিবর্তে রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে তার বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি যদি নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করেন তাহলে ব্যক্তি কেন ধর্মীয় আপত্তিও গ্রাহ্য। কিন্তু কিছু মিডিয়া এটিকে যেভাবে ফলোআপ করে তার এই হীন বিশ্বাসের প্রচার করলেন তা দেশেবাসীকে করেছে হতবাক ও বিস্মিত। শুধু তাই নয় এক শ্রেণীর মাথা বিকৃত স্থূল চিন্তার বুদ্ধিজীবীদের পরাধীন এ আহবানকেও আমরা প্রত্যাখ্যান করি। যারা বলেন আমাদের রবীন্দ্রনাথের চেতনা ও বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হতে হবে, গড়ে তুলতে হবে নিজেদের, অথচ কই আমরা তো ভারতের একজন হিন্দুর নাম শুনিনি যারা কবি নজরুল বা ফররুখের চেতনা এবং বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এটি হওয়া উচিত নয়, কেনই বা হবে? আমার সংস্কৃতিই আমার বিশ্বাসের প্রতিফলন। আর ঘরে যদি মুক্তবুদ্ধির চিন্তার নামে অন্য কারো প্রবেশাধিকার থাকে তাহলে নিজের অজান্তেই অস্থিত্বের সংকট দেখা দেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিনির্মাণে ধর্মের মূল উপাদান হচ্ছে ভাষা। সুতরাং বলা যায় জনগোষ্ঠী অতীত ধর্মীয় চেতনা, সামষ্টিক আচার-আচরণ, সামাজিক রীতিনীতি, আর্থিক ব্যবস্থা সবকিছু সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে।

স্বকীয় সংস্কৃতি হচ্ছে স্বাধীনতার রক্ষা কবচ। কোনো জাতিকে কমজোর করে পদানত রাখতে চাইলে আগে তার সংস্কৃতিকে দূষিত ও বিনষ্ট করতে হবে।

কেননা সংস্কৃতি জাতির প্রাণশক্তি আর এই প্রাণশক্তিই জাতিকে মাথা উচু করে দাঁড় করায়। মূলত একটি জাতি তার স্বাধীনতার জন্যই লড়াই করে, যে চেতনার বলে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সেই চেতনাকে ভোতা করে দেয়। একটি জাতি কতটা সফল হয়েছে তার নিরিখে তার সংস্কৃতি স্বাধীনতার পরিমাপ করা যায়। এদিক থেকে আমদের স্বাধীনতা অর্জনের এই দীর্ঘ কালকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, স্বাধীনতার পর থেকে এ দেশে সংস্কৃতির চেতনায় সুকৌশলে পাশ্চাত্য ভাবধারায় বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এ সংস্কৃতি বিভ্রান্তিও কর বলা চলে। আর একেই বলা হয় অপসংস্কৃতি। অপসংস্কৃতির সয়লাব আমাদের সুফল থেকে আড়াল করে দিক ভ্রান্তের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

এজন্যই আবুল মনসুর আহমদ বলেছেন– "রাজনৈতিক আগ্রাসনের চেয়ে সংস্কৃতির আগ্রাসন অধিক মারাত্মক" রাজনৈতিক আগ্রাসন হলে দেখা যায় হইচই, ডামাডোল আর সংস্কৃতির আগ্রাসন নিঃশেষ করে দেয়।

আমরা দেখেছি– সাংস্কৃতিক স্বকীয়তার অভাবে একটি স্বাধীন সিকিমকে পরিণত হতে হয় এক অঙ্গরাজ্যে। আগামী সংস্কৃতি হচ্ছে "A victory without war" বা অদৃশ্য যুদ্ধ। কিন্তু আজ দুঃখের বিষয় হলেও সত্য আজ আমার দেশের কিছু সাংস্কৃতিক কর্মী, ভাড়াটিয়া রাজনীতিবিদ ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা হচ্চেন এই অদৃশ্য যুদ্ধের সৈনিক।

আমাদের পরিচয় :

আমরা মুসলিম জাতি। ইসলামের আদর্শ বুকে ধারণ করেই আমাদের পথচলা। পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম মুসলমান ছিলেন। তার প্রদর্শিত ও প্রতিষ্ঠিত সমাজ বিধানের আলোকে সমাজ ও সভ্যতার একটি কল্যাণধার চালু হয়। কিন্তু শয়তানের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় মাঝে মাঝেই কিছু লোক প্রতারিত ও পরাজিত হয়। এসব বিভ্রান্ত লোকের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ নবী ও রাসুলগণকে প্রেরণ করেন। ঘোরতর অন্ধকারে নিমজ্জিত মানব

সমাজের মুক্তির জন্য আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মলাভ করেন। ৪০ বৎসর বয়সে ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে নবুয়ত লাভ করেন। মাত্র ২৩ বৎসরে তিনি মানব সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব সাধন করে একদল মানুষকে সোনার মানুষে পরিণত করেন।

বিগত প্রায় ১৫০০ বৎসরে পৃথিবী জ্ঞান- বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সাহিত্য, সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে সত্য কিন্তু তাঁর আনীত, প্রতিষ্ঠিত ও অনুসারীদের অনুসৃত নীতির আলোকে গড়ে ওঠা আলোকিত সমাজের কাছাকাছিও তারা দাঁড়াতে পারেনি। এই সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রই আমাদের পৃথক জাতিসত্তাদান করেছে। মনে রাখতে হবে শুধু আমরা একটি জাতি নই। আমরা জাগতিক জাতি। এথেন্সের পেরিক্লিয়াস যুগ, রোমের অগাস্টান যুগের মত, আমাদের সোনালী অতীত আছে, গৌরবময় ঐতিহ্য আছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমাদের পূর্ব পুরুষরাই পৃথিবীকে স্যভতার পথে এগিয়ে দিয়েছিল। রসায়ন শাস্ত্রের উদ্ভাবক মুসলমানরাই। মুসলমানরাই প্রথম পৃথিবীর মানচিত্র অংকনের সাফল্য অর্জন করে। কম্পাস যন্ত্র, পানির গভীরতা ও স্রোত মাপার যন্ত্র উদ্ভাবন করে মুসলমান বিজ্ঞনীরা। বন্দুক, কামান গোলাবারুদের উদ্ভাবক মুসলমানরা। চিনি তৈরী, কাগজ তৈরী, পানি জমিয়ে বরফ তৈরীর কৌশল উদ্ভাবন করে মুসলমানরাই। শুধু কি বিজ্ঞান চর্চা-স্থাপত্যে, সাহিত্যে, সংগীতে, চিত্রশিল্পেও মুসলমানদের অবদান আজও বিশ্বে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। স্থাপত্যে স্পেনের কর্ডোভা মসজিদ, আল হামরা প্রাসাদ, তাজমহল, ফতেপুর সিক্রির খাবগাহ বা স্বপ্নপুরী আজও বিশ্বের বিস্ময়। সাহিত্য রচনার আরব্য কবি মুতানাব্বি, ইবনে দুরাইদ থেকে শুরু করে পারস্যের সাদী, রুমী, হাফিজ, খৈয়াম, ফেরদৌসী, উপমহাদেশের ইকবাল, নজরুল, জসিমুদ্দীন, ফররুখ প্রমূখ কাব্য চর্চায় অমর অবদান রেখেছেন। সংগীত সাধনা ও গবেষণায় আব্বাসীয় শাসনকাল পৃথিবীর সঙ্গীত জগতে অমর অবদান রেখেছে। ছন্দবিদ্যার প্রথম পুস্তক রচনা করেন খলিল। খলিফা আবদুর রহমান কর্ডোভায় সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। আরব, ইরান ও পাক ভারত উপমহাদেশের সুরের মিশ্রণে ইসলামী ঐতিহ্যের অপূর্ব সুর সৃষ্টি করে খেয়ালগানের উদ্ভাবন করেন আমীর খসরু। তিনি খেয়ালগানের বহু রূপ সৃষ্টি করেছিলেন। আজও যা এই উপমাহদেশে সর্বাধিক জনপ্রিয়। সেতার ও তবল তিনিই উদ্ভাবন করেন। এছাড়াও মিঞা তানসেন, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান, ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, নজরুল, আব্বাসউদ্দিন, লালন, হাসান রাজা প্রমূখ সঙ্গীত শিল্পে বিশ্বজনীন অবদান রেখেগেছে। চিত্র শিল্পে মেসোপটেমীয়া, ইলখানী, তৈমরী, সাফাভী, বুখরা এবং মোঘল চিত্রকলাকে বাদ দিয়ে বিশ্বের চিত্রশিল্প অস্তিত্বহীন।

বিষয়বস্তুর সুষ্ঠরূপায়ন, অনুপাত, পরিপ্রোফিটের যথাযথ প্রয়োগ, নকশার প্রাধান্য, আলঙ্করিকলিপি বা ক্যালিগ্রাফি, সূক্ষ ছন্দে রেখা উজ্জ্বল ও বিভিন্ন রঙ এর সমাবেশে মুসলিম চিত্রকলাকে অনুকরণীয় বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

হযরত আবু বকর, হযরত ওসমান, হযরত আলী হায়দার, খালেদ, তারেক , মুসা বিন নাসির থেকে শুরু করে মুহাম্মদ বিন কাসিম, সিরাজ উদ্দৌলা, তিতুমীর, হাজী শরীয়াতুল্লাহ প্রমুখ অযুত সিংহ হৃদয় বীরদের রোমাঞ্চকর বীরত্ব গাথায় উত্তরাধিকারিত্ব রয়েছে আমাদের ইতিহাসে। এসব কিছুর প্রভাবে আমাদের সংস্কৃতি গড়ে উঠবে। এটাই আমাদের কাম্য।

বিগত ১৫০০ বৎসরের ইতিহাসে প্রায় ৮০০ বৎসর মুসলমানগণ পৃথিবী শাসন করে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সাহিত্য, সুবিচার, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও উন্নতি, সামাজিক নিরাপত্তা, রাজনৈতিক সাফল্যসহ মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে মুসলমানদের অর্জন ছিল ঈর্ষণীয়।

কিন্তু আজ প্রায় তিনশত বৎসর পর্যন্ত মুসলমানগণ তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, খিলাফত ও রাজদণ্ড হারিয়ে হতদরিদ্র অবস্থায় পৃথিবীর দিকে দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অর্ধ-পৃথিবীর শাসক মুসলমানগণ মাঝখানে প্রায় দুইশত বছর উপনিবেশিক শাসনের নিগড়ে বন্দী থেকে বিগত ৬০ বৎসর ধরে নয়া স্বাধীনতা ভোগ করছে। ৫৭ টি মুসলিম দেশ বিশ্বের দীর্ঘতম নিরবচ্ছিন্ন লাগোয়া ভূমির অধিকারী, তাদের রয়েছে ১২৫ কোটি জনসংখ্যা, ৫০ ভাগ খনিজ সম্পদ এবং প্রায় ৫০ ভাগ ধন সম্পদ।

আমাদের সবকিছু থাকার পরও কেন মাত্র ৩০ লক্ষ ইয়াহুদীর হাতে মুসলমানদের মার খেতে হচ্ছে এটি মুসলমানদের ভাবতে হবে। কেন আজ পৃথিবীতে সবচেয়ে সস্তা হয়ে গেছে মুসলমানদের রক্ত, সবচেয়ে নিগৃহীত জাতি মুসলমান এবং সবচেয়ে উপেক্ষিত বিষয় মুসলমানদের দাবীসমূহ?

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

বর্তমান প্রচার মাধ্যম গুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্য হল মুসলমানদের ইতিহাস শুধু অত্যাচার আর বিলাসিতার ইতিহাস। আজ ইসলাম বিরোধী প্রচার মাধ্যমগুলো একযোগে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছে, তাদের

বিরুদ্ধে প্রচারের ফলও ফলছে দ্রুত হারে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত এই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ যা প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কুরআনের আয়াত মুছে ফেলা হয়, সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের মুসলিম নাম বাদ দেয়া হয়। নজরুল ইসলাম কলেজের নাম পরিবর্তন করে করা হয় নজরুল কলেজ, জাহাঙ্গীর নগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম নাম বাদ দেয়া হয়। অথচ জগন্নাথ কলেজ, জগন্নাথ হল, হোমস, নটর ডেম কলেজ, হলিক্রস কলেজ, আনন্দমোহন কলেজ, সেন্ট গ্রেগরী কলেজ সবই তো রয়ে গেল অপরিবর্তিত। মুছেগেল শুধু ইসলাম ও ইসলামী ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত নামগুলো।

যে ভিজ্যুয়াল মিডিয়া জাতির ইতিহাস ঐতিহ্যকে দৃশ্যমান করে জাতির বুকে সাহস ও বল সঞ্চার করতে পারতো সেই ভিজ্যুয়াল মিডিয়ার সঙ্গে বৈরীতা করে সেগুলো আমরা বিরুদ্ধ শক্তির হাতে তুলে দিয়েছি। এই ভিজ্যুয়াল মিডিয়ায় অহরহ প্রচার করছে বৈদিক যুগের দেবী, মূর্তিপূজা, ধুপ, চন্দন এবং শিখার নামে অগ্নিপূজা ইত্যাদিই নাকি আমাদের সংস্কৃতির উৎস। তারা প্রচার করছে রবীন্দ্র সংগীত ইবাদত। দ্রৌপদীর মত তারা একাধিক সপতি পোশাকেই কালচারে পরিণত করতে চাইছে। জনগণ এসব গান নাটকই দেখছেন, ধর্মচ্যুত হচ্ছেন, ঈমান হারাচ্ছেন আর এই ভাবে খোদা বিমুখতার মহামারী ছড়িয়ে পড়ছে।

আমাদের দেশের একালের মুসলিম কবি লিখেছেন– মুয়াজ্জিনের ধ্বনি যে ক্যানভাসারের একটানা অলজ্জিত বেশ্যা বৃত্তি অলিতে গলিতে– মসজিদকে তিনি তুলনা করেছেন উলঙ্গ নারীর সাথে ।

মুসলিম সাহিত্যিক লিখেছেন– আমাদের আল্লাহর অংকতান তেমন সুবিধার ছিলনা, অংকে তিনি সামান্য কাঁচা, সম্পত্তি ভাগের যে আইন কুরআন শরীফে আছে সেখানে ভুল আছে।

মুসলিম নাট্যকার সংলাপ লিখেছেন– মোল্লারা সারাদেশে চেঁচামেচি করেও আজকাল আর আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। সবাই ওদের আল-খাল্লা আলগা করে ভেতরের ন্যাংটা চেহারাটা দেখে নিয়েছে।

পরাধীন যুগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায় লিখেছেন– ঢাকাতে দুই চারিদিন বাস করিলেই তিনটি বস্তু দর্শক নয়ন পথের পথিক হইতে হইবে–কাক–কুকুর এবং মুসলমান। এই তিনটি সমানভাবে কলহপ্রিয়, অতিদূর্দম, অজেয়। (বঙ্গদর্শন, ১২২৭ অগ্রাহায়ণ)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন– কিছুদিন হইল একদল ইতর শ্রেণীর অবিবেচক মুসলমান কলিকাতার রাজপথে লোষ্ট্রখন্ড হস্তে উপদ্রবের চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার মধ্যে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে উপদ্রবের লক্ষটা বিশেষ রূপে ইংরেজদের প্রতি। (রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী ১০ খন্ড)

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই ৮৫ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এই বাংলাদেশে তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে মুসলমানদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতির শিকড় উপড়ে ফেলার ষড়যন্ত্র চলে আসছে। দেশ ভাগ হয়ে মাঝখানে প্রাচীর সৃষ্টি হওয়ার সে প্রয়াস কিছুদিন স্তিমিত হয়ে পড়েছিল মাত্র।

আজ আবার সেই চক্রান্ত শুরু হয়েছে। দেশীয় কিছু বুদ্ধিজীবির মন মগজ ক্রয় করে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতার প্রচার চালিয়ে তারা মুসলমানদের ধর্মহীনতার পথে ফেলে দিচ্ছে। তাদের প্রচার লক্ষ্য ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে হিন্দু কিংবা খ্রিস্টান থাকা যাবে। কিন্তু মুসলমান 'নৈব, টনৈবচ'। মুসলমান হওয়া মানেই মৌলবাদী হওয়া, সাম্প্রদায়িক হওয়া।

সংস্কৃতি একটা জাতির পরিচয়ের পতাকা। সংস্কৃতির রং বদল করে জাতীয় পতাকার রংও বদল করে ফেলা যায়। আজকের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দেশ জয় করে দেশ শাসন করতে চায় না। তারা জাতীয় সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রন করে দেশ নিয়ন্ত্রন করাকে সহজ মনে করে। বাংলাদেশের আকাশ বিমান হামলা থেকে আপাত মুক্ত মনে হলেও, ডিস এ্যান্টেনার হামলা থেকে মুক্ত নয়। প্রতিদিন ক্যাবল টিভি, ডিশ এ্যান্টেনা, ইন্টারনেটের মাধ্যমে আকাশ পথ থেকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে বহুনারী উপগত ভারতীয় পৌরাণিক সংস্কৃতি এবং নৈতিকতা বিবর্জিত মার্কিন ইউরোপীয় ভোগবাদী সংস্কৃতির ঝাঁকে ঝাঁকে মিসাইল। এই মিসাইল আমাদের মাটিতে আঘাত না হানলে ও কেড়ে নিচ্ছে আমাদের নৈতিকতা। নারীদেহকে পণ্য হিসাবে উপস্থাপন করছে। ২৮ দিনে রং ফর্সাকারী ক্রিমের বিজ্ঞাপনের নামে দেখানো হচ্ছে নারীর দেহের সংবেদনশীল অংশকেই। 'ডানা মেলো রূপের আকাশে, উড়ে চলো সুপারস্টারের স্বপ্নরাজ্যে', আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন নিয়ে এলো লাক্স-চ্যানেল আই সুপার স্টার" – এ সকল বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে একটি চ্যানেল সুপার স্টার খোঁজার নামে নারীর দেহ প্রদর্শনীকে উসকে দিচ্ছে। জেন্ডার ইন মিডিয়া ফোরামের সভাপতি সেলিনা হোসেন এক মতবিনিময় সভায় বলেছেন–

ص٣٢- والقرآن، فمجموع ملاحظات كان تلاميذه يدونونها بينما كان هو يتكلم وقد أمر محمد أتباعه أن يحملوا العلم كله على الإسلام بالسيف إذا اقتضت الضرورة.

ص (٨٠-٨١)- أن محمداً مؤسس دين المسلمين، قد أمر أتباعه أن يخضعوا العالم وأن يبدلوا جميع الأديان بدينه هو، ما أعظم الفرق بين هؤلاء الوثنيين وبين النصارى، إن هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوة وقالوا للناس: " أسلموا أو تموتوا" بينما أتباع المسيح ربحوا النفوس ببرهم وإحسانهم"(٤).

ج- إنشاء المدارس:

لما نزل المبشرون الأمريكيون من البوتستانت في سورية منذ حوالي عام ١٨٢٠م كانت الفكرة التي تراودهم منذ ذلك الحين أن يبشروا عن طريق التعليم ومع كثرة المنافسة بين فرق المبشرين المختلفة في التعليم وغيرها فإن هذه الفرق اتفقت كلها على المسلمين، ففي عام ١٩١٢م كان في سورية كلها ثمان وثلاثون مؤسسة تبشيرية (تنصيرية) مابين انكليزية وألمانية ودنماركية وأمريكية.

وقد كانت هذه المؤسسات مع تضارب سياستها ومع كل ما بينها من التنافس متفقة على وضع التوراة في العربية بين أيدي الطلاب على أنه كتاب تدريس أساسي، ولقد اتفقت المؤتمرات المحلية التي عقدت عام ١٩٢٤م في القدس وقسطنطينية وفي بغداد على التعاون بين المبشرين كلهم للوصول إلى أهدافهم في العالم الإسلامي والتبشير من طريق التعليم مقصود به المسلمون خاصة.ولقد استطاع المبشرون أن يبعثوا كثيراً من العداوة بين الطلاب حينما اتبعوا سياسة يقضي باستخدام الطلاب النصارى في مدارسهم وسطاء إلى التبشير بين الطلاب المسلمين كما حدث في مصر.

إن المدارس الأجنبية كانت تجبر جميع طلابها على دخول كنيسة المدرسة مرة كل يوم، ولا تزال مدارس الإرساليات الفرنسية تفعل ذلك إلى يومنا هذا أو أنها ظلت تفعل ذلك إلى زمن قريب على الأقل، وهناك بعض المدارس التبشيرية في بعض البلدان الإسلامية:

في القاهرة:

كانت أول مدرسة خاصة من هذا النوع قد أسست في عام ١٨٢٨م في حي (بولاق) وهي (مدرسة الأمريكان الابتدائية)، وافتتحت الإرسالية الأمريكية أول مدرسة للبنين في القاهرة عام ١٨٥٤م بواسطة المنصران (بارنيت وماكينج) بمساعدة مصري يدعى (عوض حنا)، وتوجهت الإرسالية الأمريكية جهودها التنصيرية بإنشاء

الجامعة الأمريكية في عام ١٩١٩م على غرار(كلية روبرت) بالقسطنطينية بسبب وجود الأزهر بها وعلى حد قول واطسون: " إن شهادة منه بين العرب توازي شهادة الدكتوراة من أكسفورد أو باريس أو هارفارد في العالم الغربي"(٥).

في البحرين:

كانت أول مدرسة للتعليم الحديث على النظام الغربي هي التي أقامتها الإرسالية سنة ١٨٩٢ م واتي افتتحتها السيدة س.زويمر وكانت هذه المدرسة هي الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي وليس في البحرين وحدها"(٦).

في مسقط:

في عام ١٨٩٦م افتتح القس دينز زويمر مدرسة للبنين هناك، وسميت هذه المدرسة باسم"مدرسة الرقيق المحرر" ذلك أنها أسست في البداية لتعليم أطفال العبيد.(٧)

هذا والله تعالى أعلى وأعلم ونسبة العلم إليه أولى وأسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المصادر والمراجع

١- د.خالد محمد نعيم، **الجذور التاريخية لإرساليات التنصير في مصر**، ط١، ١٩٨٨م، كتاب المختار، ص٥٠.

٢- د. عبد المالك خلف التميمي، **التبشير في منطقة الخليج العربي**، ط١، ١٩٨٢، شركة كاظمة للنشر الكويت، ص١٥٩.

٣- المنسينور كولي، **البحث عن الدين الحقيقي**، ط١٩٢٨، اتحاد مؤسسات التعليم باريس،ص٢٢٠

4._Research de ia vraie religion (cf bibliography)

٥- د.خالد محمد نعيم، **الجذور التاريخية لإرساليات التنصير في مصر**، ص٨٢.

٦- مصطفى خالدي, وعمر فروخ، **التبشير والاستعمار في البلاد العربية**، ط٥، ١٩٧٣م، المكتبة العصرية بيروت، ص١٧٤.

٧- د.عبد المالك خلف التميمي، **التبشير في منطقة الخليج العربي**، ص١٧٧.

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 207-216)

فن الغناء والموسيقى في نظر الفقه الإسلامي

– محمد أبو الكلام*

المقدمة:

الحمد لله الذي خلقنا وعلمنا بالقلم ما لم نعلم، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد –صلى الله عليه وسلم– الذي كان سيد الدعاة، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن مما يحزن المسلم الغيور على دينه أن يبحث بعض المسلمين عن السعادة في غيره، ويبحثون عن البهجة فيما عداه، يضعون السموم مواضع الدواء، طالبين العافية والشفاء في الشهوات والأهواء. ومن ذلك عكوف كثير من الناس اليوم على استماع آلات الملاهي والغناء، حتى صار ذلك سلواهم وديدنهم، متعللين بعلل واهية وأقوال زائفة، تبيح الغناء وليس لها مستند صحيح، يقوم على ترويجها قوم فتنوا باتباع الشهوات واستماع المغنيات. وكما نرى بعضهم يروج للموسيقى بأنها ترقق القلوب والشعور، وتنمي العاطفة، وهذا ليس صحيحا، فهي مثيرة للشهوات والأهواء، ولو كانت تفعل ما قالوا لرققت قلوب الموسيقيين وهذبت أخلاقهم، وأكثرهم ممن نعلم انحرافهم وسوء سلوكهم. وهذه المقالة هي محاولة أردت بها خدمة دين الله عز وجل، ومنفعة المسلمين، سائلا الله تبارك وتعالى أن ينفع بها وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وهو حسبنا و نعم الوكيل.

المراد بالغناء:

نبدأ هنا بفائدة لغوية، وهي: بيان معنى الغناء في لغة العرب. قال في القاموس وشرحه: الغناء –ككساء– من الصوت ما طرب به. وفي النهاية: هو رفع الصوت وموالاته.

وقال أبو سليمان رحمه الله تعالى: كل من رفع صوته بشيء ووالى به مرة بعد أخرى فهو غناء عند العرب، وأكثره فيما شاق من ضرب، أو شجا من نغمة ولحن، فلذلك قيل: غنت الحمامة وتغنى الطائر.[1]

وقال زين الدين الرازي في كتابه **مختار الصحاح**، "الأُغْنِيَّة كالأُحْجِيَّة، الغِناءُ جمعه الأغاني، تقول منه تَغَنَّى وغَنَّى بمعنًى واحد"[2]

---

* الأستاذ المساعد، قسم الدعوة والدراسات الإسلامية، الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ.

المراد بالموسيقى: الموسيقى (أو "الموسيقا")، هي فن مألفة الأصوات و السكوت عبر فترة زمنية. خصائص الصوت التي تصف الموسيقى هي طبقة الصوت (pitch–تشمل اللحن والتجانس الهارموني)، الإيقاع (بما فيه الميزان)، الجودة الصوتية لكل من جرس النغمة (timbre)، الزخرفة (articulation) ، الحيوية (dynamics)، والعذوبة (texture).

يعتقد علماء تاريخ الحياة الموسيقية بأن كلمة الموسيقى يونانية الأصل وقد كانت تعني سابقا الفنون عموما غير أن أصبحت فيما بعد تطلق على لغة الألحان فقط وقد عرفت لفظة موسيقى بأنها فن الألحان وهي صناعة يبحث فيها عن تنظيم الأنغام و العلاقات فيما بينها و عن الإيقاعات و أوزانها و الموسيقى هو فن يبحث عن طبيعة الأنغام من حيث الاتفاق و التنافر.[٣]

الأصل في الأشياء الإباحة:

قرر علماء الإسلام أن الأصل في الأشياء الإباحة لقوله تعالى: (هوَ الَذِي خَلَقَ لَكم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) (البقرة: 29) ، و لا تحريم إلا بنص صحيح صريح من كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله –صلى الله عليه و آله و سلم – أو إجماع ثابت متيقن ، فإذا لم يرد نص ولا إجماع . أو ورد نص صريح غير صحيح ، أو صحيح غير صريح ، بتحريم شيء من الأشياء ، لم يؤثر ذلك في حله ، و بقي في دائرة العفو الواسعة ، قال تعالى : (وَقَد فَصَلَ لَكم مَا حَرَمَ عَلَيْكمُ إِلَا مَا اضْطرِرْتمُ إِلَيْهِ)، (الأنعام: ١١٩) . و قال رسول الله صلي الله عليه و سلم : (ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، و ما حرم فهو حرام ، و ما سكت عنه فهو عفو ، فأقبلوا من الله عافيته ، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً)، و تلا : (وَ مَا كَانَ رَبكَ نَسِيَاً)،(سورة مريم: ٦٤).

و قال : إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدوداً فلا تعتدوها ، و سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها .

وإذا كانت هذه هي القاعدة ، فما هي النصوص و الأدلة التي استند إليها القائلون بتحريم الغناء، و ما موقف المجيزين منها ؟

أدلة المحرمين للغناء:

أ– استدل المحرمون بما روى عن ابن مسعود وابن عباس وبعض التابعين: أنهم حرموا الغناء محتجين بقول الله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم

عذاب مهين) (سورة لقمان: ٦) وفسروا لَهْو الحديث بالغناء[٤]، وأقسم ابن مسعود رضي الله عنه على ذلك فقال: هو —والله— الغناء[٥].

ب- واستدلوا بقوله تعالى في مدح المؤمنين: (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه)، (سورة القصص: ٥٥) والغناء من اللغو فوجب الإعراض عنه.

ويجاب بأن الظاهر من الآية أن اللغو: سفه القول من السب والشتم ونحو ذلك، وبقية الآية تنطق بذلك. قال تعالى: (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) (سورة القصص: ٥٥)، فهي شبيهة بقوله تعالى في وصف عباد الرحمن: (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) (سورة الفرقان: ٦٣).

ولو سلمنا أن اللغو في الآية يشمل الغناء لوجدنا الآية تستحب الإعراض عن سماعه وتمدحه، وليس فيها ما يوجب ذلك.

ج- واستدلوا أيضاً للغناء بآية أخرى، وهي قوله تعالى في سورة الفرقان، وفي وصف عباد الرحمن (والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما)سورة الفرقان: ٧٢. فقد جاء عن بعض السلف تفسير (الزور) بأنه الغناء. وقال محمد بن الحنفية: الزور هنا: الغناء واللهو. وكذلك روى عن الحسن ومجاهد وأبى الجحاف. وتسمية الغناء زورا تدل على حرمته. وقال الكلبي: لا يحضرون مجالس الباطل[٦].قال الإمام الغزالي: (إذا كان ذكر اسم الله تعالى على الشيء على طريق القسم من غير عقد عليه ولا تصميم، والمخالفة فيه، مع أنه لا فائدة فيه، لا يؤاخذ به، فكيف يؤاخذ بالشعر والرقص[٧]؟

د- واستدلوا بالحديث أيضا: " حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةً الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَالْمُمِدَّ بِهِ وَقَالَ ارْمُوا وَارْكَبُوا وَلَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا كُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنْ الْحَقِّ[٨]

وأجاب المجوزون بضعف الحديث، ولو صح لما كان فيه حجة، فإن قوله: "فهو باطل" لا يدل على التحريم بل يدل على عدم الفائدة. فقد ورد عن أبي الدرداء قوله: إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل ليكون أقوى لها على الحق. على أن الحصر في الثلاثة غير مراد، فإن التلهي بالنظر إلى الحبشة وهم يرقصون في المسجد

النبوي خارج عن تلك الأمور الثلاثة، وقد ثبت في الصحيح. ولاشك أن التفرج في البساتين وسماع أصوات الطيور، وأنواع المداعبات مما يلهو به الرجل، لا يحرم عليه شئ منها، وإن جاز وصفه بأنه باطل[٩].

هـ- واستدلوا بالحديث الذي رواه البخاري ـ معلقا ـ عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعرى ـ شك من الرواي ـ عن النبي عليه السلام قال: " لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمْ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"[١٠]. والمعازف: الملاهي، أو آلات العزف.

والحديث وإن كان في الصحيح البخاري، إلا أنه من "المعلقات" لا من "المسندات المتصلة" ولذلك رده ابن حزم لانقطاع سنده، ومع التعليق فقد قالوا: إن سنده ومتنه لم يسلما من الاضطراب، فسنده يدور على (هشام بن عمار) وقد ضعفه الكثيرون.

ورغم ما في ثبوته من الكلام، ففي دلالته كلام آخر؛ إذ هو غير صريح في إفادة حرمة "المعازف" فكلمة "يستحلون" ـ كما ذكر ابن العربي ـ لها معنيان: أحدهما: يعتقدون أن ذلك حلال، والثاني: أن يكون مجازاً عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور، إذ لو كان المقصود بالاستحلال: المعنى الحقيقي، لكان كفراً.

ولو سلمنا بدلالتها على الحرمة لكان المعقول أن يستفاد منها تحريم المجموع، لا كل فرد منها، فإن الحديث في الواقع ينعى على أخلاق طائفة من الناس انغمسوا في الترف والليالي الحمراء وشرب الخمور. فهم بين خمر ونساء، ولهو وغناء، وخزّ وحرير، ولذا روى ابن ماجه هذا الحديث عن أبي مالك الأشعري بلفظ: "ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير"[١١].

و- واستدلوا بحديث ابن عمر بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزْرَ وَالْكُوبَةَ وَالْقِنِّينَ وَزَادَنِي صَلَاةَ الْوَتْرِ قَالَ يَزِيدُ الْقِنِّينُ الْبَرَابِطُ"[١٢]. وفسرت الكوبة بالطبل، والغبيراء بالطنبور أو العود أو البربط من الآلات الموسيقية.[١٣]

ز- واستدلوا أيضاً بما روي : حدثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا سلام بن مسكين عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة فجعلوا يلعبون يتلعبون يغنون فحل أبو وائل حبوته وقال سمعت عبد الله يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول " إن الغناء ينبت النفاق في القلب " قال الشيخ الألباني : ضعيف[١٤] ولم يثبت هذا حديثاً عن النبي- صلى الله عليه وآله و سلم- و إنما ثبت قولاً لبعض الصحابة أو التابعين، وقد رواه

البيهقي عن ابن مسعود موقوفا[١٥]. فهو رأي لغير معصوم خالفه فيه غيره . فمن الناس من قال — وبخاصة الصوفية : ـ إن الغناء يرقق القلب ، ويبعث الحزن والندم علي المعصية ، و يهيج الشوق إلى الله تعالى ، و لهذا اتخذوه وسيلة لتجديد نفوسهم ، و تنشيط عزائمهم، و إثارة أشواقهم. قالوا: و هذا أمر لا يعرف إلا بالذوق و التجربة و الممارسة ، و من ذاق عرف ، و ليس الخبر كالعيان !

على أن الإمام الغزالي جعل حكم هذه الكلمة بالنسبة للمغني لا للسامع ، إذ كان غرض المغني أن يعرض نفسه على غيره ، و يروج صوته عليه ، و لا يزال ينافق ويتودد إلى الناس ليرغبوا في غنائه . و مع هذا قال الغزالي: وذلك لا يوجب تحريماً ، فإن لبس الثياب الجميلة، و ركوب الخيل المهملة، و سائر أنواع الزينة، و لا يطلق القول بتحريم ذلك كله، فليس السبب في ظهور النفاق في القلب: المعاصي، بل إن المباحات، التي هي مواقع نظر الخلق أكثر تأثيراً) [١٦].

أدلة المجيزين للغناء:

تلك هي أدلة المحرمين، وقد سقطت واحداً بعد الآخر، ولم يقف دليل منها على قدميه، وإذا انتفت أدلة التحريم بقى حكم الغناء على أصل الإباحة بلا شك، ولو لم يكن معنا نص أو دليل واحد على ذلك غير سقوط أدلة التحريم، فكيف ومعنا نصوص الإسلام الصحيحة الصريحة، وروحه السمحة، وقواعده العامة، ومبادئه الكلية؟ وهناك بيانها:

أولا: من حيث النصوص:

استدلوا بعدد من الأحاديث الصحيحة، منها: حديث غناء الجاريتين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، وانتهار أبي بكر لهما، وقوله: مزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنهما لم تكونا صغيرتين كما زعم بعضهم، فلو صح ذلك لم تستحقا غضب أبي بكر إلى هذا الحد.

وقد روى البخاري وأحمد عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ"[١٧].

وروى النسائي والحاكم وصححه عن عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس، وإذا جوار يغنين. فقلت: أي صاحَبْى رسول الله أهلَ بدر يفعل هذا عندكم؟! فقالا: اجلس إن شئت فاستمع معنا، وإن شئت فاذهب، فإنه قد رخص لنا اللهو عند العرس.

وروى ابن حزم بسنده عن ابن سيرين: أن رجلا قدم المدينة بجوارٍ فأتى عبد الله بن جعفر فعرضهن عليه، فأمر جارية منهن فغنت، وابن عمر يسمع، فاشتراها ابن جعفر بعد مساومة، ثم جاء الرجل إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، غبنت بسبعمائة درهم! فأتى ابن عمر إلى عبد الله بن جعفر فقال له: إنه غبن بسبعمائة درهم، فإما أن تعطيها إياه، وإما أن ترد عليه بيعه، فقال: بل نعطيه إياها. قال ابن حزم: فهذا ابن عمر قد سمع الغناء وسعى في بيع المغنية، وهذا إسناد صحيح لا تلك الأسانيد الملفقة الموضوعة.

واستدلوا بقوله تعالى: (وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خيرٌ من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين)،(سورة الجمعة: ١١).

فقرن اللهو بالتجارة، ولم يذمهما إلا من حيث شغل الصحابة بهما ـ بمناسبة قدوم القافلة وضرب الدفوف فرحا بها ـ عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وتركه قائما.

واستدلوا بما جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم باشروا السماع بالفعل أو أقروه. وهم القوم يقتدي بهم فيهتدي[١٨].

ثانياً: من حيث روح الإسلام وقواعده:

أ- لا شئ في الغناء إلا أنه من طيبات الدنيا التي تستلذها الأنفس، وتستطيبها العقول، وتستحسنها الفطر، وتشتهيها الأسماع، فهو لذة الأذن، كما أن الطعام الهنيء، لذة المعدة، والمنظر الجميل لذة العين، والرائحة الذكية لذة الشم...الخ، فهل الطيبات أي المستلذات حرام في الإسلام أم حلال؟

من المعروف أن الله تعالى كان قد حرم على بني إسرائيل بعض طيبات الدنيا عقوبة لهم على سوء ما صنعوا، كما قال تعالى: (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل) (سورة النساء: ١٦٠-١٦١)، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم جعل عنوان رسالته في كتب الأولين (الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) (سورة الأعراف: ١٥٧).

فلم يبق في الإسلام شئ طيب أي تستطيبه الأنفس والعقول السليمة إلا أحله الله، رحمة بهذه الأمة لعموم رسالتها وخلودها. قال تعالى: (يسألونك ماذا أحل الله لهم قل أحل لكم الطيبات) (سورة المائدة: ٤).

ب- ولو تأملنا لوجدنا أن الغناء والطرب للصوت الحسن يكاد غريزة إنسانية وفطرة بشرية، حتى إننا لنشاهد الصبي الرضيع في مهده يسكته الصوت الطيب عن بكائه، وتنصرف نفسه عما يبكيه إلى الإصغاء إليه ولذا تعودت الأمهات والمرضعات والمربيات الغناء للأطفال منذ زمن قديم، بل نقول: إن الطيور والبهائم تتأثر بحسن الصوت والنغمات الموزونة حتى قال الغزالي في الإحياء: (من لم يحركه السماع فهو ناقص مائل عن الاعتدال، بعيد عن الروحانية، زائد في غلظ الطبع وكثافته على الجمال والطيور وجميع البهائم، إذ الجمل مع بلادة طبعه يتأثر بالحداء تأثراً يستخف معه الأحمال الثقيلة، ويستقصر ـ لقوة نشاطه في سماعه ـ المسافات الطويلة، وينبعث فيه من النشاط ما يسكره ويولهه. فنرى الإبل إذا سمعت الحادي تمد أعناقها، وتصغي إليه ناصبة آذانها، وتسرع في سيرها، حتى تتزعزع عليها أحمالها ومحاملها).

وإذا كان حب الغناء غريزة وفطرة فهل جاء الدين لمحاربة الغرائز والفطر والتنكيل بها؟ كلا، إنما جاء لتهذيبها والسمو بها، وتوجيهها التوجيه القويم، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن الأنبياء قد بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتبديلها وتغييرها.

ومصداق ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: "ما هذان اليومان؟" قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية: فقال عليه السلام: " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ[١٩].

تلك هي الأدلة المبيحة للغناء من نصوص الإسلام وقواعده، فيها الكفاية كل الكفاية ولو لم يقل بموجبها قائل، ولم يذهب إلى ذلك فقيه، فكيف وقد قال بموجبها الكثيرون من صحابة وتابعين وأتباع وفقهاء؟

وحسبنا أن أهل المدينة ـ على ورعهم ـ والظاهرية ـ على حرفيتهم وتمسكهم بظواهر النصوص ـ والصوفية ـ على تشددهم وأخذهم بالعزائم دون الرخص ـ روى عنهم إباحة الغناء.

قال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار": (ذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر، وجماعة الصوفية، إلى الترخيص في الغناء، ولو مع العود واليراع. وحكى الأستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفه في السماع: أن عبد الله بن جعفر كان لا يرى بالغناء بأساً، ويصوغ الألحان لجواريه، ويسمعها منهن على أوتاره. وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه.

وروى صاحب "العقد" العلامة الأديب أبو عمر الأندلسي: أن عبد الله بن عمر دخل على ابن جعفر فوجد عنده جارية في حجرها عود، ثم قال لابن عمر: هل ترى بذلك بأساً؟ قال: لا بأس بهذا، وحكى الماوردي عن

معاوية وعمرو بن العاص: أنهما سمعا العود عند ابن جعفر، وروى أبو الفرج الأصبهاني: أن حسان بن ثابت سمع من عزة الميلاء الغناء بالمزهر بشعر من شعره.

ومعروف كذلك أن نساء يثرب وأطفالها كانوا قد استقبلوا الرسول (صلى الله عليه وسلم) عند وصوله المدينة المنورة يوم الهجرة بالدفوف والطبول وهم يغنون ترحيباً به قائلين:

طلع البدر علينا ٠٠ من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ٠٠ ما دعا لله داع

أيها المبعوث فينا ٠٠ جئت بالأمر المطاع

جئت شرفت المدينة ٠٠ مرحباً يا خير داع.

هؤلاء جميعاً قالوا بتحليل السماع مع آلة من الآلآت المعروفة ـ أي آلات موسيقى ـ وأما مجرد الغناء من غير آلة فقال الأدفوى في الإمتاع: إن الغزالي في بعض تأليفه الفقهية نقل الاتفاق على حله، ونقل ابن طاهر إجماع الصحابة والتابعين عليه، ونقل التاج الفزاري وابن قتيبة إجماع أهل الحرمين عليه، ونقل ابن طاهر وابن قتيبة أيضاً إجماع أهل المدينة عليه، وقال الماوردي: لم يزل أهل الحجاز يرخصون فيه في أفضل أيام السنة المأمور فيها بالعبادة والذكر. وقال ابن النحوي في العمدة: وقد روى الغناء وسماعه عن جماعة من الصحابة والتابعين، فمن الصحابة عمر ـ كما رواه ابن عبد البر وغيره ـ وعثمان ـ كما نقله الماوردي وصاحب البيان والرافعي ـ وعبد الرحمن بن عوف ـ كما رواه ابن أبي شيبة ـ وأبو عبيدة بن الجراح ـ كما أخرجه البيهقي ـ وسعد بن أبي وقاص ـ كما أخرجه بن قتيبة ـ وأبو مسعود الأنصاري ـ كما أخرجه البيهقي ـ وبلال وعبد الله بن الأرقم وأسامة بن زيد ـ كما أخرجه البيهقي أيضاً ـ وحمزة كما في الصحيح ـ وابن عمر ـ كما أخرجه ابن طاهر ـ والبراء بن مالك ـ كما أخرجه أبو نعيم ـ وعبد الله بن جعفر ـ كما رواه ابن عبد البر ـ وعبد الله بن الزبير ـ كما نقل أبو طالب المكي ـ وحسان كما رواه أبو الفرج الأصبهاني ـ وعبد الله بن عمرو ـ كما رواه الزبير بن بكار.

وأما التابعون فسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر وابن حسان وخارجة بن زيد وشريح القاضي وسعيد بن جبير وعامر الشعبي وعبد الله بن أبي عتيق وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن شهاب الزهري وعمر بن عبد العزيز وسعد بن إبراهيم الزهري.

وأما تابعوهم فخلق لا يحصون منهم الأئمة الأربعة وابن عيينة وجمهور (الشافعية). انتهى كلام ابن النحوي.[٢٠]

قيود وشروط لا بد من مراعاتها:

ولا ننسى أن نضيف إلى هذه الفتوى قيوداً لا بد من مراعاتها في سماع الغناء.

١- فقد أشرنا في أول البحث إلى أنه ليس كل غناء مباحاً، فلا بد أن يكون موضوعه متفقا مع أدب الإسلام وتعاليمه.

٢- ثم إن طريقة الأداء لها أهميتها، فقد يكون الموضوع لا بأس به ولا غبار عليه، ولكن طريقة المغني أو المغنية في أدائه بالتكسر في القول، وتعمد الإثارة، والقصد إلى إيقاظ الغرائز الهاجعة، وإغراء القلوب المريضة ـ ينقل الأغنية من دائرة الإباحة إلى دائرة الحرمة أو الشبهة أو الكراهة من مثل ما يذاع على الناس ويطلبه المستمعون والمستمعات من الأغاني التي تلح على جانب واحد، هو جانب الغريزة الجنسية.

الخاتمة:

أخيرا نحن نقول بأن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم كنبي ورسول وداعي إلى الله، وكان رسالته في كتب أهل الكتاب أنه (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم)، (الأعراف: ٥٧). فلا حرام في الإسلام إذن إلا الخبيث الضار، سواء كان خبثه أو ضره ماديا أم معنويا فرديا أم اجتماعيا، حالا أم استقبالا. ولا شيء في الغناء إلا أنه من طيبات الدنيا التي تستلذها الأنفس، وتستطيبها العقول، وتستحسنها الفطر، وتشتهيها الأسماع، فهو لذة الأذن، كما أن الطعام الهنئ لذة المعدة، والمنظر الجميل لذة العين، والرائحة الذكية لذة الشم...الخ، فهل الطيبات — المستلذات— حرام أم حلال؟ وأسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به النفع العميم، إنه جواد كريم.

المراجع:

١. القرضاوي، دكتور يوسف، **فقه الغناء والموسيقى في ضوء القرآن والسنة**، ط١، (القاهرة: مكتبة وهبة، ٢٠٠١م)، ص ٢٣

٢. http://www.alwarraq.com

٣. http://ar.wikipedia.org

٤. القرضاوي، دكتور يوسف، **فقه الغناء والموسيقى في ضوء القرآن والسنة**، ص ٢٩

٥. السنن الكبرى للبيهقي، ١٠/ 223.

٦. ابن القيم، **إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان**، ج١، بدون مطبعة وتاريخ، ص٢٦٠.

٧. الإمام الغزالي، **إحياء علوم الدين**، (مصر: طبع الشعب)، ص١١٤٧

٨. سنن الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، رقم الحديث: ١٥٦١.

٩. القرضاوي، دكتور يوسف، **فقه الغناء والموسيقى في ضوء القرآن والسنة**، ص٤٦

١٠. صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر، رقم الحديث (٥٥٩٠)

١١. رواه ابن ماجه في الفتن (٤٠٢٠)

١٢. مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، رقم الحديث: ٦٢٦٠

١٣. القرضاوي، دكتور يوسف، فقه **الغناء والموسيقى في ضوء القرآن والسنة**، ص٤٤

١٤. سنن أبي داود، ج٢، ص٦٩٩، رقم الحديث: ٤٩٢٧.

١٥. سنن البيهقي(٢٢٣/١٠)

١٦. الإما الغزالي، إحياء علوم الدين، ص١١٥١

١٧. صحيح البخاري، كتاب النكاح، رقم الحديث: ٤٧٦٥.

١٨. القرضاوي، دكتور يوسف، **الإسلام والفن**، ط١، (القاهرة: مكتبة وهبة، ١٩٩٦م)،ص٥٣

١٩. سنن أبي داود، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٩٥٩.

٢٠. الشوكاني ، **نيل الأوطار**، جـ٨، ص٢٦٤-٢٦٦

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 217-222)

الابتلاء في القرآن والسنة

– سعود بن محمد*

الحمد لله رب العالمين، الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وجعله أفضل الخلق ورزقه من أنواع النعمة والمتاع، والزينة أحياناً يوقع عباده في عدة مصائب وشتى فجائع ليبلوهم أيهم أحسن عملا، والصلاة والسلام على حبيبه وخير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فهذا الابتلاء امتحان الله تعالى ليعلم المجاهدين في سبيل الله والصابرين على الكوارث والفواجع، وقد يكون ذلك بشيء يسير من ألوان البلاء مثل الخوف والجوع وذهاب بعض الأموال وموت بعض الأحباب وضياع بعض الزروع والثمار، هذا أمر عادي لله تبارك وتعالى حتى ابتلى الأنبياء أيضاً مع أنهم كانوا من أحباء الله تعالى جل وعلا وأقربائه.

الابتلاء لغة: الابتلاء من البلاء مصدر من باب الافتعال بمعنى المحنة تنزل بالمرء ليختبر بها والغم والحزن والجهد الشديد في الأمر.[1]

وقال ابن الاثير: المعروف أن الابتلاء يكون في الخير والشر معا من غير فرق بين فعليهما، ومنه قوله تعالى: " ونبلوكم بالشر والخير فتنة ".[2]

الابتلاء في الشرع: هو الفتنة والمحنة من الله المولى الكريم للمؤمنين ليتميز به عباد الله المخلصين من المنافقين.

وهناك آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة التي تتكلم عن ابتلاء الله جل وعلا، وإليكم بيان ذلك:

الابتلاء في القرآن الكريم:

قال تعالى: (**الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا**) (سورة الملك: ٢) خلق الله الموت والحياة وما فيها من ابتلاء ومصائب ليختبرنا أيُنا أحسن عملا من غيره. وقال السيد قطب في تفسيره " ظلال القرآن "

---

* الفصل الأول، قسم الدعوة والدراسات الإسلامية.

بشرح هذه الآية الكريمة: أنه خلق الموت والحياة. والموت يشمل الموت السابق على الحياة والموت اللاحق لها. والحياة تشمل الحياة الأولى والحياة الآخرة. وكلها من خلق الله كما تقرر هذه الآية، التي تنشئ هذه الحقيقة في التصور الإنساني؛ وتثير إلى جانبها اليقظة لما وراءها من قصد وابتلاء. فليست المسألة مصادفة بلا تدبير. وليست كذلك جزافاً بلا غاية. إنما هو الابتلاء لإظهار المكنون في علم الله من سلوك الأناسي على الأرض، واستحقاقهم للجزاء على العمل: { ليبلوكم أيكم أحسن عملاً }.. واستقرار هذه الحقيقة في الضمير يدعه أبداً يقظاً حذراً متلفتاً واعياً للصغيرة والكبيرة في النية المستسرة والعمل الظاهر. ولا يدعه يغفل أو يلهو. كذلك لا يدعه يطمئن أو يستريح. ومن ثم يجيء التعقيب: {وهو العزيز الغفور} ليكسب الطمأنينة في القلب الذي يرعى الله ويخشاه. فالله عزيز غالب ولكنه غفور مسامح. فإذا استيقظ القلب، وشعر أنه هنا للابتلاء والاختبار، وحذر وتوقى، فإن له أن يطمئن إلى غفران الله ورحمته وأن يقر عندها ويستريح![٣]

وقال الشيخ علي الصابوني في تفسيره " ليبلوكم أيكم أحسن عملا " أي ليمتحنكم ويختبركم أيها الناس فيرى المحسن منكم من المسيء.[٤] وقال القرطبي أي يعاملكم معاملة المختبر فإن الله تعالى عالم بالمطيع والعاصي أزلا.[٥]

٢- وقال تعالى: (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ) (سورة البلد، آية: ٤) أي تعب ومشقة وبلاء ومشاكل قال ابن عباس "في كبد " أي في شدة من حمله، وولادته، ورضاعه، وفطامه، وفصاله، ومعاشه، وحياته، وموته.[٦]

٣- وقال تعالى: (**الم (١) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ**) (سورة العنكبوت: ١-٣) فالفتنة هي اختبار الله تعالى للمؤمنين ليعلم الله الصادقين ويعلم الكاذبين عند الشدائد قال الشيخ الصابوني في شرح الآيات المذكورة أظن الناس أن يتركوا من غير افتنان لمجرد قولهم باللسان أمنا؟

لا ليس كما ظنوا بل لابد من امتحانهم ليتميز الصادق من المنافق ولقد اختبرنا وامتحنا من سبقهم بأنواع التكاليف والمصائب والمحن.[٧]

قال الشيخ سيد قطب في تفسير الفتنة ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله ثم لايجد المسير الذي يساعده ويدفع عنه ولا يملك النصر لنفسه ولا منعه، ولا يجد القوة التي يواجه بها الطغيان وهذه هي الصورة البارزة للفتنة فهناك فتن كثيرة في صور شتى ربما كانت أمر وأدهي وهناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه وهو لايملك عنهم دفعاً وقد يهتفون به ليسالم أو ليستسلم وينادونه بسم الحب والقرابة واتقاء الله في الدم التي يعرضها للأذى والهلاك.

وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين ورؤية الناس لهم ناجحين مرموقين تهتف لهم الدنيا وتصفق لهم الجماهير و تتحطم في طريقهم العوارق، وتصاغ لهم الأمجاد، وتصفوا لهم الحياة، وهو مهمل منكر لا يحس بهم أحد، ولا يحابي عنه أحد، ولايشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا يملكون من أمر الحياة شيئاً وهناك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة حين ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله وكل من حوله تيار في الفلاة، وهو وحده موحش طريد غريب.

وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام فتنة أن يجد المؤمن أمماً ودولا غارقة في الرذيلة وهي مع ذلك راقية في مجتمعها، محتضرة في حياتها يجد الفرد فيها من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان ويجدها غنية قوية، وهي مشقة لله!

وهناك الفتنة الكبرى أكبر من هذا كله وأعنف فتنة النفس والشهوة وجاذبية الأرض، وكفلة اللحم والدم،والرغبة في المتاع والسلطان أو في الدعة والاطمئنان وصعوبة الاستقامة على صراط الإيمان والاستواء على مرتقاه، مع المعوقات والمثبطات في أعماق النفس وفي ملابسات الحياة وفي منطق البيئة، وفي تصورات أهل الزمان.[٨]

٤- قال تعالى: (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ) (سورة البقرة: ٢١٤)

لا تحسبوا دخول الجنة سهلا بدون جهاد فقد أصاب من قبلكم الحرب والمرض.....وزلزلوا حتى قال الرسول — صلى الله عليه وسلم — والذين معه حين نأخذ النصر عنهم: متى نصر الله ؟ ألا إن نصر الله قريب.

٥- وقال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر"[٩] فالمؤمن الصادق يصبر على ما يصيبه في الدنيا ليكون له النعيم المقيم، والكافر منعم في الدنيا كأنها جنته، ويكون له العذاب المقيم يوم الجزاء.

الابتلاء في السنة المطهرة:

وكما تحدث القرآن الكريم عن الابتلاء تحدثت السنة المطهرة عنه فقال عليه السلام عندما سئل عن أي النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً قَالَ « الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاَؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِى دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِىَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاَءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِى عَلَى الأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ ».[١٠]

وعن أبي هريرة – رضى الله عنه– قال: " قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: « مَا يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ ».[11]

وعن عبد الرحمن بن عوف – رضي الله عنه – قال: " ابتلينا مع رسول ابْتُلِينَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بالضَّرَّاءِ فَصَبَرْنَا ثُمَّ ابْتُلِينَا بِالسَّرَّاءِ بَعْدَهُ فَلَمْ نَصْبِرْ".[12] وتعوذ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من الفتن فقال: اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ".[13]

أنواع الابتلاء والصبر عليه:

١– الخوف والجوع والقتل، كما قال الله تعالى: **(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ)** (سورة البقرة: ١٥٥)

٢– الحرب والجهاد، كما قال تعالى: **(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ)** (سورة محمد: ٣١) فالابتلاء بالحرب ليعلم الله المجاهدين والصابرين.

٣– المرض: قد يكون الابتلاء بالمرض ليختبر الله صبر الإنسان ويسمع دعاؤه، وأيضا قال تعالى: **(وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ)** (سورة الأنبياء: ٨٣)

٤– السجن: نوع من أنواع الاختبار ليعلم الله الصابر من غيره كما حصل ليوسف عليه السلام حيث بقى في السجن ثمان سنوات بتهمة تمس شرفه، وقد خرج بريئاً مكرماً وصار وزيراً.

٥– فتن المال والولد: ، كما قال الله تعالى: **(إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ)** (سورة التغابن: ١٥)

المال والأولاد اختبار من الله لعبده ليعلم قدرته على تربية أولاده وأداء زكاة ماله قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم–: نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ.[14]

وقال أيضاً: « إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ».[١٥]

٦- الإيذاء من الناس، كما قال النبي — صلى الله عليه وسلم : "الْمُؤْمِنُ الذي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الذي لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ "[١٦].

فالأنبياء جميعاً أذاهم قومهم وجادلوهم وكذبوهم وحاولوا قتلهم وأخرجوهم من وطنهم ولكنهم صبروا فكان النصر حليفهم. قال الله تعالى: **(إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ)**(سورة يوسف: ١١٠) وقال عن لقمان الحكيم وهو يوصي ولده: **(يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)** (سورة لقمان: ١٧)

الخاتمة:

أخيراً ما نفهم أن الابتلاء من الله عز وجل اختبار لتميز أحباؤه من المنافقين ولانتقاء المخلصين من هذا سنة الله العلي العظيم تجري إلى يوم الساعة الفناء المحتم، علينا أن نحاول لأن نفوز في كل امتحان وأن لاتنحرف عقيدتنا ويبعد اعتمادنا من الله تعالى قنوطاً في المصائب والفجائع بل يكون اعتمادنا عليه صموداً كالطود الجبال الجسيم. نسأل الله تعالى المولى الكريم جميعاً بالصبر في كل وقت وحين والله هو الموفق والمعين.

المراجع والمصادر

١ المعجم الوسيط، مادة: البلاء، ص٧١.

٢ معجم الفروق اللغوية للعسكري، ج١، ص٥.

٣ سيد قطب، في ظلال القرآن، ج٧، ص٢٦٣.

٤ علي الصابوني، صفوة التفاسير، ج٣، ص٤١٥.

٥ تفسير القرطبي، ج١٨، ص٢٠٧.

٦ الخازن، أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي، **لباب التأويل في معاني التنزيل**،ج٤، ص٣٤٨.

٧ علي الصابوني، المرجع السابق، ج٢، ص٤٥١-٤٥٢.

٨ سيد قطب، المرجع السابق، ج٦، ص٣٨٧-٣٨٨.

٩ صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، ج١٨، ص٩٣.

١٠ سنن الترمذي، باب ما جاء في البلاء، رقم الحديث: ٢٥٧٨، ج٩، ص٢٣٤.

١١ سنن الترمذي، باب ما جاء في البلاء، رقم الحديث: ٢٥٧٩، ج٩، ص٢٣٥.

١٢ سنن الترمذي، باب من كانت...، رقم الحديث: ٢٦٥٢، ج٩، ص٣٤٧.

١٣ سنن النسائي، رقم الحديث: ١٣٠٤، ج٣، ص٦٢.

١٤ مسند أحمد، حديث عمرو بن العاص، رقم الحديث: ١٨٢٣٦.

١٥ صحيح مسلم، باب ما يلحق الأنسان...، رقم الحديث: ٤٣١٠.

١٦ سنن ابن ماجه، باب الصبر على...، رقم الحديث: ٤١٦٨.

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 223-228)

الحضارة الإسلامية حضارة الإنسانية

د/ أحمد مصطفي عبد الحميد مرسى*

لم يخلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في هذا الكون ليعبث أو يلهو أو يلعب ..أو ليطغى بقوته وجبروته، أو ليعيش في أحضان الجهل والاستجداء، قال تعالى: (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون)(١). وقال تعالى: (تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شئ قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيَكُم أحسنُ عملاً وهو العزيز الغفور) (٢). وإنما خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وركّب فيه ما ركب من قوى الإدراك والعمل لحكم سامية ... منها:

أولاً: ليكون الإنسان خليفة في الأرض يعمل على إصلاحها، واتساع عمرانها، وإظهار أسرار خالق الكون فيها، وتدعيم أواصر الخير وإقرار السعادة، في جميع أرجائها.

وقد أرشد إلى هذه الحكمة كثير من آيات القرآن منها قوله تعالى وهو يحدِّث عن مبدأ خلق الإنسان . (وإذ قال ربُكَ للملائكة إني جاعلٌ في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدِّسُ لك قال إني أعلمُ مالا تعلمون ٠ وعلَّم آدم الأسماءَ كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين٠ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم٠ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلُم غيب السموات والأرض وأعلمُ ما تبدون وما كنتم تكتمون) . (٣)

فهذه الآيات توحى بأن العلم أساس الحياة وسر النجاح، فالخلافة في الأرض والسيطرة عليها وتسخير ما فيها، واستغلال خيراتها وثمراتها وطيباتها أساس ذلك كله العلم لا غيره،وإذا كانت هذه هي مهمة الإنسان في الحياة وهي حكمة خلقه، وحكمة الإنعام عليه، بقوى العلم والعمل، وحكمة تسخير الكون وإخضاعه له في التفكير والتصريف . فلا سبيل إلى قيام الإنسان بهذه المهمة وتحقيق تلك الحكم إلا بالعلم والمعرفة والعمل (٤).

ثانياً: لم يكتف الإسلام بهذا– بل فتح مجال العلم للعقل الإنساني، وتعدى به أسوار الطبيعة وتغلغل به في أسرار الحياة ...قال تعالى: (فلينظر الإنسان إلى طعامه أنَّا صببنا الماء صبًّا ثم شَقَقْنَا الأرض شقاً٠ فأنبتنا فيها

---

* الأستاذ المساعد في قسم الدعوة والدراسات الإسلامية، بالجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ.

حبًا وعنبا وقضباً وزيتوناً ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبًا متاعاً لكم ولأنعامكم) (٥). وقال تعالى: (فلينظر الإنسان مم خلق ◦ خلق من ماء دافق ◦ يخرج من بين الصُّلب والترائب) (٦). وقال تعالى: (وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين) (٧) .

هذه الآيات وما جرى مجراها قد فتحت للعقل الإنساني آفاق الكون وبينت له طريق التأمل والمشاهدة والتفكير في ملكوت السموات والأرض لاستنباط الحقائق، وما يفيد المجتمع الإنساني ويعود عليه بالنفع والأمن ... وتلك دعوة صريحة إلى العلم، حظيت بها الإنسانية منذ أربعة عشر قرناً من الزمان،دعوة صريحة صادقة إلى اتباع الأسلوب العلم والمنهج القائم على التكامل والصدق والإخلاص. (٨)

والإسلام قد وثبَ بالمسلمين وثبةً هائلة وهذه الوثبة الهائلة كانت على أثر إشعاع القرآن الكريم في جنبات الدنيا والإنسانية فأنارهما بعد ظلمة، وهدى الإنسانية بعد حيرة، ونظمها بعد اضطراب، وفتق أذهان أبنائها بعد ارتقاق، وأزال الأصفاد والقيود والأغلال التي كانت تقف حجر عثرة أمام الفكر . وكان من ذلك أن نبه على وجوب النظر في الكون العام وفي النفس الإنسانية وفي الأسباب والمسببات والمقدمات والنتائج. فكان بهذا مصباحاً ونوراً أضاء الدنيا وأنار أفق الإنسانية وأشرق بالمعرفة الصحيحة . والباحث المنصف يرى أن الإسلام في وثبته تلك قد وضع أسس المعرفة التي تهدى الإنسان إلى الخير ... والمعرفة في الإسلام، لا تقوم على نظرية تحتاج إلى دراسة وتأمل وإنما على أساس التعادل بين الكم والكيف وبين المادة والروح، وبين الغاية والسبب، وبين الدنيا والآخرة ... فلا إفراط ولا تفريط، لقد ربط الإسلام بين الحواس المرهفةً وبين العقل الباحث المنظم والوجدان النقى وكل ما جاء في القرآن في الحث على التفكر دليل على مكانة العقل، والعلم، والمعرفة في نظر الإسلام إذ العقل آلة التفكير، والعلم ثمرة التفكير. فكل ما ورد في القرآن حث على التفكير وهو إعلان عن فضل العقل، وإيحاء بالعمل على تربيته وتقويته وهو في الوقت ذاته تسجيل لفضل العلم ... حتى يتمكن الإنسان من الحقائق،وتزول عنه غشاوة الجهل، ويتحرر من رق الأوهام والخرافات والأساطير التي لا صلة لها بواقع الحياة . وبهذا كان الإسلام دين الفكر والعقل والعلم . (٩)

وقد ارتفع القرآن بالعقل وقدره حق التقدير، وجعله ميزة الإنسان .(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) (١٠). وبناء على التوجيهات القرآنية، للناس بالنظر والدراسة ... انطلق المسلمون يدرسون ويبحثون، ويقارنون، ويغربلون، ويقعِّدون القواعد، ويؤصِّلون الأصول .

ولقد اشتملت توجيهات القرآن العقلية على أصول ومبادئ عامة هامة التي صلحت؛ لأن تكون منهجاً فكرياً سليماً، حدد به المسلمون موقفهم من مشاكل الكون والحياة. واستطاعت هذه التوجيهات أن تمكن المسلمين من الاستفادة من تلك الدرة الإلهية، التي منحها الله للإنسان وهي العقل، فنمَّته وجعلته يمارس الوظيفة الأساسية التي خلق من أجلها. حتى كانت للمسلمين حضارة وعلوم ومخترعات حضارية عالمية لن ينسى التاريخ دورها في تحويل مجرى الإنسانية ولن تنسى الإنسانية دور المسلمين في بناء الحضارة بأصالة وعمق وفاعلية . (١١)

كانت هناك تشريعات، وفلسفة وقوانين وطب وفلك وأدب واجتماع ورياضيات وتاريخ وجغرافيا، وفنون جميلة، وآداب للسلوك والاجتماع وكان لكل هذه العلوم والفلسفات، أساتذة عباقرة كأئمة الحديث ورجال الفقه الذين ضبطوا أساليب النقد، وقعدوا قواعد التشريع ...وفوق هذا وذاك ... فقد كان المسلمون وضعوا طرق البحث العلمى والتجريبى الذي كان أساساً للحضارة الأوربية الحديثة تلقى المسلمون هذه الينابيع من مصادرها الأصيلة، واستقرت دعائمها في نفوسهم فكانت الرائد الأمين للعقول والأفهام، والغذاء الروحى للغرائز والمواهب، وهذه الينابيع طبعت الناس على استقلال الإرادة، وحرية الفكر، كما كرهت إليهم التقليد والتبعية العمياء ووجهت العقول للبحث والإنتاج ... وفتحت لهم ميادين العلوم والفنون ... فأقبلوا عليها سراعاً ودخلوها من كل باب . وبهذه النهضة العلمية الجبارة استطاع المسلمون في سرعة لم يعرف التاريخ لها مثيلاً أن ينتقلوا إلى القيادة الفكرية العالمية ويصبحوا أساتذة الدنيا، وعباقرة العلوم ... وكان وأصبح هناك قادة، وحكام، ومدن، وعواصم، ومعاهد، وجامعات ودول وممالك لم يشهد التاريخ لها مثيلاً، كل هذا كان بفعل الاتجاهات العقلية التي غرسها الإسلام – والتي أدت إلى تنمية القوى العقلية الكامنة في الإنسان والتي جعلت من المسلمين أساتذة للعلوم وكانت بعوث الأمم تفد على العواصم الإسلامية من كل ناحية فيأخذون من علمائها مما شاءوا من أفانين العلوم — وألوان المعرفة ثم يعودون إلى بلادهم حاملين إليها مشاعل هذه العلوم التي نفخت فيهم روح الحياة، وفتحت لهم طريق الانتفاع بأصلين عظيمين من أصول الإصلاح الإسلامي، وهما: حرية الفكر . واستقلال الإرادة فلم تنهض العقول للبحث ولم تتحرك النفوس للعمل .. إلا بعد أن عرفت أن لها حقاً في طلب الحقائق. ولقد تلمست أوربا حضارة المسلمين العلمية ... فاستقت من روافدها المعرفة، والفلك والجبر والهندسة، والكيمياء والطب والفلسفة وعلوم النبات والحيوان وسائر أنواع الفنون الحضارية . (١٢)

وبنى رجال أوربا بما تعلموه في معاهد المسلمين بالأندلس، وما نقلوه من علوم العرب فقد أسسوا النهضة الحديثة التي ظهر نجمها في القرن الثامن عشر وازدهرت في القرن التاسع عشر، وتألق في القرن العشرين والإسلام بدعوته إلى العلم هو الذي خرَّج جهابذة الفكر ورجال الحضارة أمثال ابن الهيثم، وابن البيطار، وابن

سينا، وابن النفيس، وابن زهر، وابن بطوطة، والكندي، والفارابي، والبيروني، والطوسي، والدينوري، والبغدادي، والفيروز آبادي، والإمام الغزالي، والطبري والرازي، والإنطاكي، و الخوارزمي، والإدريسى، والمسعودى، وجابر بن حيان والجاحظ وغيرهم ممن أفادوا الإنسانية، وهذا ابن الهيثم يبحث في السهل والأودية ويجول فيها طولاً وعرضاً حتى يضع قواعد علم الضوء. وابن الدجيلي فيسهر على قمم الجبال العالية يحدق في الكواكب والنجوم، ليحد أفلاكها، ويعرف أبعادها، ويقيس محيط الكرة الأرضية، وعبد الله الخوارزمي العالم المسلم الذي ولد في إقليم خوارزم (١٣) أول رجل في العالم يضع أصول علم الجبر وفي كتابه "الجبر والمقابلة" يقسم العلماء إلى ثلاثة: " فمنهم المخترع المبتكر الذي لم يسبق إليه، ومنهم الذي يتناول آراء العلماء قبله بالشرح والتفصيل والتوضيح، ومنهم الذي لم يكلف نفسه أكثر من جمع المتفرّق".

وأبو الريحان محمد البيروني الذي ولد في بيرون وهي مدينة صغيرة تتبع مدينة خوارزم . يساهم في الفلك والرياضيات بمساهمات فعّالة. (١٤)

وابن النفيس العالم الدمشقى، يجرى التجارب والاختبارات، حتى يثبت أن الدم ليس سائلاً مستقرا في الأوردة والشرايين . بل هو سائل متحرك يدور في جميع أجزاء الجسم، وذلك قبل أن يكشف العالم البرتغالى "هارفي" الدورة الدموية بثلاثة قرون . وابن مسكوية ذلك المفكر الإسلامي الكبير الذي طرق الدراسات الأخلاقية والنفسية يسبق فلاسفة أوربا وعلمائها بثمانية قرون في علوم الأخلاق والتهذيب والنفس، وجابر ابن حيان يحلل عناصر الطبيعة، وتفاعل المواد المختلطة حتى يضع أصول علم الكيمياء .. وابن يونس يسبق العلماء في اختراع بندول الساعة والرقاص ... هذا كله في الوقت الذي كانت فيه أوربا تعيش في ظلمات الجهل والفوضوية والأمية والهمجية والتأخر، ولم ينقذ أوربا من ورطتها التي كانت واقعة فيها إلا حضارة المسلمين، ومازالت أسماء العلوم والمصطلحات التي أعطاها هؤلاء العلماء المسلمون، لغرائب المخترعات، مازالت حية نابضة في جميع اللغات، رغم ما نالها من تحريف وتغيير . (١٥)

ولقد سجل التاريخ آيات هذه الحضارة الإسلامية، وشهد بها المنصفون من فلاسفة العالم ومؤرخيه، الذين لا يبغون من بحوثهم ودراساتهم إلا مرضاة العلم في ذاته، وظهرت حضارة المسلمين وتفاعلت مع الإنسانية للأسباب الآتية:

أولاً: العالم الإسلامي حباه الله تعالى بأعظم النعم، إذ يتربع على كنوز ثمينة ويربض على ثروات معدنية هائلة، ويملك من حقول البترول أجدرها نفعاً وأكثرها سخاءً وثراءً، وأقواها تدفقاً وعطاءً.

ثانياً: يملك العالم الإسلامي من شواطئ البحار والأنهار والممرات والطرق البرية والبحرية والجوية مما يجعله في مركز القيادة، ويمكنه من المساهمة والإشراف والتحرك الفعال.

ثالثا: العالم الإسلامي غني بالمحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني مما يمكن من قيام صناعات متقدمة ومتطورة.

رابعا: يعيش العالم الإسلامي اليوم في يقظة واعية وصحوة صحية، فإذا أحسن توجيهها أثمرت وأفادت الإنسانية.

خامسا: يشغل الأمة الإسلامية من خريطة العالم الإنساني حيزاً جغرافياً عظيماً مما يمكن المسلمين من التأثير والفاعلية القادرة على الانطلاق ... تلك وغيرها أمور تجعل الأمة الإسلامية قوة إيجابية، مهيأة للإسهام في إنقاذ الإنسانية من الضياع والفوضوية والجهل والإلحاد والمذاهب الهدامة ...إن المسلمين يمكن أن يعودوا إلى عظمتهم الماضية إذا عادوا إلى فهم حقيقة الحياة في الإسلام والعلوم التي حث الإسلام على الأخذ بها، إن الشرق الإسلامي هو اليوم في مطلع دور جديد في حياته العلمية كما أنه في فجر جديد في حياته السياسية وهو دور جديد يمكن أن نسميه دور الإبداع والابتكار، ضمن إطار الميراث الخالد من القيم الدينية والأدبية والحقيقة التي لا يستساغ إنكارها إن تقدم المسلمين علمياً وحضارياً رهين بعودتهم إلى الإسلام .

المراجع:

١. —سورة المؤمنون: الآية (١١٥) .

٢. – سورة الملك: الآيات (١، ٢) .

٣. — سورة البقرة: الآيات (٣٠-٣٣).

٤. — نحن والحضارة الغربية للأستاذ أبو الأعلى المودودي دار الفكر العربي بدمشق، ص ٨٩ .

٥. — سورة عبس: الآية (٢٢) .

٦. — سورة الطارق: الآيات (٥-٧) .

٧. — سورة الحجرات: الآية(٢٢) .

٨. — الإسلام حضارة الغد دكتور / يوسف القرضاوي المكتب الإسلامي، ص ١٤٠.

٩. — ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده دكتور/ يوسف القرضاوي، دار الفكر العربي دمشق، ص ١٠٢.

١٠. —سورة الحج: (٤٦).

١١. — الإسلام والحضارة العربية ، محمد كرد على طبعة دار ابن كثير، دمشق، ص ٣٩.

١٢. — حضارة العرب، غوستاف لوبون ترجمة الأستاذ عادل زعيتر، مطبعة عيسى، باب الحلبي مصر، ص ٢٨.

١٣. — إقليم خوارزم هذا من الأقاليم الإسلامية التي كانت عامرة بالعلم والعلماء وهو الآن تحت الاستعمار الشيوعى الروسى .

١٤. — حضارة العرب، غوستاف لوبون ترجمة الأستاذ عادل زعيتر، مطبعة عيسى، باب الحلبي مصر، ص ٢٨.

١٥. — ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده، دكتور/ يوسف القرضاوي،دار الفكر العربي دمشق، ص ١٠٢.

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 229-235)

العلم والعلماء في ضوء القرآن والسنة

محمد جنيد*

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه حمد الشاكرين. وأثني عليه بما هو أهله. والصلاة والسلام علىٰ معلم الناس الخير الذي أرسله الله رحمة للعالمين يهدي إلى الحق وإلىٰ صراط مستقيم، أما بعد:

فإن طلب العلم من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد من ربه ومن أبرز الطاعات التي ترفع منزلة المسلم وتعلو قدره عند الله سبحانه ولقد أمر الله عباده بالعلم والتعلم والتفكر والتدبر وحذرهم من الجهل واتباع الهوى وبين أن العلم الذي ينفع صاحبه يوم القيامة هو العلم الذي يخلص فيه العبد لمولاه ويقرب فيه نيل رضاه ويتأدب الإسلام ويتخلق بأخلاق سيد الأنام –محمد صلى الله عليه وسلم– الذي كان خلقه القرآن.

فالعلم بدون أدب لا ينفع والعلم الذي لا تصاحبه نفس مطهرة زكية قد يكون حجة على صاحبه يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا شك أن أعداء الإسلام يخططون لإبعاد شباب المسلمين عن النافع وبخاصة العلم الشرعي الذي به الأمة ويقظتها ونهضتها ويحرضون علىٰ أوقات الشباب بشتى الملهيات وما من شيء يفيظهم أكثر من أن يروا إقبال أبناء المسلمين علىٰ طلب والتأدب بآدابه.

وفي ختام هذه المقدمة يطلب لي أن أعرض للقاري الأساس التي تحدثت عنها في أثناء هذه المقالة، وهي كما يلي :

فضل طلب العلم ومنزلة العلماء:

---

* الفصل الثاني، قسم الدعوة والدراسات الإسلامية، الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ.

نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وإنه جواد كريم. يستحسن قبل البدء بالحديث عن فضل طلب العلم أن نتحدث بشيء من الإجمال عن فضل طلب العلم ومنزلة العلماء وعظيم قدرهم عند الله سبحانه وما ورد في هذا المقام من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأقوال الصحابة الكرام والسلف الصالح. ولا شك أن إدراك طلاب العلم للشرف العظيم الذي ينالونه بطلبهم للعلم والمكانة العالية التي يحظون بها. يجعلهم أكثر حرصا على سلوك طريقة العلم والتعلم التي تزيد من مكانتهم وفضلهم عند الله سبحانه وتعالى من قدرهم وتحقق انتفاع الناس بهم وفيها يلي نستعرض بإيجاز ما ورد في الحديث على فضل العلم ومنزلة العلماء وما أعد الله لهم من الأجر العظيم والفضل الكبير.

الآيات القرآنية في فضل طلب العلم ومنزلة العلماء:

قال الله تعالى مبينا فضل منزلة العلماء وما لهم من مكانة ورفعة [أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ][1]

وقال سبحانه: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ][2]

ورفع الدرجات يدل على عظيم الفضل ويشمل الرفعة المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة.

وما يدل على فضل العلم وجوب الاستزادة منه قوله عز و جل: [رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا][3]

واضح الدلالة في فضل العلم لأن الله تعالى لم يأمر نبيه –صلى الله عليه وسلم– بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، والمراد بالعلم: العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته.[4]

وقد شرف الله العلم بالعلماء بما يمنهم من خير عميم بقوله سبحانه: [يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ][5]

وقال مجاهد يؤتي الحكمة أي العلم والفقه. وما يؤكد أهمية العلم وضرورة طلبه.[6]

[فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ][7]

فبدأ بالعلم قبل العمل. كما قال الإمام البخاري العلم النافع له ثمرات عظيمة أبرزها تحقق صاحبه بالخشية من الله سبحانه. فالعلماء أشد الناس خشية من ربهم لما تعلموه من العلم الذي يزيد معرفتهم بربهم و يرسخ الإيمان في قلوبهم.[٨]

قال تعالىٰ [إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ][٩]

والعلماء هم أهل الإدراك السليم والفهم العميق. قال تعالىٰ [وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ][١٠]

والتأمل لآيات القرآن الكريم يدرك منزلة العلم والعلماء وما ورد في شأنهم من آيات قرآنية كثيرة ذكرها فيها العلم والفهم والإدراك والحث على النظر التفكر وأعمال العقل وغير ذلك.[١١]

الأحاديث النبوية في فضل طلب العلم ومنزلة العلماء:

كتب الهدي النبوي حافلة بمئات الأحاديث الشريفة التي يأمر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم ويحض عليه ويبين منزلة العلماء وشرفهم وما ينبغي لهم أن يتخلقوا ويحرصوا عليه. ففي الصحيح البخاري مثلا أكثر من مائة حديث في العلم وطلبه والحث عليه وقد أفرد لها الإمام البخاري كتابا خاصا في صحيحه جعله بعد كتاب الإيمان وسماه كتاب (العلم) وقسمه إلىٰ أبواب كثيرة تتضمن فضل العلم والرحلة في طلبه وكتابته وحفظه وفهمه الإنصات للعلماء والحياء في العلم ونحو ذلك.

وكذلك كتب السنة الأخرى فيها عدد كبير من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين وكلها تشير إلى المكانة العظيمة التي يتبوؤها العلماء والمنزلة السامية التي يكرم الله بها طالب العلم.

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ :«مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ».[١٢]

فالفقه في الدين من أعظم الخير الذي يوفق الله إليه عباده.

عَنْ أَبِى مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيْ عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ «مَثَلُ مَا بَعَثَنِى اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى،

إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً، وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِى دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِى اللَّهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ ».[١٣]

وفي هذا الحديث توجيه نبوي للحرص على العلم والتعلم وهو مثل ضربه النبي –صلى الله عليه وسلم– لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه وكذا كان حال الناس قبل مبعثه فكما أن الغيث يحيى البلد الميت فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث فمنهم العالم العامل المعلم فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وانبتت فنفعت غيرها ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع لكنه أداه لغيره فهو بمنزلة الأجادب وهي الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به وهو المشار إليه بقوله: "نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها وإنما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها.[١٤]

ولا شك أن الفارق كبير بين من يسلك طريق العلم فينفع نفسه وينتفع الناس به وبين من يرضى بالجهل ويعيش في ظلماته فلا يحظي بأي نصيب من ميراث النبوة.

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِى الأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِى جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ».[١٥]

وهذا الحديث بيان التكريم العظيم الذي يناله طالب العلم فالملائكة تضع له اجنحتها تواضعا وتوفرا والمخلوقات الكثيرة في السموات والأرض والبحار والتي لا يعلم عددها إلا لله سبحانه كلها تستغفر لطالب العلم وتدعو له ويكفي طالب العلم فخرا أنه يسعى للحصول على ميراث النبوة ويترك أهل الدنيا لدنياهم التي اجتمعوا على فتاتها وشغلوا بحطامها وتكالبوا عليها.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ».[١٦]

وهذا بلا شك فضل عظيم لطالب العلم أن يدعو له الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالنضارة والبهاء لما يقوم به من تعلم العلم وحفظ الحديث وتعليمه وروايته وهو مأجور على التبليغ وإن خفيت عليه بعض معاني الروايات التي يحدث بها لأنه يحفظها ويبلغها بصدق.

قال الإمام إبن القيم: النضرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره.[١٧]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».[١٨]

فأعظم الخيرات التي تنصب كالغيث من الثواب والحسنات وتستمر بلا انقطاع ما دام علم هذا العالم يتناقله تلاميذه جيلا بعد جيل وكتبه ومؤلفاته ينتقع بها العباد في شتى البلاد. وهكذا يبقى أجر العالم وثوابه متصلا بعد موته بسبب العلم الذي تركه للناس ينتفعون به.

أقوال مأثورة في فضل طلب العلم عن الصحابة والسلف الصالح:

عَنْ على رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَضْلَ مَا بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْمَالِ فَقَالَ «الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنْ الْمَالِ. الْعِلْمُ يَحْرُسُكَ، وَأَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ. الْعِلْمُ حَاكِمٌ وَالْمَالُ مَحْكُومٌ عليه. مَاتَ خَزَّانُ الْأَمْوَالِ وَبَقِيَ خَزَّانُ الْعِلْمِ أَعْيَانُهُمْ مَفْقُودَةٌ، وَأَشْخَاصُهُمْ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ».[١٩]

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول إذا رأى الشباب يطلبون العلم «مرحبا بينابيع الحكمة ومصابيح الظلم، خلقان الثياب، جدد القلوب، حبس البيوت ريحان كل قبيلة».[٢٠]

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه «إن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة فإذا سمع العلم خاف ورجع وتاب فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب فلا تفارقوا مجالس العلماء».[٢١]

وقال أيضا رضي الله عنه: «أيها الناس عليكم بالعلم فإن لله سبحانه رداء يحبه فمن طلب باب من العلم رداه الله بردائه فإن اذنب ذنبا استعتبه لئلا يسلبه رداءه ذلك حتى يموت به».[٢٢]

وعن الحسن البصري رحمه الله عنه أنه قال: «لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أجب إلى من أن تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله».[٢٣]

وعن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: «ليس شيئ بعد الفرائض أفضل من طلب العلم» وأما قيل في شأن العلم ومنزلته من أبيات الشعر فهو أكثر من أن يحصر ويجدر بنا مثلا أن نذكر قول الشاعر :

ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدي أدلاء وقدر كل امرأ ما كان يحسنه[٢٤]

وقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:

تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وأن كبير القوم لا علم عنده

صغير إذا التقت عليه الجحافل وإن صغير القوم وإن كان عالما كبير إذا اردت إليه المحافل[٢٥]

وأسئل الله عز وجل أن يرزقنا بالعلم النافع وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعنا به في حياته وبعد الممات وأن يجعلها من العلماء العالمين المخلصين وأنه سبحانه ولي ذلك والقادر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

المراجع

١ سورة الزُّمر: ٩

٢ سورة المجادلة: ١١

٣ سورة طه: ١١٤

٤ فتح الباري ج/١، ص/١٤١

٥ سورة البقرة: ٢٦٩

٦ أخلاق العلماء للإمام أبي بكر الآجري ص/٩

٧ سورة محمد: ١٩

٨ صحيح البخاري، كتاب العلم، باب العلم قبل العمل ٢٥/١

٩ سورة فاطر: ٢٨

١٠ سورة العنكبوت: ٤٣

١١ أنظر لتفصيل في كتاب مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم الجوزية(ت ٧٥١) ٤١/١

١٢ رواه البخاري، كتاب العلم ٢٥/١ ومسلم في كتاب الإمارة رقم : ١٠٣٧ والترمذي رقم : ٢٦٤٧

١٣ رواه البخاري، كتاب العلم، باب فضل من علم وعلم ٢٨/١

١٤ فتح الباري ١٧٧/١

١٥ رواه أبو داؤد رقم : ٣٦٤١ في العلم، والترمذي رقم : ٢٦٨٣ واسناده حسن كما قال محق جامع الأصول الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ٦/٨

١٦ رواه الترمزي، رقم : ٢٦٥٩ في العلم واسناده صحيح. أنظر جامع الأصول ١٨/٨

١٧ مفتاح دار السعادة لابن القيم ٧٢/١

١٨ رواه مسلم، رقم : ١٦٣١

١٩ أدب الدنيا والدين للإمام أبي الحسن الماوريه (ت ٤٥ هـ) ص/٤٨

٢٠ جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد العزيز القرطبي(ت ٤٦٣ هـ)

٢١ مفتاح دارالسعادة لابن القيم ٧٧/١

٢٢ مفتاح دارالسعادة لابن القيم ١٢١/١

٢٣ المجموع شرح المهذب للإمام النووي (ت ٦٧٦ هـ) ٢١/١

٢٤ المجموع شرح المهذب للإمام النووي (ت ٦٧٦ هـ) ٢١/١

٢٥ عيون الأخبار لابن قتيبة ١٣٦/٢

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 236-238)

الاختلاط: أضراره ومفاسده

سلمى بنت محمد شفيق*

من أهم قضايا المدنية الحديثة المعقدة وأعظمها خطورة الصلة بين الرجل والمرأة وكيفية توطيدها في الحياة الاجتماعية، فإن حل هذه القضية حلا مستقيما متزنا، له أهمية بالغة في رقي الإنسانية وسعادتها.

وقد وقع الناس منذ أقدم العصور في حل هذه القضية بين نظرتين متباينتين، هما: التفريط والإفراط.

ففي بعض المجتمعات وصلت المرأة إلى درجة بالغة من الذل والمهانة والاحتقار. وفي بعضها الآخر ولاسيما في المجتمعات الحديثة، بالغ الناس في تعظيمها وأكبروا من شأنها، فاتخذها الرجال مرطبة لأهوائهم وشهواتهم وأصبحت سلعة رخيصة في سوق الأخلاق المتردية وشهوة الجنس المبتذلة.

وأخر ما وصل إليه الإفراط ما انتهى إليه أمر بعض المجتمعات الحديثة في نظريات الاجتماعية التي ترتكز على شعارات ثلاثة:

١- المساواة بين الرجال والنساء:

وقد أدت المساواة في مفهوم المجتمع الغربي إلى أن تقوم المرأة في الحياة المدنية بالأعمال التي يقوم بها الرجال، ففقدت خصائص أنوثتها. والإسلام جعل لكل من الزوجين حقوق وواجبات خاصة، فللرجل جعل أعمالا تناسب على طبيعته وفطرته، كما جعل للمرأة أعمالا تلائم على طبيعتها وفطرتها حتى لا تفقد خصائص أنوثتها.[١]
فالرجل يقوم بالنفقة والاكتساب والمرأة تقوم بتربية الأولاد والعطف والحنان والرضاعة والحضانة وغيرها من الأعمال التي تناسبها على طبيعتها وفطرتها كتعليم الصغار وإدارة مدارسهن والتطبيب والتمريض وغيرها من الأعمال المختصة بالنساء. حيث قال الرسول —صلى الله عليه وسلم— : "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، والأمير راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده".[٢]

---

* الطالبة في قسم الدعوة والدراسات الإسلامية، الفصل الثالث.

٢- استقلال النساء بشؤون معيشتهن:

أدى استقلال النساء بمعيشتهن إلى إهمال شؤون البيت ورعاية الأولاد والأطفال، والتخلي عن تبعات الأسرة واتخاذ الأخدان.[٣]

ولا شك أن اهتمام المرأة بشؤون البيت ورعاية الأولاد والأطفال، وتربيتهم تربية حسنة والحنان والعطف عليهم هي وظيفتها الأولى. فترك واجبات البيت من قبل المرأة يعتبر ضياعا للبيت بمن فيه، ويترتب عليه تفكك الأسرة حسيا ومعنويا وعند ذلك يصبح المجتمع شكلا وصورة لا حقيقة ومعنى. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى للمرأة بقرارها في بيتها ونهى عن التبرج والسفور[٤] حيث قال جل شأنه: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى)[٥]

٣- الاختلاط المطلق بين الرجال والنساء:

الاختلاط بين الرجال والنساء من أعظم الوسيلة والذريعة الموصلة إلى الأمور المحرمة، لأن الاختلاط بين الجنسين يحرك في النفس كوامن الغريزة، ويشعل نار الشهوات الجامحة ويؤجج عواطف الغرام والحب، ويغري كلا الجنسين بالآخر، فيرخي العنان للشهوة التي لا حدود لها.

وقد اقترن الاختلاط بالجنون الفاحش في الصور العارية والأدب المكشوف، والقصص الغرامية، وحفلات الرقص المثيرة.

وينشأ الناشئة في هذا الجو المحموم الذي تغلي مراحل مجتمعه بالأغاني الماجنة، والموسيقى الراقصة، والطرب الخليع، وصور الإغراء الفاحشة فتسيطر عليهم هذه الاستثارة الجنسية، التي تطفئ فيهم القوى الفكرية والعقلية، ولا يكادون يبلغون الحلم حتى تغتالهم الشهوات البهيمية، ....عليهم.

وإرخاء العنان للشهوة الجنسية يؤدي إلى اضمحلال القوى الجسدية والفكرية، ويفقد ذوي الصبر والجلد والتحمل، ويساعد على انتشار الأمراض السرية الفتاكة، ويحول حياة المجتمع إلى لهو وعبث ومجون وخلاعة. ولا يكون الزواج عصمة في المجتمع المختلط، فإن كلا الجوزين إذا وجد سبيلا لمتعة أفضل وسط هذا التنافس المغري، ولا يأسى إلى هجر زوجه، فيفارقه إلى زوج آخر.[٦]

فالإسلام حريص جدا على جلب المصالح ودرء المفاسد وغلق الأبواب المؤدية إليها. ولاختلاط المرأة مع الرجل في ميدان العمل تأثير كبير في انحطاط الأمة وفساد مجتمعنا، لأن المعروف تاريخيا عن الحضارات القديمة الرومانية واليونانية ونحوهما أن من أعظم أسباب الانحطاط والانهيار والواقع بها هو خروج المرأة من ميدانها

الخاص إلى ميدان الرجال ومزاحمتهم مما أدى إلى فساد أخلاق الرجال، وتركهم لما يدفع بأمتهم إلى الرقي المادي والمعنوي. والله حكيم عليم حيث أمر المرأة بالحجاب وما ذاك إلا لأن الناس فيهم البر والفاجر والطاهر والعاهر فالحجاب يمنع من الفتنة ويحجز دواعيها وتحصل به طهارة قلوب الرجال والنساء والبعد عن مظان التهمة[٧]. قال الله جل وعلا: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ).[٨]

وخير حجاب المرأة بعد حجاب وجهها باللباس هو بيتها وحرم عليها الإسلام مخالطة الرجال الأجانب لئلا تعرض نفسها للفتنة بطريق مباشر أو غير مباشر. وأمرها بالقرار في البيت وعدم الخروج منه إلا لحاجة مباحة مع لزوم الأدب الشرعي وقد سمى الله مكث المرأة في بيتها قرارا وهذا المعنى من أسمى المعاني الرفيعة، ففيه استقرار لنفسها وراحة لقلبها وانشراح لصدرها. لذلك أن استقرار المرأة في بيتها والقيام بما يجب عليها من تدبيره بعد القيام بأمور دينها هو الأمر الذي يناسب طبيعتها وفطرتها وكيانها وفيه صلاحها وصلاح المجتمع وصلاح الناشئة فإن كان عندها فضل ففي الإمكان تشغيلها في الميادين النسلية كالتعليم للنساء والتطبيب والتمريض لهن، ذلك مما يكون من الأعمال النسائية في ميادين النساء. ولا تنسى دور أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ومن سار في سبيلهن وما قمن به من تعليم للأمة وتوجيه وإرشاد وتبليغ عن الله وعن رسوله —صلى الله عليه وسلم– فجزاهن الله عن ذلك خيرا وأكثر في المسلمين اليوم أمثالهن مع الحجاب والصيانة والبعد عن مخالطة الرجال في ميدان أعمالهم.

والله المسؤول أن يبصر المجتمع بواجبهم وأن يعينهم على أدائه على الوجه الذي يرضيه وأن يقي الجميع وسائل الفتنة وعوامل الفساد ومكايد الشيطان إنه جواد كريم.

---

١ . الحديث والثقافة الإسلامية، ص٨٥

٢ . رواه البخاري والمسلم.

٣ . الحديث والثقافة الإسلامية، ص٨٥

٤ . عبد العزيز بن عبد الله بن باز، خطر مشاركة المرأة الرجل في مكان عمله.

٥ . القرآن الكريم، سورة الأحزاب، ٣٣

٦ . الحديث والثقافة الإسلامية، ص٨٥

٧ . عبد العزيز بن عبد الله بن باز، خطر مشاركة المرأة الرجل في مكان عمله.

٨ . القرآن الكريم، سورة الأحزاب، ٥٣

Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 239-245)

দা'ওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ (DIS)

প্রারম্ভিক কথাঃ

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। কিন্তু নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা কোন জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির সোপান হতে পারে না। কর্মদক্ষতা ও নৈতিকতা একটি অপরটির পরিপূরক। নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন যুযোপযোগী শিক্ষার মাধ্যমে একজন মানুষকে দক্ষ ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের পশ্চাদপদতা ও অনগ্রসরতার প্রধান কারণ হলো একদল শুধু বৈষয়িক শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করছেন, কিন্তু নৈতিকতা সম্পর্কে তাদের অনেকের কোন ধারণা নেই। আবার আর একদল ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করার মাধ্যমে নিজেদের নৈতিকতার ভিত্তি মজবুত করেছেন ঠিকই,কিন্তু যুযোপযোগী বৈষয়িক বিষয়ে তাদের জ্ঞান নিতান্ত অপ্রতুল। তাই "আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম" প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সাধারণ ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় সাধনের প্রয়েস চালিয়ে যাচ্ছে। যার লক্ষ্য হচ্ছে একদল আদর্শ ও নৈতিকতা সম্পন্ন দক্ষ নাগরিক সৃষ্টির মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধন করা।

শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ

তথ্য নির্ভর ও গবেষণাধর্মী পড়াশোনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিকতম পদ্ধতি "সেমিস্টার সিস্টেম" (Semester System) ও "ওপেন ক্রেডিট আওয়ার সিস্টেম" (Open credit Hour System) অনুসৃত হয়। এই পদ্ধতি ইউরোপ আমেরিকাসহ উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে অনুসৃত হচ্ছে। ৪ বছরের অনার্স কোর্সকে মোট আটটি সেমিস্টারের আওতায় আনা হয়েছে। তবে একজন মেধাবী পরিশ্রমী ছাত্র-ছাত্রী ৪ বছরের অনার্স কোর্স ৩ বছরেও শেষ করতে পারবে। প্রতি শিক্ষাবর্ষে দু'টি সেমিস্টারঃ বসন্ত কালীন (ফেব্রুয়ারী-জুলাই) ও শরৎকালীন (আগষ্ট-জানুয়ারী)। তাই প্রতি বছর ২ বার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়।

দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ বর্তমান বিশ্বে ইসলামী শিক্ষার আধুনিকতম একটি বিভাগ। আরবী (دعوة) "দা'ওয়াহ" শব্দের অর্থ হচ্ছে আহ্বান করা (to call, to propagate)। পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে ইসলামের সঠিক ধারণা ও সুমহান বাণী ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষে এবং একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যোগ্য ও আদর্শ নাগরিক সৃষ্টির মানসে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই শরী'য়াহ্ অনুষদের অধীনে এ বিভাগটি চালু করা হয়েছে।

লক্ষ্য উদ্দেশ্য:

- কুর'আন, হাদীস ও আধুনিক জ্ঞান সমৃদ্ধ যোগ্য ও দক্ষ দ্বীনের সৈনিক তৈরী করা, যারা দা'য়ী ইলাল্লাহর কাজ সফলভাবে পালন করতে পারবে।
- পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে আধুনিক উপায়-উপকরণ ও কলা-কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দা'য়ী বের করা।
- ইসলাম সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের অপপ্রচার ও সংশয়বদীদের সংশয়ের অপনোদন করার জন্য দক্ষতা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করা।
- ইসলামের সঠিক ইতিহাস ও ইসলামী রেঁনেসার অগ্রপথিকদের জীবন ইতিহাস সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করা এবং তাদের আদর্শ অনুসরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা।
- বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার যুগে তথ্য-প্রযুক্তি ও প্রচার মাধ্যমের আধুনিকতম আবিষ্কার সমূহকে ইসলাম প্রচারের কাজে ও ইসলামের স্বার্থে ব্যবহার করার যোগ্যতা সৃষ্টি করা।

- একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার নিমিত্তে ইসলামী ও আধুনিক জ্ঞান সম্পন্ন যোগ্য ও দক্ষ নাগরিক সৃষ্টি করা।

বৈশিষ্ট্যঃ

- ইসলামী ও আধুনিক জ্ঞানের সমন্বয় সাধন।
- বিশ্বের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সিলেবাস ও শিক্ষা পদ্ধতির অনুসরণ।
- সেমিস্টার ও ওপেন ক্রেডিট সিস্টেমে শিক্ষা-কার্যক্রম পরিচালনা।
- বিদেশে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত দেশী ও বিদেশী অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দের আন্তরিকতাপূর্ণ তত্বাবধান।
- রাজনৈতিক কলহ ও সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস।
- আরবী ও ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান।
- আরবী ভাষায় দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকমণ্ডলীর তত্বাবধানে স্বল্প সময়ে আরবীতে পারদর্শিতা অর্জনের ব্যবস্থা।
- ফ্যাকাল্টির নিজস্ব ল্যাবে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ।
- বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কার্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ।
- মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ গমনের সুযোগ।
- ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশের জন্য জার্নাল, ম্যাগাজিন ও দেয়াল পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশের ব্যবস্থা।

ডিগ্রী সমূহ ঃ

অত্র বিভাগে বর্তমানে চার বছরের বি.এ. (অনার্স) এর পাশাপাশি মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। পর্যায়ক্রমে এম.ফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রাম খোলা হবে।

সিলেবাস ও কোর্সসমূহ ঃ

উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে দেশী-বিদেশী একদল শিক্ষাবিদ ও সিলেবাস বিশেষজ্ঞের নিরলস প্রচেষ্টায় একটি আধুনিক, যুগোপযোগী ও সমৃদ্ধ সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে মুসলিম ও আধুনিক বিশ্বের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সিলেবাসের চমৎকার সমন্বয় সাধন করা হয়েছে এবং [ই.অ (ঐড়হং.)] প্রোগ্রামে মোট ৫৪টি কোর্স নির্ধারণ করা হয়েছে। যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

ভর্তির যোগ্যতা ঃ

বি.এ. অনার্স প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য দাখিল ও আলিমে নূন্যতম দ্বিতীয় বিভাগ অথবা জিপিএ ২.৫ (ঙঃ ড়ভ ৫) হতে হবে। মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তির ক্ষেত্রে যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ৪ (চার) বছরের বি.এ. অনার্স বা সম্মানের ডিগ্রী প্রাপ্ত হতে হবে। উল্লেখ্য, শিক্ষা বিরতি এবং কামিল পরীক্ষার পরও অনার্সে ভর্তির সুযোগ রয়েছে।

স্কলারশীপ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাঃ

- ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য টিউশন ফি (ঞঁঃরড়হ ঋবব) সম্পূর্ণ মওকুফ।
- দাখিল ও আলিম পরীক্ষার মেধা তালিকায় ১ম-১০ম স্থান অথবা জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সম্মানজনক বৃত্তির ব্যবস্থা।
- সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান।
- অসচ্ছল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ আর্থিক সুযোগ সুবিধা।
- হাফেজে কুর'আন ছাত্রদের জন্য মাসিক বৃত্তির বিশেষ সুযোগ।

বিদেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগঃ

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বিশ্বের খ্যাতনামা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক (গড়ট) স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে অত্র বিভাগের বহু ছাত্র মালয়েশিয়া, ইংল্যান্ড, লিবিয়া, মিশর এবং সৌদি আরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যন্ত সুনামের সাথে অধ্যয়ন করছে।

সম্ভাব্য কর্মক্ষেত্র ঃ

এ বিভাগের অনার্স কিংবা মাস্টার্স ডিগ্রীধারীরা চাকুরীর জন্য বাংলাদেশের সরকারী/বেসরকারী যে কোন প্রযোগিতামূলক পরীক্ষায় (যেমনঃ বি.সি.এস. ব্যাংক, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি) অংশ গ্রহণ করতে পারবে। অধিকন্ত বাংলাদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন ইসলামী সংস্থা ও দূতাবাসে চাকুরীরও সুযোগ রয়েছে।

সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ঃ

প্রতি সেমিস্টারে বিশ্ববিদ্যালয়ে কুর'আন তেলাওয়াত, উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক (বাংলা, আরবী ও ইংরেজী), কবিতা আবৃত্তি, ইসলামী সঙ্গীত, মুখাভিনয়সহ বিভিন্ন ইভেন্টে আন্তঃবিভাগীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে Co-Curricular কার্যক্রমে পারঙ্গম করে তোলার লক্ষ্যে উক্ত বিভাগে "Cultural Club" গঠিত হয়েছে। এ ক্লাবের মাধ্যমে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ইভেন্টে (বিতর্ক, কবিতা আবৃত্তি, সঙ্গীত ইত্যাদি) প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

গবেষনাধর্মী এবং সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। দেশী-বিদেশী বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও গবেষকগণ এসব সেমিনারের প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এবং আলোচনায় অংশ নেন।

ছাত্রীদের জন্য স্বতন্ত্র ক্যাম্পাসে উচ্চতর ইসলামী শিক্ষার আকর্ষণীয় সুযোগঃ

সমাজের অর্ধেক মহিলা। সুতরাং এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে একটি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ কখনোই সম্ভবপর নয়। তাই সে কাঙ্খিত সমাজ গঠনে চাই নৈতিক ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে গঠিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত একদল বিশেষজ্ঞ মহিলা "দায়ী ইলাল্লাহ"। আর ঐসব যোগ্য আদর্শ নাগরিক গড়ার মানসেই আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদালয় চট্টগ্রামের দা'ওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডীজ বিভাগে "মহিলা শাখা" খোলা হয়েছে।

ইসলামী শরীয়াহ্ ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে ছাত্রীদের জন্য নিরিবিল, কোলাহলমুক্ত ও নিরাপত্তাপূর্ণ হোস্টেলে অবস্থান করে সম্পূর্ণ পৃথক ও নিরাপদ ক্যাম্পাসে লেখাপড়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ

ক্রম	নাম	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১	প্রফেসর ডঃ আবু বকর রফিক আহমদ	প্রো-ভিসি	এম.এম.বি.এ (অনার্স) এম.এ. (ঢা.বি.), এম.এ (খারতুম), পি.এইচ ডি. (UKM).
২	প্রফেসর ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের	ডীন	এম.এম.বি.এ (অনার্স) এম.এ.পি.এইচ.ডি. (চ.বি)
৩	এম। শাকের আলম শওক,	সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান	বি.এ. অনার্স (১ম শ্রেণীতে ১ম) ও হায়ার ডিপ্লোমা (আরবী) (১ম শ্রেণীতে ১ম) লিবিয়া), এম,এ (এম শ্রেণীতে ১ম) লিবিয়া, এম,এ(ঢাকা), ডিপ্লোমা ইন কমিউনিকেটিভ ইংলিশ, IIUC.
৪	আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী	সহযোগী অধ্যাপক	ফদিলাহ্ (নাদওয়াতুল উলুম লক্ষ্মৌ) এম.এ. (ঢা.বি)
৫	ড. মোহাম্মদ আবদুস সালাম আজাদী	(S.L)	এম.এম. (১ম শ্রেণীতে ১ম) বি.এ অনার্স (মদীনা) এম.এ. আই.আই.ইউ.এম.)।
৬	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	(S.L)	এম.এম. (১ম শ্রেণীতে ১ম) বি.এ অনার্স (মদীনা) এম. এ. (ঢা.বি) পি.এইচ.ডি. গবেষক (ইউ.কে)
৭	মোঃ শাহ্ জালাল	সহকারী অধ্যাপক	এম.এম. (১ম শ্রেণীতে ১ম) বি.এ অনার্স (মদীনা) এম.এ. (১ম শ্রেণীতে ১ম; স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত), (ডিআইইউ)।

ক্রম	নাম	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা
৮	ড. আহমাদ মোস্তফা	সহকারী অধ্যাপক	বি.এ.(অনার্স), এম. এ.(আরবী)আল আজহার
৯	মুহাম্মদ আবুল কালাম	সহকারী অধ্যাপক	এম.এম. (১ম শ্রেণীতে ৫ম) বি.এ (অনার্স) এম.এ. (১ম শ্রেণীতে ১ম; স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত), (আই,আই, ইউ,সি), এম ফিল (ই.বি), কুষ্টিয়া ।
১০	এ.এফ.এম. নুরুজ্জামান	প্রভাষক	বি.এ. (অনার্স) (১ম শ্রেণীতে ১ম; স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত), এম.এ. (১ম শ্রেণীতে ১ম; স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত), (আই,আই, ইউ,সি) ।
১১	মুহাম্মদ আমিনুল হক	প্রভাষক	এম.এম.বি.এ (অনার্স) (আই,আই, ইউ,সি), এম.এ. (১ম শ্রেণীতে ১ম), এম ফিল (ই.বি) কুষ্টিয়া ।
১২	আবদুল কাদের	প্রভাষক	বি.এ. (অনার্স) (আল-আজহার) এম.এ. (ইউ.কে.)
১৩	শাইখ লুতফী সায়াদ আহমাদ গুনাইম	প্রভাষক	বি.এ.(অনার্স), এম. এ.(আরবী) আল আজহার
১৪	মুহাম্মদ আরিফ বিল্লাহ্	প্রভাষক	বি.এ (অনার্স), এম.এ (অর্থনীতি), ই.বি. কুষ্টিয়া ।

برنامج البكالوريوس

* مواد متطلبات الجامعة:

العدد	رمز المادة	عنوان المادة	الساعات المعتمدة	عدد المحاضرات أسبوعيا
١	RAM-0101	اللغة العربية للتقوية (مهارة الكلام والاتماع)	صفر	٦
٢	RAQ-0101	اللغة العربية للتقوية (مهارة القراءة)	صفر	٦
٣	RAK-0101	اللغة العربية للتقوية (مهارة الكتابة)	صفر	٦
٤	RAN-0101	اللغة العربية للتقوية (مهارة القواعد)	صفر	٦
٥	UREL-1101	اللغة الإنجليزية للمبتدئين	٢	٣
٦	UREL-1202	اللغة الإنجليزية للمتوسطين	٢	٣
٧	UREL-2303	اللغة الإنجليزية للمتقدمين	٣	٣
٨	URIS-3608	السيرة النبوية	٢	٣
٩	URIH-4701	التاريخ الإسلامي: مواقف وعبر	١	٢
١٠	URBS-4802	الدراسات البنغلاديسية	٢	٢

* المواد التخصصية للقسم

التسليل	رمز المادة	عنوان المادة	الساعات المعتمدة	عدد المحاضرات أسبوعيا
١	DIM-1101	حفظ القرآن مع التجويد-١	١	١
٢	DIM-1202	-١ تاريخ الدعوة والدعاة	٣	٣
٣	DIM-1203	حفظ القرآن مع التجويد-٢	١	١
٤	DIM-2304	تاريخ الدعوة والدعاة-٢	٣	٣
٥	DIM-2303	حفظ القرآن مع التجويد-٣	١	١
٦	DIM-2406	تاريخ الأديان	٣	٣
٧	DIM-3506	علم المواريث	٣	٣
٨	DIM-3507	الدعوة ووسائل الإعلام	٣	٣
٩	DIM-3510	تفسير آيات الدعوة	٣	٣
١٠	DIM-3611	الدعوة الإسلامية في مواجهة التحديات المعاصرة	٣	٣
١١	DIM-3612	أسس التعامل مع القرآن والسنة	٣	٣
١٢	DIM-3613	الخطابة	٣	٣
١٣	DIM-3614	الحضارة الإسلامية	٣	٣
١٤	DIM-3615	مناهج الدعوة وأساليبها	٣	٣
١٥	DIM-3616	إعجاز القرآن	٣	٣
١٦	DIM-3617	حفظ القرآن مع التجويد-٤	١	١
١٧	DIM-4718	الغزو الفكري وأساليبه	٣	٣
١٨	DIM-4719	الاستشراق والمستشرقون	٣	٣
١٩	DIM-4720	٥العقيدة الإسلامية-	٣	٣
٢٠	DIM-4721	تاريخ الفرق والنحل	٣	٣
٢١	DIM-4722	مناهج البحث	٣	٣
٢٢	DIM-4723	-٥ حفظ القرآن مع التجويد	١	١
٢٣	DIM-4824	دراسات في أحاديث الدعوة	٣	٣
٢٤	DIM-4825	8 العقيدة الإسلامية-	٣	٣
٢٥	DIM-4826	حفظ القرآن مع التجويد-٦	١	١
٢٦	DIM-4999	البحث	٤	صفر

* المواد الاختيارية: (مجموعتان من المجموعات الثلاث الآتية)

المجموعة الأولى:

العدد	رمز المادة	عنوان المادة	الساعات المعتمدة	عدد المحاضرات أسبوعيا
١	EIE-2301	التربية الإسلامية-١	٣	٣
٢	EIE -2402	التربية الإسلامية-٢	٣	٣
٣	EIE -3503	طرق التدريس	٣	٣

المجموعة الثانية:

العدد	رمز المادة	عنوان المادة	الساعات المعتمدة	عدد المحاضرات أسبوعيا
١	CSE-2301	المدخل إلى الكمبيوتر	٣	٣
٢	CSE -2402	علم الكمبيوتر التطبيقي-١	٣	٣
٣	CSE -3503	علم الكمبيوتر التطبيقي-٢	٣	٣

المجموعة الثالثة:

العدد	رمز المادة	عنوان المادة	الساعات المعتمدة	عدد المحاضرات أسبوعيا
١	ECE-2301	أسس في علم الاقتصاد	٣	٣
٢	ECE -2402	النقد والبنوك في ضوء الإسلام	٣	٣
٣	ECE -3503	دراسة الاقتصادي البنغلاديشي	٣	٣

* مواد متطلبات الكلية:

العدد	رمز المادة	عنوان المادة	الساعات المعتمدة	عدد المحاضرات أسبوعيا
١	DIC-1101	القواعد العربية-١	٢	٣
٢	DIC-1102	علوم الحديث	٣	٣
٣	DIC-1103	العقيدة الإسلامية-١	٣	٣
٤	DIC-1104	العربية للمتقدمين	٢	٣
٥	DIC -1203	القواعد العربية-٢	٢	٣
٦	DIC-1205	العقيدة الإسلامية-٢	٣	٣
٧	DIC -2305	الأدب والنصوص والترجمة	٢	٣
٨	DIC -2306	الفقه الإسلامي	٣	٣
٩	DIC -2407	الأخلاق الإسلامية	٣	٣
١٠	DIC -2408	حاضر العالم الإسلامي	٣	٣
١١	DIC -3509	مقارنة الأديان	٣	٣
١٢	DIC -3510	نصوص مختارة من الأحاديث النبوية	٣	٣

برنامج الماجستير

العدد	رمز المادة	عنوان المادة	الساعات المعتمدة	عدد المحاضرات أسبوعيا
١	MDIM-6101	مناهج البحث	٣	٣
٢	MDIM-6102	فقه الدعوة	٣	٣
٣	MDIM-6103	النظم الإسلامية	٣	٣
٤	MDIM-6104	الدعوة والدعاة في العصر الحديث	٣	٣
٥	MDIM-6105	القواعد الفقهية	٣	٣
٦	MDIM-6106	تاريخ الفكر الإسلامي	٣	٣
٧	MDIM-6201	أصول الفرق الإسلامية	٣	٣
٨	MDIM-6202	الإسلام والفلسفة الغربية	٣	٣
٩	MDIM-6203	الفقه المقارن	٣	٣
١٠	MDIM-6204	مقاصد الشريعة	٣	٣
١١	MDIM-6205	الحسبة في الإسلام	٣	٣
١٢	MDIM-6206	الاستشراق والمستشرقون	٣	٣
	MDIM-6999	البحث	صفر	٦

MD. Shafiqul Islam

35, G.A. Bhaban, Anderkilla, Chittagong

দেশি ও বিদেশি কাপড়ের আস্থার প্রতীক

এম. আলী ষ্টোর
M. Ali Stores
A house of Quality Fabrics

স্যুট ব্লেজার পেন্টের কাপড়
সুইস কটন শার্ট
পাকিস্তানী থ্রি-পিচ
কাবলী ও
পাঞ্জাবীর কাপড়
পাইকারি দামে বিক্রি হয়

৩০২, মিমি সুপার মার্কেট
(৪র্থ তলা), নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।
ফোন : ০৩১ ২৫৫৩৩৩৮, ০১৭১৫ ৩০৭০২০

TIENS

আকু লাইফ হেলথ্ ডেভলাপমেন্ট সেন্টার

অত্যাধুনিক আকু লাইফ মেশিন দিয়ে
সম্পূর্ণ বডি চেকআপ করা হয় ও
থেরাপীর ব্যবস্থা রয়েছে।

চাইনিজ ঔষুধ এর জন্য একটি
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

সহযোগীতায় : টিয়েন্সি বাংলাদেশ কোম্পানী লিমিটেড
শাখা অফিস : এ/৩, সলিমপুর, সি.ডি.এ. আ/এ, চট্টগ্রাম
মোবাইল : ০১৮১৫ ৫৯৮৫৮৮

এ পাঞ্জাব টেইলার্স

এখানে অতি যত্ন সহকারে
পাঞ্জাবি, জুব্বা, কাবলি
বোরকা উন্নতমানের
সেলাই করা হয়।

মাদ্রাসা শিক্ষক, ছাত্রদের জন্য বিশেষ কনসেশন আছে

জেনারেল হাসপাতালের মেইন গেইটের পশ্চিম পার্শ্বে,
শাহী জামে মসজিদ মার্কেট (২য় তলা, পূর্ব দিকে)
দোকান নং : ১০৭, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
মোবাইল : ০১৭২৬ ৮৭৫৮২৭

আল্ মদীনা কুতুবখানা
Al Modina Kutubkhana

বৈরুত, মিশর, ভারত, পাকিস্তানসহ
বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব ও সকল প্রকার
ধর্মীয় পুস্তকের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

১০৫, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স
(২য় তলা) আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৮১৯ ৫১৩১৬৩

Da'wah Students' Journal

العدد-١، أغسطس ٢٠٠٩م

مجلة طلاب الدعوة

الراعى الرئيسي
الأستاذ الدكتور محمد محبوب الله

المستشار الرئيسي
الأستاذ الدكتور أبو بكر رفيق

رئيس التحرير
الأستاذ م. شاكر عالم شوق

هيئة التحرير
الأستاذ محمد أبو الكلام
الأستاذ أ.ف.م نور الزمان
الأستاذ محمد أمين الحق
الأستاذ عبد القادر

المساعدون
إن. إيص معصوم
سعود بن محمد
محمد نعمان قطبي
أم كلثوم
تسليمة أختار
كاشفة فردوس

قسم الدعوة والدراسات الإسلامية
الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ